বাঘিনী
সমরেশ বসু

বাঘিনী

সমরেশ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

Acc no - ১১৪৮

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
কানাই পাল

সাত টাকা মাত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

জরুরী কয়েকটি কথা নিবেদন করা দরকার। সবচেয়ে জরুরী হ'ল বৈদ্যুতিক ট্রেনের বিষয়। উপন্যাসের ঘটনাকালের যে-সময়ে বৈদ্যুতিক গাড়ি-চলার কথা বলা হয়েছে, সেটা মারাত্মক ভুল। কারণ তখনো বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি চলে নি। আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ প্রমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যখন এ ভ্রম চোখে পড়ল, তখন আর সংশোধনের কোনো উপায় ছিল না।

ছাপার ভুল অসংখ্য। সে জন্যও আমাকে আগেই মার্জনা চাইতে হয়। কারণ পাঠকের সব থেকে সামনে লেখকই উপস্থিত।

তা' ছাড়া এ উপন্যাস এমন একটি দর্পণ, যে ধার আমিই তরল করেছি, ছাঁচে ঢেলেছি, তবু যদি কেউ নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন সেটা লেখকের অনিচ্ছাকৃত। তার জন্য এ দর্পণের কোনো দোষ নেই।

সমরেশ বসু

॥ এক ॥

দু'বছর আগে বাঁকা বাগ্‌দি যেদিন মারা গিয়েছিল, সেদিন এ সংসারের আমোঘ নিয়মের কোথাও কোনো ক্রটি ঘটে নি।

মানুষ ধরিত্রীর সন্তান। পাপী-তাপী পুণ্যবান, সব মানুষই নাকি। একটি ক'রে মানুষের মৃত্যু পৃথিবীর অদৃশ্য গায়ে একটি ক'রে বয়সের রেখা। একটি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ, জঙ্গম পৃথিবীর এক মুহূর্তের স্তব্ধতা, এসব কথা শোক গাথায় মানায়।

বাঁকা বাগ্‌দির জন্য শোক, নীতিবিরুদ্ধ ও অসম্মানকর। মানুষের দূরের কথা স্বয়ং ধরিত্রীরও। কারণ বাঁকা বাগ্‌দি ছিল ঘোর পাপী।

তাই সেদিন পাখি ডেকেছিল। বাতাস বয়েছিল। আকাশের নীলিমায় ছিটে-ফোঁটা স্পষ্ট মেঘের ছায়াও পড়ে নি। জীব জগৎ কিংবা জড়জগতের কোথাও কোনো ক্রটি ঘটে নি নিত্য অনুষ্ঠানের।

কেঁদেছিল একজন। বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ে দুর্গা। যার একটি পোশাকি নামও আছে, পারুলবালা। বিহানবেলা ঘুম ভেঙে যাদের লজ্জা নিবারণ রোজের চিন্তা, তোলা-কাপড়ের হিসেব তারা পাগল না হলে করে না। বাঁকা বাগ্‌দির ঘরে মেয়ের তোলা-নামও সেই রকম হিসেবের পাগলামি ব'লেই মনে হয়। বাপ ডাকত ছুঁড়ি ব'লে। লোকে 'বাঁকার মেয়ে'। আর যে সব নাম ছিল, সেগুলি গালাগালির বিশেষণ।

পোশাকি নামে শুধু একটি কথাই প্রমাণ হয়। বাঁকা বাগ্‌দির ঘরে কোনো এক কালে কিছু শখের অবকাশ ছিল।

দুর্গা কেঁদেছিল অসহায় হ'য়ে। কারণ বাপ ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। সংসারে অনেক মেয়ের বাপ থাকে না। কিন্তু সংসারে যে-মেয়ের বিয়ে হয় নি, তবু আঠারো বর্ষার প্লাবনে দেহের দরিয়া

অকূল, সে মেয়ের একটি বাপ দরকার ছিল। সে বাপ যেমনই হোক। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ভিখিরি কিংবা কানা খোঁড়া অথর্ব। সংসারে এটা একটা নিয়মের সামিল।

তার ওপরে, সে মেয়ের যদি গায়ের রং কটা হয়, চুল পড়ে কোমর ছাপিয়ে, চোখ হয় নিশিন্দা পাতার মত আয়ত; আর সেই চোখ যদি দীঘির কালো জলে সূর্যছটা চলকানো ঝলকানো হয়। যদি, ভাদরের থির নয়, শাওনের অথৈ জল স্রোতের বেগে মেয়ের যৌবন একূলে ওকূলে যায় ভাসিয়ে। তারো পরে অভাগী সেই মেয়ের বিষকটু চোপা শুধু মাত্র স্ফুরিত ঠোঁটের গুণেই যদি উল্টে মিঠে নেশার আমেজ ধরায়। তারো চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যদি সে মেয়ে হয় মৃত কুখ্যাত বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ে, তবে সেই মেয়ে কেন শুধুমাত্র শব-ভূক শকুনের তীক্ষ্ণ বাঁক চঞ্চুর এক্তিয়ারে নয়?

একথার জবাব দেবার দায়িত্ব কেউ নেবে না এ দেশে, একথা জানত দুর্গা। পোশাকি পারুলবালা, যদিও সাত ভাই চম্পার রূপকথার দেশেরই মেয়ে সে।

তাই দুর্গা কেঁদেছিল। কাছে হোক, দূরে হোক, কু হোক, সু হোক, ওঝার তুকের সীমানায় ছিল দুর্গা। ওঝা মারা গেছে। চ্যাংমুড়ি কানী বাঁকা গ্রীবা নিষ্ঠুর অপলক চোখ তুলে আসছে দিগ্‌দিগন্ত ঘিরে। দুর্গা কেঁদেছিল অসহায় ভয়ে।

বাগ্‌দিপাড়ায় দুর্গার অভাব ছিল না। মেলা-ই না হোক্, কয়েকজন ছিল। আইবুড়ো উঠ্‌তি বয়সে যারা বাপ মা হারিয়েছিল। স্বামী হারিয়েছিল যারা অথৈ বয়সে। বাঁকা বাগ্‌দির মত তাদের হয়তো কানা কড়ি ফোঁকা অবস্থাও ছিল না। ছিল হয়তো ছিটে-ফোঁটা জমি, জলে ভেসে যাওয়া পিঁপড়ের তৃণকুটার মত। কিন্তু মেয়ে ব'লে কথা। মেয়েই বা কেন শুধু। মেয়ে কি মানুষ নয়?

মানুষ-ই। কিন্তু পুরুষমানুষ নয়। এ দেশে এটা শুধু কথার কথা নয়, বড় কথা। কপালের লিখন মন্দ থাকলেই নাকি সংসারে

মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মাতে হয়। মেয়ের ধর্ম নাকি সে যেচে করে না, কেঁদে করে। তাই কপাল কোঁটা শেষ হয় না তার কোনোদিন।

কলকাতায় নাকি মেয়েরা অফিস আদালত চালায়। আরো অনেক দূর দূর মুলুকে নাকি তারা যুদ্ধ করে। উড়ো জাহাজে উড়ে বোমা মারে। কত কি করে। হুগলি জেলার এক পাড়াগাঁয়ের বাগ্‌দিপাড়ায় ব'সে, কান পাতলে নিঝুম সন্ধ্যায় নতুন বিজলি রেলগাড়ির বাঁশী শোনা যায় দূর থেকে। কিন্তু সংবাদ, সংবাদ থেকে যায়। এখানে মেয়ে জীবনের কপাল কোটার শেষ হয় না।

নগরে আছে জাঁদরেল কোটাল। লস্করের ছড়াছড়ি। দেউড়িতে আছে বাঘা সেপাই। গায়ে সোনা নেই দানা নেই, হীরে নেই, জহরৎ নেই। পুরুষহীনা রাজ্যেশ্বরী তবু অরক্ষণীয়া। শক্ত ক'রে কপাট বন্ধ ক'রেও, রাজ্যেশ্বরীর বুকে ত্রাস। ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাতে তার দমে কুলোয় না। সারাদিনের এত যে শাসন, কত কষণ, বহু পালন, সে সব কোথায় যায়। যার চোখের খরায় দুর্জন পোড়ে, সুজন সুখী স্নেহে, সেই রাজ্যেশ্বরীর কিসের ভয় কপাট বন্ধ একলা ঘরে?

রাজ্যেশ্বরীর ভয়, সে মেয়েমানুষ। দিন যায়, রাত্রি আসে। এ ঘর তার দরবার নয়, আমাত্য আমলার ভিড় নয়, কুর্নিশ নয়। এ ঘর তার শয়নকক্ষ। রাজ্যেশ্বরী এই ঘরে মেয়েমানুষ। যখন সে এই ঘরে, তখন সেও কপাল কোটে মেয়েমানুষ হ'য়ে।

শুধু কি মানুষেরই ভয়? নিজের প্রকৃতিতেই যে তার বুকের মধ্যে কত ভয়ের লীলা সাজিয়ে রেখেছে ঘরে ঘরে।

তাই বাগ্‌দিপাড়ার লোকেরা বলে, মেয়ে ব'লে কথা।

আরো কথা আছে। শুধু ভয় ত্রাসের কথা নয়। মেয়ে হওয়া যে কত বড় কথা, সে কথা বলেছে মহাভারতের সেই রাজা। না, মেয়েমানুষকে খোসামোদ তোষামোদের কথা নয়! মেয়ে হওয়ায় কত সুখ, সে কথা বলে গেছে সেই রাজা।

রাজাটার মনে সুখ ছিল না। রাজ রাজ্যপাট ধনরত্ন, রাজমহিষী, সব আছে। রাজার ছেলে নেই। হয় না। রাজা যজ্ঞ করলে, পুজো দিলে আগুনকে। অগ্নিদেবতার বরে রাজার ছেলে হল একশো। কিন্তু ইন্দ্ররাজ গেল ক্ষেপে। আগুনের পুজো হল, আর ইন্দ্র গেল বাদ? ইন্দ্র মায়া দিয়ে ছলনা করল রাজাকে। সে মায়ায় রাজা পাগলের মত ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে রাজা পথ হারালে। তেষ্টায় বুক ফাটতে লাগল। তখন সামনে পেল এক সুন্দর টলটলে সরোবর। রাজা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই সরোবরের জলে। তেষ্টা মিটল। কিন্তু হায়! রাজা আর রাজা রইল না। জল থেকে উঠল রাজা এক রূপসী মেয়ে হ'য়ে। সে রূপ, সে যৌবন মুনির ধ্যান ভাঙতে পারে।

দুঃখে রাজার মুখ অন্ধকার। রাজ্যে ফিরে গিয়ে, রাণীকে আর ছেলেদের ডেকে সে বললে, রাজ্য পালন কর, আমি বনে চললুম।

রাজা বন গমন করলে। আশ্রয় নিলে এক মুনির আশ্রমে। কিন্তু রাজা তো আর রাজা নেই। রূপসী যুবতী মেয়েমানুষ। রূপ দেখে তার মুনির মন টলে গেল। মুনি তাকে ভালবাসল। সেই ভালবাসায়, মুনির ঔরসে মেয়েরূপী রাজার গর্ভে আরো একশো ছেলে হ'ল। রাজা তখন সেই ছেলেদেরও রাজ্যে নিয়ে গেল। নিজের ঔরসজাত ছেলেদের বললে, এই একশো জনও তোমাদের ভাই, আমার পেটের সন্তান। সবাই মিলে রাজত্ব কর সুখে।

দুশো ভাইয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল। রাজা ফিরে গেল তার প্রেমিক ঋষির কাছে। ইন্দ্র ভাবলে, হ'ল তো ভাল। অপকার করতে গিয়ে উপকার ক'রে বসে রইলুম? তবে লাগ্ ভেল্কি ভাল হাতে।

ইন্দ্র ছলনা ক'রে, দু'শো ভাইকে লড়িয়ে দিলে। বললে, তোমরা একদল রাজার ছেলে, আর একদল ঋষির ছেলে। একত্রে তোমরা রাজ্যভোগ করছ কেন? যে-কোনো একদল ভোগ কর।

শুনে ছেলেদের ভেদবুদ্ধি জাগল। তারা লড়ালড়ি শুরু করলে। লড়ে, সকলেই মারা পড়ল। তখন রূপসী মেয়ে রাজা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসল। সদয় হ'য়ে, দেখা দিল ইন্দ্র। বললে, তোমার দুঃখের কারণ আমি। যজ্ঞে তুমি আমার স্তুতি করনি, খালি আগুনকেই করেছ।

রাজা মাপ চাইলে। ইন্দ্র খুশি হ'য়ে বললে, বর চাও।

রাজা বললে, ছেলেদের ফিরিয়ে দাও।

ইন্দ্র বললে, তা' দেব। কিন্তু সকলকে নয়। একশো ছেলে ফিরে পাবে। কিন্তু কোন্ একশোকে চাও? বাপ হ'য়ে যাদের পেয়েছিলে, তাদের? না, মা' হ'য়ে যাদের পেটে ধরেছিলে, তাদের?

তখন রূপসী মেয়ে রাজা বললে, ভগবান! মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহ আর কার আছে? আমাকে আমার পেটের সন্তানদের ফিরিয়ে দাও।

ইন্দ্র চমৎকার মনে ক'রে, সেই বরই দিলে। তারপর ইন্দ্র বললে, তোমার রূপ বদলের বর চাও রাজা।

মেয়ে রাজাটি বললে, হ্যাঁ, বর দাও ভগবান, যেন আমি মেয়েমানুষ হ'য়ে সারা জীবন কাটাতে পারি।

ইন্দ্র অবাক হ'য়ে বললে, কেন?

নারী রূপিনী রাজা জবাব দিলে, স্বর্গরাজ! মেয়েমানুষই শুধু জানে, পুরুষের সঙ্গে প্রেমে ও মিলনে, মেয়েদের সুখ অনেক বেশী।

ইন্দ্র আবার চমৎকার ভেবে, সেই বর-ই দিলে রাজাকে।

কালের কথা কালে খায়। মহাভারতের কালে, পুরুষেও মেয়ে হওয়ার বর চাইতে পেরেছে। আর একালে, হুগলির এক দূর গাঁয়ের বাগ্দিপাড়ায় মেয়েরা, মেয়ে-জন্মের জন্য কপালের লিখন মন্দ ব'লে জানে। তাদের কপাল কোটা শেষ হয় না।

দুর্গার মত মেয়ে ছিল পাড়ায়। দুর্গা তাদের দেখেছে আজন্ম। ভরা বয়সে আইবুড়ো মেয়ে বাপ মা হারিয়েছে। নই বাছুরের মত মেয়ে স্বামী হারিয়েছে। হারিয়ে কপাল কুটে কুটে কেঁদেছে। দাপাদাপি ক'রে মরেছে। তাদের কারুর কারুর তবু ছিটেফোঁটা জমি ছিল। তবু তারা কেঁদে-কেটে একসা।

কিন্তু কেঁদে ক'দিন চলে? পৃথিবী বর্ষায় চিরদিন ভেজে না। টানে শুকোয় আবার। রোদ হাসে ঝিকিমিকি ক'রে।

দুর্গা দেখেছে, সেই মেয়েরাও হেসেছে। শোকের স্যাতস্যাতানি শুকিয়ে, প্রত্যহের জীবনে আবার ঝরঝরে হ'য়ে উঠেছে তারা। কিন্তু ঘর তারা করেছে, ঘর না বেঁধে। মাঝি নেই, তবু খেয়া নৌকোর মত। পারাপারের যাত্রীরা যে যখন আসে, পার হ'য়ে যায়। ফিরে চেয়ে দেখে না আর, সে নৌকো ডোবে কি ভাসে। ফাটে কি ফুটো হয়?

কী ভয়! বড় ঘৃণা। তাই কেঁদেছিল দুর্গা। কাঁদবার সময় শোকটাই বড় হ'য়ে ওঠার কথা। তখন আর অন্যদিকে চোখ পড়ে না মানুষের। কিন্তু, বাঁকা বাগ্‌দির মৃতদেহ তখনো উঠোনে। উথালি-পাথালি কান্নায় দাপাদাপি করতে গিয়েও দুর্গা টের পেয়েছিল, লোকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাঁকার জন্য কেউ কাঁদে নি। কারণ কাঁদতে নেই। বাঁকার ভাসিয়ে রেখে যাওয়া মেয়েটার দিকেই তাকিয়েছিল সবাই।

জন্মালে মরতে হয়। অথচ এই দিনটিকেই মানুষ ভুলে থাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করে ভুলে থাকতে। তা নইলে বুঝি বাঁচা যায় না। সংসারের নিয়মের মতই সেটা ভুলেছিল দুর্গা। বাপ যে চিরদিন থাকবে না, সেটা বুঝি তার মনে ছিল না। বাঁকা বাগ্‌দিরও বোধহয় মনে ছিল না, এ দিন যাবে, থাকবে না।

তখন কি হবে?

দু'বছর আগে সেই 'তখনের' মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্গা দেখেছিল,

সংসার তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। আর আর মেয়েদের যা হয়েছিল, তার জন্যও অপেক্ষা করছিল সেই একই ভাগ্য।

তাই দুর্গা কেঁদেছিল। বাপের জন্য কাঁদতে গিয়ে, আসলে নিজের জন্য কেঁদেছিল।

অথচ, লোকে বলত, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। ডাকাতে বাপের ডাকাতে মেয়ে। শেষদিকে বাপ চিরকাল রস গাঁজিয়ে গেল। মেয়ের চোপায় ছিল গোটা গাঁ তটস্থ। এবার?

চোপা ছিল দুর্গার। আছেও। এমনি হয় নি। জীবনের তাগিদে তার চোপা তৈরী হয়েছিল। দপদপানি খরাশনী দুর্গা আপনি আপনি হয় নি। চারপাশে চিলের উড়োউড়ি, পাখা ঝাপটা, গোত্তা খাওয়া। ঠাণ্ডা মিঠেটি হ'লে, কবে ইঁদুরের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেত তাকে চিলেরা।

বাপ হ'য়েও বাঁকা বাগ্‌দি বাড়ি থেকেছে ক' রাত? দুপুরে ভাত খেয়েছে ক'দিন মেয়ের হাতে?

দেখে-শুনে মনে হত, বাঁকা যেন ঝাড়া হাত পা। গলায় কাঁটা সোমত্ত মেয়ে নেই ওর ঘরে। পাড়ার লোকেরা মরেছে হায় হায় ক'রে। মরবেই। একে, বাঁকার মত মেয়ের গড়ন-পিটন। তায় মেয়েমানুষের বাড়। যেন পাড়ার লোকের বুকে পা' দিয়ে, ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ ক'রে গতরে জোয়ার এসেছে মেয়েটার। দেখতে দেখতে মেয়ের কোমর ভার হ'য়ে উঠল। পায়ের গোছা হ'য়ে উঠল শক্ত নিটোল। গোটা অঙ্গ পুষ্ট নিটুট উদ্ধত। পুরুষদের সামনে দাঁড়ালেও মাথা ছাড়িয়ে উঠতে চায়, এত বাড়ন্ত। তার ওপরে কটা রং। এক মাথা কালো চুল। বাঁকা বাগ্‌দির মা'কে যারা দেখেছে, তারা বলেছে, সে-ই ফিরে এসেছে আবার।

যারা হায় হায় করেছে, তাদের মনে হয়েছে, মেয়ে নয়, জানাশোনা গর্ত থেকে সদ্য খোলস ছাড়ানো বিষধর সাপ বেরিয়ে এসেছে। হায় হায়-এর রকম-ফের আছে। আরো এক দল হায় হায় করেছে

তাদের নয়া পাখা ঝাপটে ঝাপটে। সেগুলি বাতির চারপাশে ঘোরা বাদলা পোকার মত।

জীবন মানুষকে শিক্ষা দেয়। দুর্গা তাই বাপের অনুপস্থিতিতে রাত্রে পাড়ার মাসী পীসিদেরও সঙ্গে নিয়ে শোয় নি। কারণ, তার মত মেয়েদের জীবনে একটি সময় আসে, যখন সবাই তার কানে কানে মন্ত্র পড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে। মাসী পীসিরা পড়ে, বকুলফুল গঙ্গাজলেরাও পড়ে।

তার জন্যে ঘরের কোণে বসে কাঁদা যায় না। ধ'রেও রাখা যায় না এ শরীরের রূপান্তর। শক্ত পায়ে, শক্ত হ'য়ে না চললে, পায়ের তলে মাটিও কোন্‌দিন না জানি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসবে।

তাই মেয়ের হাসিতেও আগুন, চোপাতেও আগুন। মনে হয় দপদপানি, খরাশনী। মেয়েকে 'কোথা যাচ্ছিস' জিজ্ঞেস করলে, আগে 'কেন'র জবাব দিতে হবে। অর্থাৎ কেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। এইটুকু অসহজ করেছে তাকে তার সমাজ ও পরিবেশ।

যদি বল, রাতে একলা শুতে তোর ভয় করে না লো ?

জবাব দেয়, ভয় কেন করবে ? ডাইনীর হাড় থাকে যে শিয়রে।

শোন কথা। ডাইনীর হাড় নাকি থাকে ছুঁড়ির শিয়রে। মিছে নয়, থাকতে পারে। যা মেয়ে! বাগ্‌দি বামুন বেণী ঠাকুর তো শুনেছে দুর্গার অন্ধকার একলা ঘরে হাসি। অত রাতে, একলা আইবুড়ো মেয়ে কখনো হাসতে পারে খিলখিলিয়ে। বেণী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্‌ করেছিল, বাঁকা আছিস্‌ নাকি ঘরে ?

জবাব দিয়েছিল দুর্গা-ই। বেণী ঠাকুরের গলা চিনতে পেরে, দরজা খুলে ধরেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল, রাত দুপুরে বাপের খোঁজ কেন ঠাকুরদা। তুমিও ভিড়েছ নাকি ?

—ভিড়ব আবার কিসে লো ?

—আমার বাপের কারবারে।

বেণী ঠাকুর মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, মাথা খারাপ। ওসব পাপে আমি নেই। ঘরে কি তবে তুই একলা?

—দোকলা কি না, দেখে যাও এসে।

—না, তা নয়। এই আঁধারে যেতে যেতে তোর হাসি শুনতে পেলুম কি না, তাই।

বেণীঠাকুরের চোখে পলক ছিল না। অলৌকিক ভয় ভয় চোখে সে তাকিয়ে দেখছিল দুর্গাকে। দেখছিল, চুল বাঁধা নেই, এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এলিয়ে আছে। মুখখানি যেন ঘুম-ঘুম ফোলা-ফোলা, কিন্তু চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে। দুর্গা জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ, হাসছিলুম। একটা কথা মনে প'ড়ে আর হেসে বাঁচিনে।

বলতে বলতে আবার হেসেছিল দুর্গা। বাতাস ছিল না একটুও। তবু বেণীঠাকুরের মাথার ওপর সজনে গাছটা দুলে উঠছিল। কাঁপুনি লেগেছিল একটা বেণীঠাকুরের শিরদাড়ায়।

—শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

বলতে বলতে চলে গিয়েছিল বেণীঠাকুর।

তবু তো বেণীঠাকুর একলা ঘরে শুয়ে দরজায় নিত্য নূতন ঢং-এর টোকা শুনতে পায় নি। তার ঘরের বেড়া ধরে কেউ নাড়া দেয় নি রাত দুপুরে। অদূরে ওই সরোবরের অশত্থের ঝুপসিঝাড় থেকে মাতাল পুরুষের অট্টহাসি শুনতে হয় নি। নিস্তব্ধ অন্ধকারে উঠোনে পায়ের শব্দ পায় নি শুনতে। পেলে শিরদাঁড়া কেঁপে স্থির থাকত না। মটাস্‌ ক'রে ভেঙে প'ড়ে যেত।

এই মেয়ে ড্যাকরা পুরুষের নিলর্জ্জ চোখের সামনে, কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়াবে না তো কে দাঁড়াবে? চলতে ফিরতে আর কার হাতের কব্জির জোর এতখানি যে, বলবে, নোড়া দিয়ে বুকের পাঁজরা থেত্‌লে দেব। বেশী এদিক ওদিক ক'রো না।

হাসতেও যতক্ষণ, রাগতেও ততক্ষণ। অন্য লোক তো পরের কথা। বাঁকা বাগ্‌দির মত অমন বাঘা মানুষকেও তো নাকাল হতে

দেখেছে পাড়ার লোকে। উঠোনে সারবন্দী দাঁড়িয়ে দেখেছে যাবত মেয়ে পুরুষেরা। যে-বাঁকা বাগ্দির জন্য মহকুমা পুলিসেরও মাথা দপ্দপ্ করে।

লোকে দেখেছে, উঠোনের একদিকে বেটি, আর একদিকে বাপ। দুজনেরই চোখে আগুন ঝরছে। 'দুজনেই তাগ কষছে দুজনকে। ঘাৎ পেলেই কোপ্।

লাগত অবশ্য দুর্গার চোপার জন্যেই। বাঁকা একবার বাড়ি ঢুকলেই হত। অমনি দুর্গার গলা রনরনিয়ে উঠত, এই যে, লাগর এসেছ?

শোন কথা। যা-ই হোক, বাঁকা বাপ। বাপকে কেউ ও-কথা বলে? বলে, দুর্গা বলে।

অমনি বাঁকার গর্জন শোনা যেত, চোপরাও হারামজাদী। মুখ তোর ছিঁড়ে ফেলব আজ।

আর যায় কোথায়। কোমরে আড়াই প্যাঁচ আঁচল জড়িয়ে, দু' চোখে আগুন নিয়ে দুর্গা একেবারে দশহাত। গলা ওর চিলের মত তীক্ষ্ণ নয়, তার সঙ্গে একটু কষে বাঁধা তারের ঝঙ্কার মেশানো। বলত, মুখ ছিঁড়বে? এস দেখি, কত ক্ষ্যামতা তোমার গায়ে আছে, দুগ্গার মুখ ছিঁড়বে? ওই হাত তা' হলে কেটে কুচিকুচি করব না। পোকা পড়বে না হাতে? ওই হাতে তোমার রস গাঁজানো জন্মের মত খেয়ে দেব আজ, এস।

ততক্ষণে পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক জমত এসে উঠোনে।

বাঁকার রাগের চেয়ে বিস্ময়ের মাত্রাই বোধ হয় বেশী থাকত। সে না এগিয়েই চীৎকার করত, খবরদার বলছি হারামজাদি, এখনো সরে যা আমার সামনে থেকে। নইলে তোর কোনো বাপ এসে রক্ষে করতে পারবে না। হ্যাঁ ব'লে দিলুম।

মানুষ রাগলেও যে একরকমের ভয়ংকর হাসি হাসে, সেটা দুর্গার খ্যাপা হাসি না দেখলে বোঝা যায় না। সে বিষের মত হেসে বলত, মাইরি। ব'লে দিলে? আবার বাপের খোঁটা দেওয়া হচ্ছে

আমাকে ? এস আগে তোমাকেই দেখি। তা' পরে অন্য বাপদের দেখা যাবে।

বাঁকার সারা গায়ে পেশী ফুলতে থাকত। যেন একটা অসহায় অজগরের মত গর্জাতে থাকত সে। উঠোনের মানুষদের দিকে ফিরে বলত, এ মেয়েকে সামলাও তোমরা। লইলে আজ মেয়ে হত্যে দেখতে হবে তোমাদের।

দুর্গা আরো গলা চড়াত, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখবে। মেয়ে হত্যে দেখবে কি পিত্তি হত্যে দেখবে, পরে দেখা যাবেখনি। এখন চোলাইয়ের গরম কতখানি হয়েছে, তাই দেখাও। এসে সিটিয়ে থাকত পাড়ার লোকে। কি একটা সর্বনাশ না জানি ঘটে। মেয়েদের মধ্য থেকেই কেউ হয় তো ব'লে উঠত, এই, এই দুগ্‌গা, তুই চুপ যা। বাপের সঙ্গে অমন করে না, যা।

দুর্গার হাতে একটা না একটা অস্ত্র থাকতই। কাটারি, বঁটি কিংবা খ্যাংরা। ভেংচে উঠে বলত, ইস্! বাপ! আমার বাপ! এটা একটা পাপ! ঘোর পাপ জুটেছে আমার কপালে।

বাঁকার আর সহ্য হত না। সে একবারে ঘরের চালা সমান লাফিয়ে গর্জে উঠত, ছাখ্ তবে ছাখ্।

কিন্তু আশ্চর্য! বাঁকা দু' পায়ের বেশী এগোত না। বরং দুর্গাই তার জায়গায় স্থির। উপরন্তু বাঁকার বুকের আগুনকে আরো উস্‌কে দিয়ে বলত, মুরোদ বড় মান। ওই লাফানি-ঝাঁপানি দেখে লোকে আর পুলিসে ভুলবে, দুগ্‌গা সে বাপের বেটি নয়কো। লজ্জা করে না রোখ্‌পাক করতে। আজ ক'দিন থেকে গা' ছেড়ে দেয়া বাসি পচা ভাত আমি কুকুরকে গেলাচ্ছি। খাবার লোক ভাগাড়ে গে' রস গাঁজাচ্ছেন। মরণ! মুখে আগুন!

এসময়ে কি দুর্গার গলা একটু ধরে আসত ? কে জানে। সহসা টের পাওয়া যেত না। চোখে তো এক ফোঁটা জলও দেখতে পেত না কেউ। কিন্তু দুর্গা থামত না, সমানেই চলতে থাকত তার গলা,

আবার কত কথা। হ্যাঁ মা, না মা, অমুক সময়ে আসব মা। ঘরে চাল নেই? আচ্ছা, আজ রাতেই পাটঠে দেবখনি। নিজে না পারি, লোক দে পাট্‌ঠে দেব। খালি কাঁড়ি কাঁড়ি কথা। খ্যাংরা মারি অমন কথার মুখে।

বাঁকা আবার লোকজনের দিকে ফিরে বলত, চুপোয় তোমরা রাক্‌কুসীটাকে, না ঘেঁটিটা মুচড়ে দেব, বল তোমরা।

তা' কেউ কেউ ঘেঁটি মোচড়ানো দেখতে চাইত বৈ কি। চুপিচুপি চাইত, কথা না ব'লে।

ছুর্গা সমানে বলেই চলত, কার ঘেঁটি কে ভাঙে, দেখি। নিজের কীর্তি কাহিনী শুনে বড় জ্বালা লাগছে এখন গায়ে। মনে করেছ, দশটা ম'দো মাতাল চোলাইওলা তোমাকে মাথায় ক'রে রেখেছে ব'লে আমিও বাপ বলতে অজ্ঞান হব, না? থুঃ থুঃ। বলে, রাত জেগে জেগে আমার বাতির তেল ফুরিয়ে যায়, শ্যালের পায়ের শব্দে ভাবি, আমার বাপ আসছে। ওমা! কার কে? সব ফক্‌কিকার। কেন, জন্মো দেবার কালে মনে ছিল না। আমি কি তোমার মেয়ে নই, না ঘরে বেওয়ারিশ এনে পুষেছ?

—হারামজাদি পাপিষ্টি!

হাতের কাছে যা পেত, ছুঁড়ে মারত বাঁকা। ছুর্গাও মারত সমানে সমানে। ছুজনেই এ তা ছুঁড়ে মারত আর ছুটোছুটি করত। লোকজনেরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠত। তারাই ছুটোছুটি করত নিজেদের প্রাণের ভয়ে।

কিন্তু ছুর্গা মুখ থামাত না।—দাওয়ায় মাটি নেই, ঘরে চাল নেই, স্থাকড়া পরে পরে দিন কাটাচ্ছি। আবার বলে, 'তুই আমার মা-মরা একটা মেয়ে।' মেয়ের সঙ্গে ফেরেব্বাজী? মুখে পোকা পড়বে না? হোক্ আজকে এস্‌পার নয় ওস্‌পার। তা পরে নিজে যাব দারোগার কাছে। তোমার এই চোলায়ের জালা নিজে ধরিয়ে দে আসব।

ততক্ষণে বাঁকা একটা সিদ্ধান্তে আসত। সারা জীবনে, ছুর্গার

সঙ্গে ঝগড়ায় ঐ একটি সিদ্ধান্তই জানা ছিল বাঁকার। সে হেঁকে-ডেকে সরে পড়ত। লোকজন সাক্ষী রেখে কাউকে শাসানোর পাত্র ছিল না বাঁকা বাগ্‌দি। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে তাকে রাখতে হ'ত। সবাইকে উদ্দেশ ক'রে ক'রে বলত, এই তোমরা সবাই শুনে রাখ, এ মেয়ের আমি আর মুখ দশ্‌শনও করব না। ও মরে গেলেও আমি আর আসব না। চললুম দেখি তোর কত তেজ।

দুর্গাকে তখন আরো ভয়ংকরী মনে হত। 'তুমি' বলতেও ভুলে যেত সে তখন। চীৎকার ক'রে বলত, যা, যা না। ওই চোলাইয়ের আরকে ডুবে মরগে যা।

—আচ্ছা লো হারামজাদী, আচ্ছা।

চলে যেত বাঁকা। যে-সে লোক নয়, বাঁকা বাগ্‌দি। সজনে গাছের ডালে যার মাথা ঠেকে যায়, এত উঁচু। বয়স সম্ভবতঃ বছর পঞ্চাশ। কিন্তু এখনো পাঁচটা যোয়ানের মহড়া নিতে পারে। সারা গায়ে এখনো সাপের মত চকচকে সর্পিল পেশী। কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নেই। রং কালো। চুলেই যা কিছু পাক ধরেছে। খালি গায়ে দেখা যায়, বুকের লোমও পেকে উঠেছে কিছু কিছু। দাঁতও বোধহয় খানকয়েক নিশ্চিহ্ন। সব কটাই যে বয়সে খেয়েছে, তা নয়। এদিক ওদিক করতে গিয়ে এক আধখানা কি যায় নি? তাও গেছে। দৌড়ুতে দেখলে, প্রাণভয়ে পালানো শেয়ালও থ' মেরে যাবে। তাও খালি হাত পা'য়ে নয়। ঘাড়ে বোঝা নিয়ে। হাতে একটি লাঠি থাকলেই হল। নইলে, তিরিশ সের এক মণ ওজন নিয়ে কেউ বটের উঁচু ডালে উঠতে পারে না। উঠে সারা রাত নিঃশব্দে কাটাতে পারে না। বাঁকা বাগ্‌দি পারে। আব্‌গারি দারোগাবাবু আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে বাঁকা ঘুংড়ি বান। পলক পড়ে না, জলের পাকে মানুষ হারিয়ে যায়। পনর হাত দূর থেকে বাঁকা ছায়ার মত অদৃশ্য। শরীরটা যেন হাড় মাংসের নয়, শুধু ছায়া মাত্র। এই আছে, এই নেই।

দারোগাবাবুর নামের আর মানের জ্ঞান থাকে না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'শালা' চিতেবাঘ নাকি? ও কখ্খনো মানুষ নয়।

বাঁকাকে নিয়ে সদরের আবগারি বিভাগও আলাপ করত।

সেই বাঁকা বাগ্দিও হাঁক-ডাকের আড়ালে আসলে, দুর্গার কাছে হার মেনে পালাত। দুর্বলের পরাজয় নানান রূপে হয়। মেয়ের কাছে বাঁকা সব দিক দিয়ে দুর্বল।

দুর্গা গিয়ে দরজা বন্ধ করত ঘরে। লোকজন যে-যার ঘরে যেত মজা দেখে। কিন্তু লোক-মনের অন্তর্যামী এমনি বিচিত্র, তাদের মনে হ'ত, দুর্গা-ই দোষী। মেয়েমানুষের নাকি অমন চোপা, অত বুকের পাটা ভাল নয়।

তারপরে দেখা যেত, নিঃশব্দ পায়ে বাঁকা বাগ্দির চোরের মত প্রবেশ। খালি হাতে নয়, কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কাধাকি নয়। একগাল হেসে বাঁকা ডাকত, দুগ্গা, অ মা দুগ্গো, দরজাটা খোল্।

সাড়া পেত না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকতে হত। নক্কী মা আমার, দরজা খোল্। অনেকক্ষণ ধরে সাধাসাধি করতে হত। কখনো কখনো ঘণ্টা কাবার হ'য়ে যেত। সেই সময়টা ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যেত বাঁকার। কিছুতেই নড়ত না সে। বসে বসে অন্যায় স্বীকার করত। মেয়েকে যে সে কষ্ট দিয়েছে তাতে তার পাপ হয়েছে। নরকেও নাকি তার ঠাঁই হবে না। কিন্তু দুর্গা কতক্ষণ এরকম করবে। বাঁকার যে বড় খিদে পেয়েছে।

খোল্ মা পেটে বড় জ্বালা লেগেছে।

দরজা যখন খুলত, তখন আর দুর্গা সে মেয়েটি নয়। সারা চোখে-মুখে এলো চুল। চোখ ফুলে লাল। আঁচল ভিজত, মাটি ভিজত। দরজা খুলে দিয়ে, আবার বসে থাকত হাঁটুতে মুখ ঢেকে। চোখের জল ফেলে ফেলে, সবটুকু শেষ হত না। তখনও শরীর ফুলে ফুলে উঠত। কেঁপে কেঁপে নিশ্বাস পড়ত বড় বড়।

বাঁকা নামিয়ে দিত সামনে চাল ডাল তেল, নুন। তা ছাড়াও একটি না একটি বিশেষ জিনিস থাকত দুর্গার জন্য। হয় কাপড়, না হয় ব্লাউজের ছাপা ছিটের টুকরো। নিদেন এক শিশি আল্‌তা, অন্যথায় সস্তা স্নো, কপালের টিপ্, কাঁচের চুড়ি।

তখন বাঁকাও আর সে বাঁকা থাকত না। মুখে একটি অপরাধীর অমায়িক হাসি লেগেই থাকত ভাঙা দাঁতে। তারপর হাতখানি সন্তর্পণে বাড়িয়ে মেয়ের মাথায় রাখত। বলত, রাগ করিস্ না মা। আমি তোর বাপের যুগ্যি লই।

এতক্ষণ একলা কাঁদতে হয়েছিল। বাপের ছোঁয়ায় ও কথায়, কান্নাটা আর একবার উথ্‌লে উঠত তখন।

বাঁকার মুখে অপরাধী হাসিটুকুও আর থাকত না তখন। মুখখানি ভার হ'য়ে উঠত। তার যেন নিশ্বাস পড়ত না। শক্ত বুকটা যেন ফাটবার জন্যেই টাটাতে থাকত। সে চাপা চাপা ভারী গলায় বলত, আমি জানি, নরকে আমার ঠাঁই হবে না দুগ্‌গি। জমি বিকিয়ে যেদিনে আমাকে পেটের জ্বালা জুড়োতে হ'ল, সেদিনেই বুঝেছি, আমার মরণ ধরেছে। কপালে তোর ভোগ ছেল, তাই আমার ঘরে এসেছিলি।

দুর্গার ফোঁপানি ততক্ষণে থেমে আসত।

বাঁকা বলতেই থাকত, জন খাটার আকাল হল। কত জন খাটাবে লোকে আর? বারোমাস না কাজ হয় মাটিতে, খেটেও কুলোয় না। আর মানুষ তো গাদাগাদি খাটবার জন্যে। ই পাপের টাকা ধরেও রাখতে পারি না। তোর আমি একটা গতি করতে পারি না মা। বাড়ি আসব কি, তোকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে শুলোয়। ওসব নে' ভুলে থাকি, সে আমার এক পেকার ভাল। বাঁকা বাগ্‌দি তোর বাপের যুগ্যি লয়।

ততক্ষণে দুর্গাকে উঠতে দেখা যেত। মুখ নামিয়ে চাল ডাল দেখত। উঠে রান্নার আয়োজন করত। কিন্তু বাঁকা বকেই চলত,

যাও বা চাঁপদানিতে গে' কলেতে কাজ নিলুম। তা' শালারা নয়া মেশিন বসিয়ে দিলে বিদেয় ক'রে। এখন আর হট্ বলতে কারখানায় গে' কাজ পাওয়া যায় না। গাঁয়ে রিলিফের কাজ, তা' বা ক'দিন হয়। ঘরে ঘরে যা করছে, আমিও তাই করছি, কি করব? কিন্তু তোর কি করব দুগ্‌গো।

এদিকে বক্‌বক্, ওদিকে ততক্ষণে হয়তো দুর্গার ভাতের হাঁড়িতে টগবগ। সে বলত, নাইতে যাও।

—নাইতে যাব?

—হ্যাঁ। ভাত ফুটে গেছে।

বোঝা যেত, বাঁকার প্রাণে একটু বুঝি বাতাস লেগেছে। মেয়ে কথা বলছে যে? বলত, না দুগ্‌গো, এবার একটা ব্যাওস্থা আমি না ক'রে আর ছাড়ছি না।

শুকনো কাঠের দাউ-দাউ আগুনের ঝিলিকে, দুর্গার কেঁদে ফেলানো ঠোঁটে বুঝি বা একটু হাসির আভাস দেখা দিত। ভেজা চোখ শুকিয়ে উঠত আঁচে। জানত, কিসের ব্যবস্থার কথা বলছে। তবু সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করত, কিসের ব্যাওস্থা?

বলতে আটকাত বাঁকার গলায়। বলত, এই, তোর একটা বে'র। ভাবছি, নগিনের মেঝ ছেলেটার সঙ্গেই লাগিয়ে দেব।

ততক্ষণে দুর্গার হাসি আর বাধা মানত না। বদ্ধ জলস্রোত সহসা বাঁধ-ভাঙা হয়ে উঠত। কলহ কান্নার থমথমে আবহাওয়ায়। পচা গুমসোনির মাঝে দমকা হাওয়ার একট চকিত উচ্ছ্বাসের মত হঠাৎ উচ্চ হাসির রোল প'ড়ে যেত। বাঁধা তারের চড়া ঝঙ্কারের মত, সেটা যেন একটা নতুন রকমের আলাপ শুরু।

হাসিটা বাঁকার বদ্ধ প্রাণের আনাচে-কানাচেও বাতাস বইয়ে দিত। বলত, হাসছিস যে?

হাসবে না। বছর ভ'রে কত যে ছেলের নাম করেছে দুর্গার বাপ দুর্গার কাছে, তার লেখাজোখা নেই। যেন বাপেরা আর ছেলেরা

হাত ধুয়ে বসে আছে, দুর্গাকে নেবে বলে। আর দুর্গাও যেন বসে আছে সেজেগুজে।

দুর্গা বলত, হাসব না তো কাঁদব?

বাঁকা বলত মাথা ঝাঁকিয়ে, না এবার আর কথাটি নয়, লাগিয়ে দেবই। শালার দিনকাল গেছে খারাপ হ'য়ে। চেরকাল বাপ পিতাম'র মুখে শুনে এলুম, মেয়েকেই পণ দিয়ে নিতে লাগে। এখন শুনি ছেলে পণ হাঁকছে। সব বামুন কায়েতগিরি ফলাচ্ছে।

দুর্গা বলত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

—আঁ?

—বলছি ঝাঁটা মার।

—কাকে?

—তোমার ওই নগিনের ব্যাটাকে।

—কেন?

বলতে বলতে মেয়ের কাছে উঠে আসত বাঁকা।

দুর্গা বলত, কেন আবার? যেমন ন্যাংলা-প্যাংলা, তেমনি চোখ দুখানি। এমনি।

ব'লে নিজের চোখ ট্যারা ক'রে দেখাত।

বাঁকার যেন ভারী কৌতুক লাগত। সে আবার বলত, কেমন, দেখি দেখি।

দুর্গা আবার দেখাত।

বাঁকা এই দুর্দশাগ্রস্থ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণে শুধু যে একটি বিচিত্র শিশুরই বাস ছিল, তা' নয়। বোঝা যেত, মেয়ের সঙ্গে তার একটি হাসি-খুশির খেলার ভাবও ছিল। দুর্গার ভেংচানো দেখে, সেও আর হাসি-চাপতে পারত না। সে হাসিও যেমন-তেমন নয়, অট্টহাসি। বলত, দুর পোড়ারমুখী। দেখি দেখি আবার।

দুর্গা শুধু সেইটুকুই দেখাত না। নগিনের ন্যাংলাপ্যাংলা ছেলে আবার কেমন বকের মত চলে, সেইটুকুও দেখাত হেঁটে হেঁটে।

তখন বাপ-বেটির উঁচু গলার মিলিত হাসিতে চমকে উঠত পাড়া। হাসতে হাসতেই বলত বাঁকা, তা মুখপুড়ি, তোর জন্যে আমি রাজপুত্তর পাব কোথা, আঁ?

—মরণ! তার চে' চেরকাল আইবুড়ো হ'য়ে থাকব। আবার এদিক নেই, ওদিক। ভদ্দরনোক হয়েছে নিকি। ফিনফিনে জামা গায় দেয়, আর ঘাড়ে খড়ি মাখে। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। আবার গান নিকি করে, বায়স্কোপের গান।

—শুনিচিস?

—শুনি নি? কেঁদে ফেলে একেবারে।

ব'লে, নগিনের ছেলের গানের অনুকরণে, দুর্গা প্রায় হুলো বেড়ালের মত ডেকে উঠত। আবার বাপ-বেটির হাসি পাড়ার আকাশ দিত ভরিয়ে।

পাড়ার লোকেরা বলত, অই, অই শোন এবার। এই মারামারি, কাটাকাটি, আবার কেমন হেসে মরছে। ওদের কথায় যাবে কথা বলতে? মরণ নেই আমাদের, তাই।

তা' বটে। মরণ না থাকলে কখনো কেউ এমন বাপ-বেটির ব্যাপারে কথা ব'লে বেকুব হয় না।

হাসির পরে নাওয়া খাওয়া। বাপকে খাইয়ে, মাটির কলসীটি নিয়ে দুর্গা যেত সরোবরে। ভর দুপুরের সরোবর, নিরালা। একলা ঘাট, সরোবর যেন একাকিনী মেয়েটির মত বাতাসের দোলায় একটু একটু দুলত। তার বুকের কোথাও বটের ছায়া, কোথাও দেবদারুর। ছোট ছোট দোলায় এক পাশ থেকে কুঁড়ি ও ফোটা পদ্মফুলেরা মাথা দুলিয়ে হাসত। পানকৌড়িটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত সরোবর। নীল পানকৌড়ি, লাল ঠোঁট আর কালো চোখ দুটি নিয়ে বিবাগীর মত বসে থাকত কদমের ডালে।

জলে পা ডুবিয়ে বসত দুর্গা। কলসী কোলে নিয়ে, বুকে চেপে গলা জড়িয়ে ধরে, সরোবরের জলের দিকে তাকিয়ে দেখত। দেখতে

দেখতে সে হাসত। সেই হাসি দেখে হাসত জলের ছায়া। জিজ্ঞেস করত, আ মরণ! হেসে মরছ কেন?

দুর্গা বলত, নগিনের ছেলের কথা মনে ক'রে।

তখন ছায়াটিও হাসত। তারপর গম্ভীর হ'য়ে উঠত ছায়া তীক্ষ্ণ চোখে তাকাত দুর্গার চোখের দিকে। দুর্গার বুঝি রাগ হ'ত। বলত, কী দেখছিস্ লো?

ছায়া বলত, দেখছি তোকে।

—কী দেখছিস?

ছায়া হাত বাড়িয়ে দিত দুর্গার গায়ে। আঁচল সরিয়ে নিতে চাইত বুক থেকে। ছি! ছি ছি ছি! ছায়া তোর মরণ নেই।

ছায়া বলত, আমার তো মরণ নেই। নিজের মরণ দ্যাখ একবার। ছ' বছর আগে তো খুব দেখতিস। নতুন নতুন সময়ে। আজ যে আঠারো ছুঁতে চললি, আজ বুঝি ভুলে মেরে দিয়েছিস্, কী বয়ে বেড়াচ্ছিস সারা অঙ্গে। তোর বয়সী একটা মেয়েও সারা গাঁয়ে আইবুড়ো আছে? তাও বাগ্দির ঘরে? তুই কি আর এখন মেয়ে আছিস? কয়েক বছর আগে ছিলি। এখন তুই মাগী হয়ে গেছিস, সে কথাটা মনে রাখিস।

—মনে রেখে কী করব?

—নগিনের ব্যাটার কথা ভেবে অত হাসি কিসের। এত হেনস্থা কেন?

—মরণ!

—কেন? তবে কাকে তোর মনে ধরে?

—ভেবে পাইনি কো।

—পেতে হবে না? সেই কদমাকে নয় তো?

—কে কদমা?

—আহা! মনে নেই যেন। ভুলে গেলি এর মধ্যেই? সেই তিন বছর আগে, খাল ধারের জঙ্গলে, কদমা তোর গায়ে হাত দেয় নি?

—সে তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে, জোর ক'রে।

ছায়াকে জবাব দিতে দিতে দুর্গার চোখে আগুন জ্বলে উঠত। বলত, ওকে এখন পেলে আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

ছায়া বলত ভ্রূ কুঁচকে, একে দেখে রাগ, তাকে দেখে হাসি। এমনি ক'রে দিন যাবে?

দুর্গার দু' চোখে সরোবর টলটলিয়ে উঠত। বলত, ব'লো না। আমার কান্না আসছে।

ছায়া বলত, হ্যাঁ কাঁদ। এই কান্নাটুকু কাঁদবি ব'লেই তো এসময়ে সরোবরের ধারে এসেছিস। সব কান্না লোকে দেখবে। শুধু এইটুকুই আমি ছাড়া আর কেউ দেখবে না! কাঁদ, কেঁদে ভাব্।

কলসীর মুখে মুখ দিয়ে কাঁদত দুর্গা। বিবাদ নয়, অভিমান নয়, সেটা ছিল দুর্গার আপনি-আপনি কান্না।

জীবনের এই রঙ্গ দেখে, সরোবর আরো দুলে উঠত। এই কদম দেবদারুর ছায়ারা, অনড় স্নেহশীল বৃদ্ধের মত মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে যেন বিষন্নভাবে হাসত। তারা বাতাস দিয়ে জুড়িয়ে দিতে চাইত দুর্গাকে।

বোধ হয় সেই কান্নাটুকুই ছিল তার সেই গহীন অন্ধকার ভাবনার প্রকাশ, বাবা একদিন মারা যাবে। এদিন থাকবে না।

ওদিকে বাঁকার অবস্থাও তেমনি। হাসি হত, খাওয়া হত, শান্ত হত, দুর্বাসা মেয়ে। তবু, গা এলিয়ে শুতে গিয়ে পুরোপুরি শুতে পারত না। আড়ষ্ট হ'য়ে থাকত। চোখ বুজতে গিয়ে ঘুম আসত না। কোথায় একটা অস্বস্তি, একটি নাম-না-জানা ভয় তার বুক জুড়ে পাষাণ ভারে চেপে থাকত। সে জীবন পরিক্রমা করত আবার। সেটা কি জীবন। কাকের আবার বাসা। আজকে এ-গাছ মানুষে কাটল তো, কাল ও-গাছে। কাল ও-গাছ কাটল তো পরশু ওই ফোকড়ে। মানুষ হ'য়ে, সে শুধু জীবনধারণের গ্লানি সামান্য এই ভিটেটুকুও রোজ যাই যাই করে।

জীবনে এখন শুধু কাঁটা ঝোপ, জঙ্গল, অন্ধকার। আর একদিকে অথৈ পারাবার। জঙ্গলটাকেই বেছে নিতে হয়েছিল বাঁচার জন্যে। গোটা তল্লাটের সে আদর্শ বে-আইনী মদ চোলাইকর। দুর্দ্ধর্ষ চোলাই-চালানদার। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভদ্র অভদ্র, সকলের ঘরে ঘরে চোলাই। কে চোলাই করে, আর কে করে না, বুঝে ওঠা দায়। চালান যায় দূর দুরান্তে। দূরের মধ্যে প্রধানত কলকাতায়, কাছাকাছি চন্দননগর।

মাথার ঘা'য়ে কুকুর পাগলের মত অবস্থা আবগারি বিভাগের। এই তল্লাট নিয়ে তাদের বিস্ময়ের ও ক্রোধের শেষ নেই। এখানে চোলাই আর চোরা চালান যেন অদৃশ্য ভূতুড়ে কারবার।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে নাম বাঁকা বাগ্দির। কিন্তু তার মূলধন ছিল না। চিরদিন পরের কারবার ক'রে গিয়েছে।

মনে মনে জীবনের দিগন্ত ঘুরেও, একটি অসহায় ভয়ের কাছে আড়ষ্ট হ'য়ে প'ড়ে থাকত বাঁকা। বোধ হয়, কাঁটা-ঝোপ জঙ্গলের পাশে অথৈ পারাবার তার মরণের প্রতীক হ'য়ে থাকত।

দু'বছর আগে, সেই বাঁকা বাগ্দি যেদিন মারা গেল, সেদিন বোঝা গেল, তার সেই অথৈ পারাবার মরণেরই প্রতীক। সেই অকূল পারাবার দুর্গার সামনে। মরণের আবর্ত্ত তার চারপাশে পাক খেয়ে আসছিল।

লোকে বলত, এমন বাপ থাকা না থাকা সমান। কথাটা যে মিথ্যে, সেটা বাঁকা বাগদি মরে প্রমাণ করেছিল। সে না থাকাও যে কতখানি থাকা, বাপের মরণের মুহূর্ত্তেই বুঝতে পেরেছিল। বাঁকা বাগ্দির অস্তিত্ব আছে এই পৃথিবীতে, এটা যতদিন জানা ছিল, ততদিন সেই সাপেরা গর্ত্ত ছেড়ে বেরুতে পারে নি, সেই সব

নখালো থাবারা এগিয়ে আসতে পারে নি দুর্গার দিকে। কুটিল মস্ত চোখের পাতা ওঠে নি সহজে।

দুর্গা দেখতে পেয়েছিল, তাদের সাজো-সাজো রব পড়েছে।

বাপকে তাই সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছাড়তে পারে নি। শ্মশানে গিয়েছিল। বাঁকা বাগ্‌দির সাঙ্গপাঙ্গর অভাব ছিল না। অনেক সাক্‌রেদ তার। কাঁধে নেবার, শ্মশানে যাবার লোকের অভাব ছিল না।

শ্মশানের বেদো ডোম শুধু আফসোস ক'রে বলেছিল, বাঁকা দাদার হাতে রস অমর্ত হয়ে উঠত। অমন তাগ্‌বাগ ক'রে আর কেউ চোলাই করতে পারব না।

কথাটা মিথ্যে নয়। বাঁকার মদের নামও ছিল। এই তল্লাটের চোরাই খরিদ্দারেরা যাচিয়ে নিত, মালটা কার? বাঁকার হাতের তো? দেখ, মিছে বল না বাবা। তোমাদের জলো হাতের হ'লে হবে না। কড়া ধাতের জিনিস চাই, যেন ভদ্দরলোকের পাতে দেয়া যায়।

আর একটি লোক এসেছিল সাইকেল চালিয়ে। ফিনফিনে কাচির ধুতি, কিন্তু হাঁটু অবধি তোলা। পাতলা কাপড়ের জামা। চিতনো বোতাম পটিতে, চেন্ দেওয়া সোনার বাতাম। লাগানো নেই, খোলা। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে এসে নেমেছিল সাইকেল থেকে। সকলের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কথা বলছিল গুজ্‌গুজ্ ফিস্‌ফিস্ ক'রে।

লোকটিকে চিনত দুর্গা। নাম ওকুর দে। অর্থাৎ অক্রূর দে। গাঁয়ের তিলিপাড়ায় বাড়ি। নানান কারবারের কারবারী। এখানেও স্টেশনের ধারে, হাটে আছে কাপড় আর রিকশা সাইকেল ইত্যাদি বেচা-কেনা মেরামতির দোকান। মহকুমা শহরেও ব্যবসা আছে, বাড়ি আছে। একটা মোটর গাড়িও নাকি আছে। গাঁয়ে সেটাকে আনা হয় মাঝে মাঝে।

ওকুর দুর্গাদের বাড়িও এসেছে কয়েকবার। কিন্তু দুর্গার দেখা

পায় নি। ওকুর তার বাবার মহাজন, কারবারের কারিগর ছিল। বাবাকে খাতির ক'রে চলত। কেউ কারুর মাথায় চড়তে পেত না বিশেষ, কারবারের ধরনটা এমনি। তবু ওকুরদে'র টাকা ছিল। সেটাই তো জীবনের দুর্ভেদ্য বর্ম।

তারপরেই একজনের কথায়, ওকুর দে ফিরে তাকিয়েছিল দুর্গার দিকে। বাপের চিতা সাজানোর দিকে চোখ থাকলেও, দেখতে ভুল করে নি। ওকুর রোদের দাপটে মুখ কুঁচকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল তার দিকে! তারপর পকেটে হাত দিয়েছিল।

একটু পরেই তার বাপের সাকরেদ ভোলা এসে দাঁড়িয়েছিল দুর্গার কাছে। বলেছিল হাত বাড়িয়ে, এই নাও ওকুরবাবু দিলেন। বললেন, মশানেই দিলুম, আবার কবে দেখা হবে না হবে। বাঁকার মেয়েকে না দিলে আমার পাপ হবে।

দুর্গা ভ্রূ কুঁচকে দেখছিল পঞ্চাশটি টাকা। বলেছিল ভোলাকে, এখন তোমার কাছে রেখে দাও। বাড়ি গে' আমাকে দিও।

হয়তো ওকুর চলে যেত। তার আগেই আরো তিনটি সাইকেল এসেছিল। আবগারি পুলিসের নর্থ মহকুমার অফিসার ইনচার্জ, সাব-ইনস্পেক্টর আর জমাদার। তিন জনকেই চিনত দুর্গা। এক-আধবার নয়, অনেকবার বাড়িতে এসেছে তারা। বাঁকা বাগ্‌দি থাকতে এসেছে, না থাকতেও এসেছে। ঘর দোর দেখে, দুর্গাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে চলে যেত।

ওকুর হাত তুলে নমস্কার ক'রে ছুটে গিয়েছিল, আরে বাপ্‌রে বাপ, আপনারা?

অফিসার ইনচার্জ সুরেশবাবু, চকিত ধূর্ত চোখ, মোটা মানুষ। বলেছিলেন, আপনি কেন?

ওকুর বলেছিল, যাবার পথে খবর পেলুম। চেনা লোক, তাই আসা।

সুরেশবাবু বলেছিলেন, ও! আমরা অফিসে বসেই খবর

পেয়েছি, বাঁকা বাগ্দি নাকি মারা গেছে। বাঁকার ব্যাপার তো, দেবা না জানন্তি। ব্যাটা সত্যিই মরল, না, না-মরে মরল একবার না দেখতে এসে পারলুম না।

—কেন ?

—বলা তো যায় না। এও আবার বাঁকার কোনো চালাকি কি না কে জানে ?

তারপরে হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, যাক্, তবু মনে মনে একটা সান্ত্বনা থাকবে, ব্যাটা মরেছে। যদিও ভুলতে অনেক দিন সময় লাগবে। এত কষ্ট আমাকে আজ পর্যন্ত আর কেউ দিতে পারে নি। শেয়ালের চেয়ে ধূর্ত বললে ভুল হবে, তার চেয়ে কয়েক কাটি সরেস ছিল।

এগিয়ে এসে দেখছিলেন বাঁকার শব। পুলিস দেখে আরও অনেক লোক এসেছিল। শ্মশানে সচরাচর এত লোক হত না। আশেপাশের তেমন তেমন মানুষ মরলেই একমাত্র ভিড় হ'ত শ্মশানে।

কোনো একজনের ওপর নয়, পুলিস কিংবা ওকুরের ওপর শুধু নয়, গোটা সংসারটার প্রতি যেন দু'চোখ ভরা আগুন দিয়ে তাকিয়েছিল দুর্গা। ইচ্ছে করছিল, বাপের মরা শরীরটা বুকে নিয়ে কোথাও ছুটে চলে যায় সে।

পারেনি। শুধু তাকিয়ে ছিল খালের জলের দিকে।

সুরেশবাবু বাঁকার মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে, গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলেন! ঘাড় নেড়েছিলেন নিঃশব্দে।

কেবল বেদো ডোম ব'লে উঠেছিল, অই, অই ঠিক বলেছেন বাবু।

সুরেশবাবু অবাক হ'য়ে বলেছিল, কী আবার বললাম হে ?

বেদো হেসে বলেছিল, বলবেন কেন, অই যে ঘাড় লাড়লেন, অই ঠিক। কিছু বলবার নেই বাবু। দেখুন, মরে গেছে, আর কিছু নেই।

সুরেশবাবু বেদোর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ব'লেছিলেন, হুঁ। সকালেই পেটে পড়েছে দেখছি।

ভুল বলেছিলেন। বেদোর পেটে কিছুই পড়ে নি, এক ডোমনীর দেওয়া চা' ছাড়া। সে একটা গুরুগম্ভীর সত্য বলবার চেষ্টা করছিল মাত্র দারোগাবাবুকে।

সুরেশবাবু ওকুরের দিকে ফিরে বলেছিলেন, বাঁকা বাগ্‌দি তো ম'রে জুড়োল। কিন্তু আপনার ডান হাত খসে গেল যে?

ওকুর দে' বিগলিত হেসে জবাব দিয়েছিল, কী যে বলেন স্যার।

—খসে নি বলছেন। তা' হ'লে এরকম আরো আছে বলুন।

ওকুর দে' তেমনি হেসে জবাব দিয়েছিল, আমার কিছুই নেই সার।

—হুঁ।

সুরেশবাবু চারদিক তাকিয়ে বলেছিলেন, বাঁকা বাগ্‌দির দেখছি অনেক দোসর বান্ধব। তল্লাট ঝেঁটিয়ে এসেছে শ্মশানে।

—আজ্ঞে না, সব আপনাদেরই দেখতে এয়েছে।

তারপর পুলিসের সঙ্গে ওকুর দেও চলে গিয়েছিল।

বাপকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফিরে এসেছিল দুর্গা খালে ডুব দিয়ে। সকলেই ফিরে এসেছিল তার সঙ্গে সঙ্গে। ফিরে যে যার কাজে গিয়েছিল। সকলে যায় নি। কয়েক জন সব সময়েই ছিল। মেয়েদের মধ্যে বিন্না বুড়ি আর প্রৌঢ়া মতি মুচিনী সঙ্গ ছাড়ে নি।

গাঁয়ে ফিরে এসে আর একবার ডুব দিতে গিয়েছিল দুর্গা সরোবরে। সময়ে অসময়ে সরোবরে ডুবতে সে ভালবাসত। সেদিন আবার না ডুব দিলে তার প্রাণ জুড়োত কেন।

যেমনি ডুব দিয়েছিল, তেমনি শুনতে পেয়েছিল দুর্গা, তার সখী ছায়া এসে বলছে, আর ডুব দিয়ে উঠে কাজ নেই।

—মরে যাব যে?

—ঘাটের ওপরে, এ সোম্‌সারেই বা তোর কোন বাঁচনদারেরা আছে। দেখিস নি, চিনিস্‌নেকো, কারা আছে ওপরে।

--জানি। কিন্তু ডুবে মরা যায় কেমন ক'রে, জানি না যে?

—জোর ক'রে ডুবে থাক্।

—আপনি আপনি ভেসে উঠছি যে?

ছায়ার টানা-টানা নিশিন্দাপাতার মত চোখের কোণ দুটি কুঁচকে উঠেছিল! বলেছিল, ও, সাধ আছে, সাহসও আছে বেঁচে থাকবার। তা, হ'লে ভালো।

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করেছিল দুর্গা। বিন্না আর মাতি অনেক রাত্রি অবধি ছিল। ফিরে গিয়েছিল এক সময়। না, এ মেয়ের কোনো দিশা পাওয়া যায় নি।

মধ্য রাত্রে ঘরের বাইরে এসে বসার ইচ্ছে হয়েছিল দুর্গার। দরজা খুলে দেখেছিল, দাওয়ার ওপরে লোক। পুরুষমানুষ।

—কে?

—আমি ভোলা।

ওকুরের দেওয়া টাকা ছিল ভোলার কাছে। সেই অধিকারেই বুঝি সে দাওয়ায় বসে ছিল। কিন্তু সজনে গাছের গোড়ায় ওটা কার ছায়া?

কেষ্টর। কেউ-ই অচেনা নয়। আশেপাশেরই চেনাশোনা লোক সব। আর তার বাপেরই সাকরেদ। উদ্দেশ্য বুঝি গুরু কন্যার ভাল-মন্দ দেখা। কিন্তু ভোলা কেষ্ট, কাউকেই তো চিনতে বাকি ছিল না দুর্গার। সেদিন দুর্গার ভালমন্দ দেখার সাহস পেয়েছিল ওরা। অনেক দিন থেকে দেখতে চেয়েছিল, পারে নি।

ফিরে এসে দরজা বন্ধ করেছিল দুর্গা। চোখ বুজে দেখতে পেয়েছিল আরো অনেক এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। একদিন দুদিন, সপ্তাহের মধ্যেই সবাই আসবে না। আযৌবন আসতে থাকবে, আসতেই থাকবে।

পরদিন ভোলার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল দুর্গা। রান্না করেছিল, খেয়েও ছিল। মাঝরাত্রে আবার বাইরে আসবার জন্য দরজা খুলে দেখছিল, ভোলা বসে আছে। কেষ্টর ছায়াটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছিল সেদিন।

দুর্গা দরজা বন্ধ না করেই ঘরে ঢুকেছিল। বেরিয়ে যখন এসেছিল, হাতে ছিল তখন বাঁকা বাগ্‌দির সেই আঁশ-কাটা শড়কি। শড়কির চেয়েও বেশী ধার ছিল দুর্গার চোখে। অন্ধকারেও চাপা ছিল না সেই চোখের আগুন।

মূর্তি দেখেই ভোলা নেমে দাঁড়িয়েছিল দাওয়া থেকে। 'তুমি'ও আসে নি দুর্গার মুখে। চাপা গর্জন বেরিয়ে এসেছিল, এই হারামজাদা, বাড়ি যা। ফাঁসী যাব, কিন্তু তোকে যেন আর কোনদিন আমার উঠানে না দেখি। ওই কেষ্টা পাঁটাকেও নিয়ে যা।

স্বয়ং ভগবতীও অমন রুদ্রাণী বেশে হঠাৎ দেখা দিলে বোধহয়, কেষ্ট আর ভোলা অত অবাক হ'ত না। দুজনেই ওরা ভোজবাজীর ছায়ার মত পালিয়েছিল।

কিন্তু গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা সারি সারি পিঁপড়ের মত ব্যাপার। সেই গর্তের মুখ যে কোথায়, কত লম্বা, কত সর্পিল সারি, সহসা টের পাওয়া যায় না। সেই সারির সামনের দুটি ভোলা আর কেষ্ট। বাকীদের পায়ে পায়ে আসার কামাই ছিল না। কত তার রূপ, রঙ্গ, বিচিত্র বেশ, কত রকমারি ছল-চাতুরি।

বিন্না মাতিও সেই সারিরই মানুষ। সরাসরি প্রস্তাব এনেছিল। মাঝখান থেকে মাতি গাল দিয়েছিল 'বাপ ভাতারি' ব'লে। মার খেয়ে মরেছিল সরোবরের ধারে। শহর যাওয়া-আসা কুটনীর ফুলেলতেল মাখা চুলের গোছা উপড়ে নিয়েছিল দুর্গা।

কিন্তু দিন যাপন? আশ্রয়? সংসারে মানুষ না থাকলে ছেলের বিয়ে হতে চায় না। মেয়েকে বিয়ে করবে কে? যেচে বিয়ে করতে চাইত হয় তো নগিনের ছেলে। তবে বাপ বেঁচে থাকতেই করে নি কেন? শাক বেচতে যাবে? ধান ভানতে যাবে? কিন্তু ভবী ভোলে কই। পিঁপড়ের সারি যে সঙ্গ ছাড়ে না।

পাড়ায় লোক ছিল না? তাদের স্নেহ ছিল না?

ছিল। যাদের স্নেহ ছিল, তাদের সংস্থান ছিল না। যাদের

সংস্থান ছিল, তাদের কাছে ভরসা ছিল না। যারা দায় নিতে চেয়েছিল, তাদের দায়িত্ব ছিল না।

এইটাই কি জীবনের নিয়ম? এ কি বিড়ম্বনা। শুধু দিন চলে যাচ্ছিল, কিন্তু জীবন আগেও যাচ্ছিল না, পিছনেও ফিরছিল না। দিনে দিনে শুধু দুর্গার ঠোঁটের কোণ দুটি ঘৃণায় ও শ্লেষে বেঁকে উঠেছিল। চোখের চাউনি হ'য়ে উঠেছিল কঠিন। জ্বালা জুড়োবার ছিল সরোবরের শীতল জল। কথা বলার ছিল সেই ছায়া। সেই ছায়া দুর্গার সঙ্গে কী একটা বিচিত্র বাজী ধরে বসেছিল যেন।

মাস দু'এক হয়েছিল তখন বাঁকার মরণের পর। সেই সময় ঘটনা ঘটেছিল একটা।

সন্ধ্যা পার হ'য়ে গিয়েছিল। সবে ঘোর হয়ে আসছিল অন্ধকার। যমুনা মাসীর দিয়ে যাওয়া চাল ক'টা ফোটাচ্ছিল দুর্গা। শুকনো পাতা জ্বেলে টিমটিমে লণ্ঠনের চেয়ে পাতার আগুনের আলো-ই বেশী ছিল। দুর্গার গায়ে কাঁপছিল সেই আগুনের শিখা। তার আকাশপাতাল ছিল না ভাবনার। যথা নিয়মে ডাঁই করা পাতা থেকে থাবায় থাবায় আগুন দিচ্ছিল। চুল বাঁধেনি, চিরুণী দিয়েছিল। কপালটা একেবারে খালি রাখতে নেই, একটি বিন্দু ছুঁইয়ে রেখেছিল খয়েরি রংএর। হাওয়ায় শীতের আমেজ। বাপের শেষ কিনে দেওয়া লাল জামাটি ছিল গায়ে। পুরোনো ডুরে শাড়িটি ছিল পরা।

কিছুক্ষণ আগেও চাঁদু ঘড়ামির বউ যমুনা মাসী বকর-বকর করছিল। ওরকম কয়েকজন ছিল, যারা রোজই আসত বসত গল্প করত। যমুনা মাসী চলে গিয়েছিল। পাখিরা চুপ করেছিল অনেকক্ষণ। ঝিঁঝিরা ডাকাডাকি করছিল।

সেই সময়ে, শুক্‌নো পাতা মড়মড়িয়ে, মাটি কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে

এসে উঠেছিল লোকটা। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি। তার মধ্যেই চকিতে একবার দেখে নিয়েছিল দুর্গা, মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, বোতাম-খোলা নীল হাফসার্ট! ছেলে একটা। লম্বা, একহারা চকচকে দুটি চোখ।

সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েছিল দুর্গার। ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল, দুর্গা তোর ঘরে লুকোলুম, চেপে যাস্।

দুর্গা জায়গা ছেড়ে ওঠেনি। উঠোনের কোণে, ঢেঁকির ছাউনির ধারে, উনুনের পাশেই বসে, ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল দাঁত দিয়ে। নাম ধরে ডাকতে শুনে অবাক হয়েছিল। তার চেয়েও বেশী অবাক হয়েছিল, অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকতে প'ড়ে দেখে। কে? কে হ'তে পারে? পরমুহূর্তেই বোধ হয় চিনে ফেলেছিল মনে মনে।

আর সেই চেনা-চেনা ভাবের মুহূর্তেই আরো কয়েকটি পায়ের শব্দ ছুটে আসছিল এদিকে। শুনতে পেয়েই দুর্গা হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল, মরণ! মুখে আগুন অমন মিনষেদের। অমন শ্যাল কুকুরের মতন যদি ছুটেই মরতে হয়, অমন কুকাজ করতে যাওয়া কেন?

তার কথা শেষ হতে না হ'তেই আবগারি জমাদার নাম করা সাহসী ও ধূর্ত কাসেম দু'জন সঙ্গীসহ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কাসেম জিজ্ঞেস করেছিল, কাকে বলছ?

দুর্গা মুখ না তুলে, উনুনে পাতা ছুঁড়তে ছুঁড়তেই বলেছিল, অই যমকে। বাঁশঝাড়ের দিকে দৌড়ে পালাল। মড়াদের কি চিনি। আন্‌জাদেই বুঝেছি, এসবই কিছু হবে। এমন চমকে উঠেছি শব্দ শুনে। কিরে, বাবা, বাঘ ভালুক নিকি। তা পরে দেখলুম, না, মানুষ। তাই বলছিলুম, অমন আঁদাড়ে-বাঁদড়েই যদি ছুটে মরতে হবে তো, ওসব করা কেন?

কাসেম ততক্ষণে সঙ্গীদের হুকুম দিয়েছিল, যা যা, ছাখ,

বাঁশঝাড়টার দিকে যা। ও শালা সব্বেনেশে মাল। ওকে মানুষে ধরতে পারবে না।

বাপের আমলের পুরোনো সম্বন্ধটাই টেনে এনেছিল দুর্গা। বলেছিল, কার কথা বলছ চাচা?

কাসেম বলছিল, ই'টি নতুন, কিন্তু ভারি ধড়িবাজ। চিরঞ্জীব বাঁড়ুজ্জে, বামুনপাড়ার ছেলে। কলেজের বিদ্যেও কিছু আছে তো পেটে। দল পাকাচ্ছে।

দুর্গা চোখ কপালে তুলেছিল। শুধু তার সেই ছায়া কানে কানে বলেছিল, আ পোড়ারমুখী ঢঙ্গী, কত ছলা-কলাই জানিস। বলেছিল, সে কি গো চাচা। তিন বছর আগে না চিরোঠাকুর স্বদেশী ক'রে জেল খেটে এল।

কাসেমের দৃষ্টি অন্ধকারে। অন্যমনস্কের মত বলেছিল, অই, বলে কে?

একটু পরে কাসেম দুর্গার দিকে তাকিয়েছিল। কাসেম বাঙালী মুসলমান, বাড়ি মুর্শিদাবাদ। বদ্‌রাগী জমাদার ব'লে নাম আছে। সাহসও খুব। আবগারি জমাদার না হ'লে নাকি ভয়ংকর ডাকাত হ'তে পারত সে। কিন্তু মানুষ বড় ভাল। তারা সম্পর্কে কেউ কোনোদিন বিশেষ মন্দ কথা বলতে পারে নি। দোষ যদি বলা যায়, একটিই আছে। অনেকদিন রয়েছে এখানে বিবি বাচ্চা ছেড়ে। বিধবা চানি মুচিনীর সঙ্গে একটু গোপন বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে।

কাসেম লুঙ্গি পায়জামার ধার ধারে না। চিবুকে গুচ্ছের দাড়িও নেই। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখদুটির কোলে নিয়মিত সুর্মার টান আর রং মাখিয়ে লাল্‌চে গোঁফ জোড়া তার নাম জাত ও চরিত্রের একটি সার্থক রূপ দিয়েছে। বয়স বছর পঞ্চাশ বাহান্ন হবে।

দুর্গার দিকে তাকিয়ে, তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চাউনি কোমল হ'য়ে এসেছিল। বোধ হয় আসামীর আশা ছেড়ে দিয়েছিল সে। বলেছিল, তোমার চলছে কি ক'রে গো বেটি?

ভাল-মন্দর তল্লাসীদার অনেক। দেখে দেখে দুর্গাও ভাল-মন্দ চিনতে শিখেছিল অনেকদিন। বলেছিল, ভিখ্ মাগার চেয়েও খারাপ চাচা।

—কেন মায়ি?

—বেপরোয়া হ'য়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিখ্ মাগতে পারলে তবু বুঝতুম, ভিখিরি হয়েছি। তাও পারি না। খেটে খাবারও তো যো দেখি না এ পোড়া দেশে।

কাসেম অভিজ্ঞ। এ পোড়া দেশে দুর্গার খেটে খাবার অসুবিধা কোথায়, সেটা অনুমানে অপারগ ছিল না সে। কিন্তু শুধু মিঠে কথায় চিড়ে ভেজে না। কাসেম তো কোন উপকার করতে পারবে না দুর্গার। একটা দমকা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ঠিক বলেছ বেটি। দুনিয়ায় আর ইমান কথাটার দাম নাই। তোমার কথা ভাবলে আমাদেরো বুক শুকিয়ে ওঠে। কোন পথ দেখাতে পারি না।

দুর্গা চুপ করেছিল। কাসেমের স্নেহে, নিজের কষ্টটা যেন হঠাৎ বড় বেশী আতুর ক'রে দিয়েছিল তাকে। তারপর পাতা নিভে আসতে দেখে, তাড়াতাড়ি শুকনো পাতা উনুনে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, চাচা, আমার বাপ নিকি চেরটাকাল পাপ ক'রে গেল। নিজেও অনেক গাল মন্দ করেছি, কিন্তন কেউ তো কোন পথ দেখাতে পারে নি। ভাল মানুষটি হ'য়ে বাপ-বেটিতে মরবার পথ ছেল। আমার লুভিষ্টি বাপ সেটুকুন সামলাতে পারে নি। কাকা চার সন আগে ধান কাটার গোলমাল নে' যখন পুলিস ছাউনি ফেলেছিল এই গাঁয়ে। গুলি মেরেছিল, লাঠি মেরেছিল, তখন আমাকেও ধ'রে নে গেছল মহকুমায়। তখনো নেকচার শুনিচি। কিষেনেরা অন্যায় করেছে। যারা নেকচার দেয়, তারা বড় ভাল। বাঁকা বাগ্দিরা মন্দ, ওরা নেকচার মানে না। তাঁরাই পারেন না, তুমি কি ক'রে পথ দেখাবে কাকা?

কাসেম বিব্রত হয়ে বলেছিল, আমি তোমার বাপের বিষয় কিছু বলি নাই গো মায়ি।

হেসে বলেছিল দুর্গা, তা জানি কাকা। এতটুকু তুমি বলেছ, সেটুকুনই আমার অনেকখানি।

কাসেম নিশ্চিন্ত হেসে বলেছিল, এবার সেইটে বাকী আছে। তবে, কে করছে না বল? ভদ্দর অভদ্দর, কাউকে তো বাকী দেখছি না। এখন যে কোন্ মোকামে রান্না হয়, আর কোন্ মোকামে চোলাই হয়, তাই ধরতে পারি না। ইনফর্মাররা যেসব ঘরের সংবাদ আনে, তোবা, তোবা, ওসব মোকামে আবগারি পুলিসের ঢুকতে নিজেদেরই শরম লাগে।

কাসেমের লোকরা ফিরে এসেছিল হতাশ হয়ে। পাওয়া যায় নি।

কাসেম হঠাৎ হেসে উঠেছিল সঙ্গীরা আসার পর। বলেছিল, আমরা কিন্তু আসলে বোকা বনেছি। ওর পেছনে ছোটার কোন দরকার ছেল না।

—কেন?

—লোকটা যদি চিরঞ্জীবই হয়, হাতে কি ওর মাল ছিল? কই, কিছুই চোখে পড়ে নি তো? ও ছুটল দেখে আমরাও ছুটলুম। আসলে মাল নিয়ে দোসরা লোক দোসরা রাস্তায় গেছে। ও আমাদের ছুটিয়ে এনেছে অন্যদিকে।

সঙ্গীদের যেন দিব্যদর্শন ঘটেছিল, এমনিভাবে তাকিয়েছিল তারা। তারপরে তারা দুর্গা আর কাসেমের দিকে তাকিয়েছিল, দুজনের মধ্যে কিছু আছে কি না।

চলে গিয়েছিল তারা।

পাশাপাশি সব বাড়ি। অনেকেরই লক্ষ্য পড়েছিল কাসেমের আসা। পলাতককে কেউ দেখতে পায় নি। দু' এক জন এদিক ওদিক থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, কি হল রে দুগ্‌গা, যমেরা কাকে খুঁজছে?

দুর্গা জবাব দিয়েছিল, মরণকে।

একেবারে নিশ্চিন্ত মনে দুর্গা পাতা পোড়াচ্ছিল। যেন খেয়ালও নেই, ঘরে কেউ ঢুকে বসে আছে। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছিল, চোখে তার রাগ ও হাসির একটি যুগপৎ খেলা চলছিল। রাগটা বোধ হয় নিজের ওপর। হাসিটা পলাতকের কথা ভেবে।

ভাত হয়ে গিয়েছিল। একেবারে ফ্যান ঝরিয়ে, হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সে। ঢুকে দেখেছিল, অন্ধকারে বিড়ির আগুন জ্বলছে এক কোণে। বেরিয়ে গিয়ে, দুর্গা লম্ফটা নিয়ে আসছিল। সেই চিরোঠাকুরই বটে।

চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়িয়েছিল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করছিল, কাছাকাছি কোথাও ওৎ পেতে নেই তো?

দুর্গা স্বভাবমত আঁচলটা তুলে নিয়ে এসেছিল ঠোঁটের ওপর। মনের বিস্ময়টুকু সে মুখে ফুটতে দেয় নি। সে দেখছিল চিরঞ্জীবকে। এই তো সেদিন স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকেছিল। স্বদেশী করেছিল, জেলে গিয়েছিল চিরোঠাকুর। এর মধ্যেই সোঁ সোঁ করে বিড়ি ফুঁকছে। চোখে মুখে পাকা পাকা ভাব। দুর্গার চেয়ে ছোট না হোক বড়ই বা কতটুকু।

দুর্গা শুধু বলেছিল, বীরপুরুষ।

চিরঞ্জীব সেদিকে কান না দিয়ে নিজেই অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়েছিল। বলেছিল আপন মনে, মালটা ফেলে এসেছি সরোবরের জঙ্গলে, হাতছাড়া না হয়ে যায়।

দুর্গা বেশ পাকা পাকা গলায়, একটু শ্লেষের ঝাঁজ মিশিয়ে বলেছিল, এসব বিত্তে আবার কবে থেকে ধরলে?

চিরঞ্জীব আবার আপন মনে বলেছিল, আর একটু বাদে বেরুব। কাসেমের ব্যাপার তো।

দুর্গা ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, কালা নাকি?

চিরঞ্জীব বলেছিল, কী, বলছিস্ কী?

কথার স্বরে একটু তীক্ষ্ণতা ছিল চিরঞ্জীবের। লোকটা রাগ করেছে কি না বুঝতে চেয়েছিল দুর্গা।

একই গ্রামের ছেলে মেয়ে। এ-পাড়া আর ও-পাড়া। তবে ব্যবধানটা ছিল দুস্তর। শত হলেও বামুন আর বাগ্দি। জাত মানের আঁটন বাঁধন তো চিরদিনই আর আজকের মত জলে ধুয়ে যায় নি। স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হত।

তবু চেনা পরিচয় ছিলই। যেমন থাকতে হয়। পুরুষেরা তাকিয়ে চলে যায়। মেয়েরা চোখ নামিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে পাশ দেয়। গাঁয়ের লোক কে কাকে না চেনে?

দুর্গা বলেছিল, বলছি, এসব আবার কবে থেকে ধরেছ?

চিরঞ্জীব জবাব দিয়েছিল, এই সবে।

চিরঞ্জীবের গাম্ভীর্য দেখে, সহসা আর কোন কথা বলতে পারেনি দুর্গা। কিন্তু চিরঞ্জীব যেন হঠাৎ তখন চোখ তুলে দুর্গার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ছেলেমানুষের মত বিস্মিত গলায় বলেছিল, তুই তো অনেক বড় হয়ে গেছিস দুর্গা।

দুর্গা একেবারে চোখ নামায় নি এতক্ষণ। ও কথা শুনে নামিয়েছিল। আবার একবার তাকিয়েছিল, চিরঞ্জীবের কথা ও চাউনির অর্থ বোঝবার জন্যে। বলেছিল, তা' বয়স কি কারুর হাত ধরা? চেরকাল তো আর মানুষ ছোট থাকে না।

—তা বটে।

একটু হেসে বলেছিল, কাসেমের সামনে খুব একচোট শ্যাল কুকুর বলে নিলি আমাকে।

দুর্গা চমকে উঠে বলেছিল, ও মা! সে কি সত্যি-সত্যি নিকি?

—না, তুই খুব ভান করতে জানিস। অন্য মেয়ে হলে কি বলতে কি বলত কে জানে।

কিন্তু দুর্গা আবার না জিজ্ঞেস করে পারে নি, কিন্তুন, তুমি এসব পথ ধরলে কেন?

চিরঞ্জীব ভ্রূকুটি করে জবাব দিয়েছিল, সে কৈফিয়ৎ তোকে দিতে হবে নাকি।

শুনে দুর্গারও ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার আঁচল ঢাকা ঠোঁটে একটু সূক্ষ্ম হাসি খেলে গিয়েছিল। চিরোঠাকুর আসলে কাঁচা, পুরোপুরি পাকে নি। এসমাগলার না কি বলে, সেসব নতুন তো। জিজ্ঞেস করলে রাগ হয়।

তারপরেই চিরঞ্জীব জিজ্ঞেস করেছিল, তোর মুখে কি ঘা' হয়েছে নাকি?

—কেন?

—আঁচল চেপে আছিস যে?

আঁচলটা আপনি খসে পড়েছিল। ঘা' নয়, অক্ষত রক্তাভই। দুর্গা বাগ্‌দিনীর ঠোঁট শুধু ঠোঁট নয়। বিম্বোষ্ঠ।

তারপরেই আবার একটা বিস্মিত প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছিল চিরঞ্জীব, এ কি, তোর বে' হয় নি নাকি?

লজ্জা পাওয়াই বোধহয় উচিত ছিল দুর্গার। কিন্তু সে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠেছিল। চিরঞ্জীবের চোখে অনেক কথাই ফুটে উঠেছিল দুর্গার হাসি টলমল শরীরের দিকে তাকিয়ে। সেসব কথা অধিকাংশই সন্দেহ ও অবিশ্বাস। বলেছিল, হুঁ! কি ক'রে তোর চলে?

চিরঞ্জীবের মত অতটা ঝাঁজ না হোক দৃঢ়স্বরেই বলেছিল দুর্গা, সেকথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি কেন? নাও, এবার সরে পড় দিকিনি।

কিন্তু চিরঞ্জীব তাকিয়েছিল দুর্গার দিকে। না, না, পিঁপড়ের সারি থেকে উঠে আসা চাউনি ঠিক ছিল না সেটা। বলেছিল, তুইও তো চোলাই কারবার করতে পারিস।

—সত্যি?

দুর্গার ঠোঁট হাসিতে বাঁকা হয়ে উঠেছিল। চিরঞ্জীব তখন ফেরবার উদ্যোগ করেছিল।

দুর্গা বলেছিল, সময় হ'লে তোমাকে খবর পাঠাব।

বলে হেসেছিল। চিরঞ্জীব ততক্ষণে অন্ধকারে অদৃশ্য।

দুর্গাও মুখ বাড়িয়েছিল অন্ধকারে। চিরঞ্জীবকে দেখা যায় নি আর। কিন্তু আর একটি ছায়া এগিয়ে এসেছিল তার দিকে। দুর্গা ঘরের ভিতর সরে এসে লম্ফর আলোর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ছায়াটি দুর্গার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অনেকক্ষণ মিটি মিটি ক'রে হেসেছিল দুর্গার দিকে তাকিয়ে। তারপর শ্লেষ মিশিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, সরোবরে ডোবার চেয়ে কি এটা ভাল হল তোর ?

দুর্গা বলেছিল, কি হল ?

—এই যে এমনি ডোবা ?

—ও মা ! ডুবলুম কোথা ?

—একে ডোবা বলে না তো কী বলে ? এখনো ছলনা ?

দুর্গা হাসতে গিয়ে, মুখখানি করুণ করে, চকিত চোখে আবার অন্ধকারে ফিরে তাকিয়েছিল। ছায়া হেসে উঠেছিল তার বুকের মধ্যে। একটি দীর্ঘ 'হুঁ' দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, একবার দেখা একবারেই মরা। এমনি করেই সবাই মরে। কিন্তুন্ কোথায় মরলি একবার ভেবে দেখলি না ?

না, ভাবনা নয়, চিন্তা নয়, শুকনো পাতার মড়মড়ানি শুনবার জন্যে কান পেতেছিল। তারপর যে হাসিটি কোনদিন হাসা হয় নি, সেই হাসিটি টুকটুক করে উঠেছিল দুর্গার ঠোঁটে।

ছায়া শুধু বলেছিল, পথ চেয়ে কাল কাটুক। চিরোঠাকুর কি আর কোনদিন আসবে আশ্রয় নিতে তোর কোটরে ?

রাঁধা ভাত পাতে না নিয়েই আলস্যে শুয়ে পড়েছিল দুর্গা।

তারো পরে দিন গিয়েছিল। এক মাস, দু মাস।

শেষে যমুনা মাসীকেও একদিন বলতে হয়েছিল, রাগ করিসনে দুগ্‌গো। ঠাকুরদে মশাই বলছিলেন, বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ে, আমাদের ঘরের মেয়ের মত। আমাদের শহরের বাড়িতে গিয়ে থাকুক,

সোমসারের ফাই ফরমাস খাটুক। জাতের ছেলে দেখে এ্যাট্টা বে থা আমি দিয়ে দেব।'

ছুর্গা কিছু না বলে, যমুনা মাসির মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়েছিল।

কয়েকদিন পর, ঘনায়মান সন্ধ্যায় ছুর্গা দাওয়ায় বসেছিল।

দূরের গাছগাছালি পেরিয়ে, স্টেশনের ধারে নতুন গড়ে ওঠা শহরের ছিটে ফোঁটা দেখা যাচ্ছিল। নতুন হাসপাতালের লাল রংএর টুকরো। নতুন বিজলী বাতির আকাশ খোঁচানো পোস্ট। আলো জ্বলে উঠছিল একে একে। ওই হাসপাতালেরই আলো। কয়েকটি দোকানেও বিজলীবাতি নিয়েছিল। স্টেশনেও বিছ্যুতের আলো হয়েছিল নতুন। ওদিককার আকাশটা আলোকময় দেখাচ্ছিল। হাট এখন রোজের হাট। রোজ ভিড়। অনেক নতুন দোকান। বিজলী রেল গাড়ির বাঁশীর স্তিমিত শব্দ যেন মেয়ে গলার ডাকের মত আসছিল ভেসে।

সব নাকি বদলে যাবে। বিজলী তার নাকি আসবে এদিকে, আলো জ্বলবে। শহর বাড়বে। বলদ মোষের গাড়িগুলি মাটিতে ঘাড় গুঁজে নাকি পড়ে থাকবে না। সাইকেলরিকশা আগেই ছিল। মোটর গাড়িও আসবে।

বাগ্‌দিপাড়ায় বসে ছুর্গা এমনি ক'রে বসে থাকবে গালে হাত দিয়ে? কিন্তু অন্ধকার যদি না থাকে, বিজলী আলোয় এমন করে থাকার লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে?

পায়জামা আর সার্ট গায়ে দেওয়া ঝোড়ো কাকের মতো একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল ছুর্গার সামনে। চিরঞ্জীবের দলের ছেলে। বলেছিল, চিরঞ্জীবদা'কে ডেকে পাঠিয়েছিলে?

চেনা ছেলে, নাম গুলি। হেঁটো পেড়ে কাপড় পরার কথা। কিন্তু ওরা আজকাল নতুন পোষাক ধরেছে।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তোকে বললে হবে?

—আমাকে পাঠিয়ে দিলে জানতে।

দুর্গা এক মুহূর্ত চুপ করেছিল। তারপর বলেছিল, চিরোঠাকুরকে বলিস, আমি গুড় আর মশলা চেয়েছি তার কাছে। কয়লাও যেন পাঠায় পরিমাণ বুঝে।

গুলি কয়েক মুহূর্ত হাঁ ক'রে তাকিয়েছিল। তারপরে ঘাড় কাত ক'রে 'আচ্ছা' ব'লে চলে গিয়েছিল।

দুর্গা দাওয়ার খুঁটিতে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছিল। সে যে বলেছিল, কোনদিন চোলাই করলে চিরোঠাকুরকে খবর দেবে।

তাই বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ে দুর্গা খবর পাঠিয়েছিল, চোলাই করবে সে।

॥ দুই ॥

খবরটা রটেছিল আগেই।

প্রায় মাসখানেক আগে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, রাঢ়ের এই অঞ্চলে তরাইয়ের একটা বাঘ আসছে। বাঘটা নতুন, কিন্তু ঝানু। অব্যর্থ শিকারের একটি স্বাভাবিক এবং সাংঘাতিক প্রবৃত্তি নিয়ে বাঘটা এসে পৌঁছুচ্চে। এই অব্যর্থ শিকারী প্রবৃত্তিটার কথা সবাই বলছিল বোধ হয়, বিশেষ ক'রে তরাইয়ের স্বাপদ হিংস্র অরণ্য পার হয়ে বাঘটা আসছে, তাই। আসছে এই জঙ্গলের আড়াল আবডালের চেয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠই যেখানে বেশী। যেখানে জটিল কুটিল অন্ধকার অরণ্যে দৃষ্টি আটকাবার কোন উপায় নেই। আর যে-বাঘ অরণ্যেরই জটে পাকে শিকারে অভ্যস্ত, এই খেত খামার জনপদ বিস্তৃত খোলা জায়গায় তার মৃগয়া উৎসব অবাধ হয়ে উঠবে।

আর তরাই মানে শুধুই গভীর বন নয়। উঁচু-নীচু অসমতল। চড়াই আর উৎরাই। বাঘটা আসছে সেই অরণ্যসঙ্কুল চড়াই উৎরাইয়ের দেশ থেকে। পলকহীন খপিস চোখ যার উঁচুতে নীচুতে সমান দেখতে পায়। রাঢ়ের এই আদিগন্ত সমতলে দৃষ্টি তার বাধাহীন সুদূরে ছুটে যাবে। খাদের অন্ধকার যার অজানা নয়। খাল আর নালা তার নখেই ভাসবে। মরণের মত সর্পিল বাঁকে ঘোরাফেরা তার। সমতলের সহজ বাঁকে ক্ষিপ্রগতি পদক্ষেপ কোন সমস্যাই নয়।

সুতরাং সাবধান! তরাইয়ের বাঘটা আসছে। আর বাঘটা অনেক বড় বড় শিকার ধরেছে।

রাঢ়ের শিকারেরা নিশ্চয় আজ প্রহর গুণছিল।

বাঘটা এল আজ। মহকুমার উত্তর বিভাগের কর্তা সুরেশবাবু সদরে এলেন তাকে রিসিভ করতে। কারণ তরাইয়ের বাঘ, অর্থাৎ

বলাই সান্ন্যাল সুরেশবাবুর জায়গাতেই প্রমোশন পেয়ে এসেছে। মহকুমা হেড কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছিল বলাই সান্ন্যাল। পরিচয় করতে গিয়ে সুরেশবাবু অবাক হলেন। বললেন, একি, আপনি তো ছেলেমানুষ মশাই।

পুলিশের লোক বলেই সন্দেহ হয়, কথাটা মাৎসর্যের। প্রৌঢ় সুরেশবাবুর জায়গায় একেবারে নওযোয়ান। যেমন তেমন নওযোয়ান নয়, একেবারে ছেলেমানুষ। আপনি ক'রে যাকে বলা-ই যায় না বোধহয়।

খাকী ফুল প্যাণ্ট আর শাদা হাফসার্ট পরা ছিল বলাইয়ের। রংটা একটু মাজা মাজা কালো বলেই বোধহয় চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল। ফর্সা হলে লোকটাকে জলো আর পান্‌সে মনে হতে পারত। কারণ বলাইয়ের চোখ দুটি বড়, ভাসা ভাসা বলা যায়। তার ওপরে হাসিটি মিষ্টি। যদিও রাত্রি জেগে ট্রেণে আসার জন্য চুল উসকো খুসকো, তাতে কিছু ঢেউ লক্ষ্য পড়ে। সব মিলিয়ে, চেহারায় তথাকথিত দারোগার সার্টিফিকেট না পাওয়াই তার উচিত।

বলাই হাসল সুরেশবাবুর কথায়। বলল, আমরা যাব কখন?

সুরেশবাবু বললেন, এখুনি। আপনার সঙ্গে মালপত্র?

—আছে—একটা ছোট বেডিং, স্যুটকেশ একটা, আর—

ক্যাম্বিশের খাপে ঢাকা পয়েণ্ট টু রাইফেলটা তুলে নিল বলাই।

সুরেশবাবু বললেন, একি সরকারি অস্ত্র নাকি?

—না নিজেরই। একটু আধটু শিকারের নেশা আছে কিনা। সঙ্গে নিয়ে আসার অন্য কোন কারণ নেই। শখের জিনিস, কে কি ভাবে হ্যাণ্ডেল করবে, তাই কাঁধে ফেলে চলে এসেছি।

—বেশ বেশ। ভায়ার পরিবার টরিবার হয়েছে তো?

—বিয়ে করেছি।

—কদ্দিন?

—বছর পাঁচেক।

—আচ্ছা? দেখে তো মনে হচ্ছে না। ছেলেপুলে?

বলাই হাসছিল। হাসির মধ্যে কোথায় একটি ছায়া পড়ল টের পাওয়া গেল না। বলল, আসে নি।

সুরেশবাবু বললেন, বাঃ! কাজের ছেলে দেখছি। আজকালকার দিনে না আসতে দেওয়াটাই কাজের ছেলের লক্ষণ।

বলাই কি একটা বলতে যাচ্ছিল। সুরেশবাবু তার আগেই হা হা করে হেসে উঠে বললেন, তা হলে এখনো বেশ জম জমাটি-ই চলছে অ্যাঁ!

বলাইয়ের বলতে যাওয়া কথা বলা হল না। একটু বিষণ্ণ আড়ষ্ট হাসি ছুঁয়ে রইল তার ঠোঁটের কোণে।

দুজন সেপাই এগিয়ে এল বেডিং আর স্যুটকেস স্টেশনে তুলে দেবার জন্যে। কাছেই স্টেশন। হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট। প্লাটফরম এখান থেকেই দেখা যায়।

যেতে যেতে সুরেশবাবু বললেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'ত। ঘর তো খালি করাই আছে। আমার ফ্যামিলি আমি শিফ্‌ট করে দিয়েছি আগেই।

—হঠাৎ উপশাস্ত্র আপনাদের ঘাড়ে এসে পড়ব তাই আনি নি। কথা আছে, ব্যবস্থা হ'য়ে গেলেই সবাই এসে পড়বেন।

—সবাই মানে? মা বাবা আসবেন নাকি?

—মা নেই, বাবা আছেন। তবে তিনি আসবেন না। মালবাজারেই থাকবেন ভাই বোনেদের নিয়ে। এখন শুধু—

—ও, গৌরবে বহুবচন। খালি স্ত্রী আসবেন। বেশ বেশ।

জংশন স্টেশন। হাওড়া থেকে মেইন লাইন এখন ইলেকট্রিফিকেশন হ'য়ে গেছে। ব্রাঞ্চ লাইনটা বাঁক নিয়েছে উত্তর-পশ্চিমে। দুটি লাইন পাশাপাশি গিয়ে, খানিকটা দূরে এক হ'য়ে হারিয়ে গিয়েছে গাছগাছালির আড়ালে। বিজলী নয়, শাখা লাইনে এখনো

কয়লার ঝকঝকানি আছে বলেই বোধহয়, প্ল্যাটফরমটা নীচু। পুরনো ভাঙা ময়লা। দাঁড়িয়ে থাকা লোকাল গাড়ীটারও সেই অবস্থা। একদিকে বিদ্যুতের সমারোহ আছে ব'লেই হয়তো অতটা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। আগে দেখাত না।

ফার্স্টক্লাসের একটি নির্জন কামরায় উঠলেন সুরেশবাবু বলাইকে নিয়ে। বসে বললেন, ভায়ার লেটেষ্ট কেস্‌টা আমরা খবরের কাগজে আগেই পড়েছি। বড় জবর কেস্‌। রীতিমত থ্রিলিং এ্যাডভেঞ্চার।

ভায়া মানে বলাই। আপনি কিংবা তুমি কোনটাই নয়। তুমি বলবার ইচ্ছেটাই টের পাওয়া যাচ্ছে।

সুরেশবাবু আবার বললেন, মেয়েটি খুব সাংঘাতিক, না?

বলাই হেসে বলল. না খুবই সাধারণ।

—দেখতে নাকি বেশ সুন্দর ছিল?

—যুবতীও বটে। সে হিসেবে সাংঘাতিক। তবে মেয়েটা মোটামুটি চেনাই ছিল। বাঙালি, সুন্দরী যুবতী, অথচ অভিভাবক নেই, কিন্তু এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এমনিতেই সন্দেহজনক মনে হত। থাকত শিলিগুড়িতেই। দু'একজন সামাজিক নাম করা ভদ্রলোকদেরও তার কাছে পিঠে দেখা যেত। ধরা পড়েছিল নিজের দোষেই।

—ধরা সবাই নিজের দোষেই পড়ে।

বলাই হেসে বলল, এক্ষেত্রে অন্যরকম হয়ে গেছল। গাড়িটা আসছিল আসাম থেকে। আমার যাবার দরকার ছিল কিষেনগঞ্জ পর্যন্ত। যে-কামরাটায় উঠেছিলাম, সেই কামরাতেই মেয়েটি ছিল। আমি জানতাম না মেয়েটি ওই কামরায় আছে। কেবল একবার লক্ষ্য পড়েছিল, একটি লোক মালপত্র নিয়ে নেমে গেল ওই ফার্স্টক্লাশ থেকে, আর কে একটি মেয়ে উঠল আর তাদের মধ্যে যেন কি দু'একটা কথা হ'ল। তারপরে লক্ষ্য করে দেখলাম, যে-লোকটি নেমে গেল, তাকে যেন কোথায় দেখেছি। পলকের জন্য মনে হল, তারপরেই

আবার ভুলে গেছি। গাড়ি ছাড়ল, আমি কিছু না ভেবে হঠাৎ ওই ফার্স্টক্লাশেই উঠলাম। চোখোচোখি হতেই মেয়েটি যেন কেমন একটু ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। আমিও একটু অবাক হলাম, বিশেষ করে সেই মেয়েটাকেই দেখে। মেয়েটি একটি গোটা গদী জুড়ে বসেছিল। চোখোচোখি একবারই হয়েছিল প্রথমে। তারপরেই সে চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। বেলা সাড়ে তিনটে চারটে বোধ হয় বেজেছে। কিন্তু মেয়েটির আড়ষ্টতা আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। কেমন যেন স্টীফ্। এমন কি হাতের চেটোয় রুমালটা যে-ভাবে ধরা ছিল, সেইভাবেই ছিল বেশ খানিকক্ষণ। আমি নেমে যাওয়া লোকটার কথা তখন ভাবলাম। কিন্তু সন্দেহটা তখনো অন্যরকম ছিল। অন্য লাইনের। ভাবলাম, যাক্‌গে, কি হবে এসব ভেবে? মেয়েটা মিছেই আড়ষ্ট হয়ে আছে। পথে কোন লোক উঠে যদি ওর কোলে মাথা রেখে শোয়, আমি কিছুই মনে করব না।

কিন্তু মেয়েটি নিজের থেকেই গর্তে পা' দিল। আমারও সন্দেহের কুণ্ডলী পাক খুলতে লাগল। ও আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসল, 'কদ্দুর যাবেন আপনি?'

দেখলাম ওর মুখের রং এর মধ্যেই সাদা হ'য়ে এসেছে। সত্যি জবাব দিতে বাধল। দেখা-ই যাক্ না, কি হয়। একটু নিস্পৃহ ভাবেই ঠোঁট উল্টে জবাব দিলাম, 'ঠিক নেই। দেখি কদ্দুর যেতে হয়।' ব'লে ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে কোথায় পৌঁছুতে হবে?'

প্রশ্নটা কাজে লেগে গেল। ও ভাবল, আমি ওকে কোন জিনিষ পৌঁছুবার কথা বলছি। ভয়ে গলা চেপে বলল, 'কী পৌঁছুতে হবে?' বললাম, 'আপনাকে কোথায় যেতে হবে তাই জিজ্ঞেস করছি।' কেমন যেন থতিয়ে গেল মেয়েটা। বলে ফেলল, 'আমিনগাঁ—।' 'আমিনগাঁ?' আমি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম ওর দিকে। ও তাড়াতাড়ি ভুল

গুধরে বলল, না না, মনিহারি ঘাট পর্যন্ত।' বললাম "তাই বলুন। ছুটো একেবারে দু'দিকে।' বলে হাসলাম। তারপরে খুবই নির্বিকার ভাবে চোখ বুজে ফেললাম। কিন্তু ততক্ষণে আমি নিশ্চিত হয়েছি, গণ্ডগোল একটা আছে কোথাও। কিন্তু কোথায়? এত ঘাবড়াচ্ছে কেন ও?

পরের স্টপেজে গাড়ি দাঁড়াতেই দেখলাম, মেয়েটি ছটফট করছে। আমি তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। প্রায় জুয়া খেলার মত ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে, শিলিগুড়িতে ফোন ক'রে দিলাম একটা। আবার যখন এলাম, তখনো মেয়েটি দরজার কাছে। গাড়ি প্রায় ছাড়ে। আমাকে ফিরে আসতে দেখে, মেয়েটি পা'-দানিতে পা নামিয়ে দিল নামবার জন্য। আমিও পা দানিতে উঠে, দুদিকের হাতলে হাত রেখে বললাম, 'এখন নামতে চেষ্টা করবেন না, প'ড়ে যাবেন। ভেতরে চলুন।'

ব্যাপারটাকে ও চরম ব'লে মনে করল, আর দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে তাকিয়ে। আমি দরজাটা বন্ধ ক'রে, লক ক'রে দিলাম। তারপর—

সুরেশবাবু প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন, থামলে কেন ভায়া, বল।

বলাইয়ের মুখে একটু লজ্জার আভাস। বলল, মেয়েটি সুন্দরী। তাই ও হঠাৎ অন্য পন্থা ধরল। যাক্‌গে, আমি সে সব বাদ দিয়েই যাচ্ছি।

—না না তা' হবে না। তবে আর মজা রইল কোথায়? রসিয়ে রসিয়ে বলতে হবে তোমাকে। তারপর? তোমার গায় পড়ল বুঝি?

সুরেশবাবুর ঈষৎ রক্তাভ চোখে এই ঈপ্সিত কাহিনীরই আলো।

বলাই হেসে বলল, আজ্ঞে না। আপনাকে আগেই বলেছি, খুব সাধারণ মেয়ে। আসলে বোকা। গায়ে পড়ল না, গায়ে পড়ার ভাব করতে লাগল।

সুরেশবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, আগেই বলেছি। বাবা,

চেহারাখানিও সেই রকম বাগিয়েছে, হুঁ হুঁ! বুঝিনে কিছু? কি রকম ভাব করতে লাগল?

বলাই সলজ্জ গলায় বলল, মেয়েদের একটি চাউনি আছে, করুণ অথচ আরো কিছু থাকে যেন। সেই ভাবে চেয়ে রইল মেয়েটি। বেশবাসও আলুথালু। অথচ আমার অবস্থাটা ভাবুন। আমি তখনো অপরাধটাই আবিষ্কার করতে পারি নি। শুধু একটাই গ্যারান্টি, সামথিং রং। মেয়েটি একেবারে সরাসরি আমার নাম ধরেই ডাকলে, 'বলাইবাবু।' আমি তেমনি নির্বিকার জবাব দিলাম, 'বলুন।' দেখলাম, ওর করুণ চাউনির অতলে একটি বিশেষ আবেদন। প্রায় ফিসফিস ক'রে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেবার কি কোন উপায় নেই?' আমি খুব ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। কেন ছাড়ব? কি করেছে ও? যে-ভাবে শুরু হয়েছিল সেই ভাবেই প্রসিড করলাম। বললাম, 'কি উপায়ে বলুন?'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, 'আমার সঙ্গে টাকা নেই। দেখতে পারেন সার্চ ক'রে। আর যা চান, তাই দেব।'

আমার চোখ তুলতে লজ্জা করছিল। 'যা চান' মানে যে কি, সেটা চাপা ছিল না। অথচ ও যদি সয়তান হ'ত, তা' হ'লে ওর ধরা পড়ারও কোন চান্স তো ছিলই না। উপরন্তু, একলা মেয়ে ফার্স্ট-ক্লাশে ট্রাভেল করছে, আমাকে ফাঁসাবার সব রকম রাস্তাই খোলা ছিল ওর। কথা শুনে রাগ করার আমার উপায় ছিল না। কারণ তখনো আমার কার্যসিদ্ধি হয় নি। বললাম, 'আমি কিছুই চাইনে আপনার কাছ থেকে। আপনি শুধু'—কথা শেষ করতে আমার ভয় করছিল। যদি ভুল ঢিল মারা হ'য়ে যায়। তবে সব বানচাল। মেয়েটি বলল, 'শুধু কী?' আমি তখন কামরাটা ভাল করে লক্ষ্য করছি। ভাবছি, আমার নাম জানে, পেশাও জানে। সুতরাং সঙ্গে কিছু আছে ব'লেই কাণ্ডটা ঘটতে পারছে। বলে ফেললাম, 'আপনি আমাকে মালটা সারেণ্ডার করে দিন।'

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'সারেণ্ডার ক'রে দিলেই ছেড়ে দেবেন তো?' তখন আমার জোর বাড়ল। 'তা' হলে মাল আছে।' বললাম, সেটা আমি বিবেচনা করব।'

মেয়েটি আমাকে গদীর নীচে আঙুল দেখিয়ে দিল। আমি গদীর তলায় হাত দিলাম। তারের জাল ঠেকল আমার হাতে। মনে হল, তারের জাল দিয়ে নারকেলের ছোবড়া আটকানো আছে। 'জালের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে চিমটি কেটে যেটুকু নিয়ে এলাম, সেইটুকুই ছোবড়া। মেয়েটি বললে, 'এক পাল্লা ছোবড়ার ভেতরে আছে।' ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম জাল। ছোবড়া সরিয়ে, আরো ভেতরে হাত দিয়ে পেলাম গাঁজা। বুঝলাম, গোটা গদীটাই গাঁজা। যেমন ছিল, তেমনি রেখে নীজের সীটে এসে বসে বললাম, 'আর কোথায় আছে?' —'আর নেই।' 'কোথায় পৌঁছুবার কথা?' 'মনিহারি ঘাটে।' 'তারপর?' মেয়েটি বলল, 'তারপর, সারাদিন গাড়িটা সাইডিং এ থাকবে। সেই ফাঁকেই সরানো হবে।' আমাকে আবার চালাকি করতে হল। বললাম, 'কিন্তু আপনি কার এন্‌তেজারিতে ছেড়ে দেবেন? সে কোথায় থাকবে?' 'কাটিহার।' 'চেনা?' 'হ্যাঁ।' সহজভাবে কথা বলতে বলতে মেয়েটি ততক্ষণ আমার সীটে এসে বসেছে। হঠাৎ একটি হাত তুলে দিল আমার হাতে। চোখে তার সেই করুণ চাউনি। জলেরও আভাস ছিল।

সুরেশবাবু চীৎকার ক'রে বললেন, এইবার জমেছে। আমাদের এই ছ্যাকড়া লোকাল গাড়িও সেইজন্যই নড়ল বোধ হয়। তারপর?

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। বলাই বলল, আমি বললাম, 'হাতটা সরান।' হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'পরের স্টপেজে আমাকে নেমে যেতে দেবেন তো?' বললাম, 'না। আপনাকে ছেড়ে দিলে অন্য আসামীরা ধরা পড়বে না। আপনাকে আমি আটকাব না। কিন্তু কাটিহারের লোকটাকে আমি চিনতে চাই। সেইজন্য আপনাকে

মনিহারি ঘাট পর্যন্ত যেতেই হচ্ছে আমার সঙ্গে, অবশ্যই অপরিচিতার মত। আর একটা কথা। আসছে কোত্থেকে মালটা?' মেয়েটি বলল, 'বোধ হয় আসাম থেকে। আমার সীমানা ছিল শিলিগুড়ি থেকে মনিহারিঘাট।' 'শিলিগুড়ি পর্যন্ত কে ছিল?' 'ভবানী তরফদার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার, মনে পড়ে গেল মুখটা। তাই কেবলি মনে হচ্ছিল, মুখখানি চেনা চেনা। জলপাইগুড়ির পুরনো আসামী।

বলাই একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু মেয়েটি তবু ধরা পড়ল।

—কি করে?

—আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারণ, কাটিহারের আসামীটাকে ধরেছিলাম ঠিক। কাটিহারে ফোন ক'রে আগেই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলাম। কাটিহারের লোকটাই শুধু ফাঁসত। কিন্তু ওদের সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটিকে। তাই মেয়েটাকেও প্রমাণ দিয়ে ফাঁসিয়ে

সুরেশবাবু চোখ কুঁচকে বললেন, রাতটা নির্বিবাদেই কেটেছিল তো?

বলাই বলল, আজ্ঞে না। একটু ভয় ভয় করছিল।

সুরেশবাবু হা হা ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, সংবাদপত্রের রিপোর্টার কিন্তু মেয়েটার স্বীকারোক্তিই তুলে দিয়েছিল। '—' কাগজের হেডিংটা দেখেছিলে তো? 'দারোগা দর্শনেই মেয়ে স্মাগলার কুপোকাৎ।'

আর একদফা হেসে নিয়ে সুরেশবাবু বললেন, ওদিকে ইল্লিসিট্ লিকারের বহর কি রকম?

—বড় রকমের কিছু নয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কারণ অধিকাংশই পাহাড়ি কুলি কামিনের বাস। তারা

নিজেদের খাবার জন্য প্রায় রোজই চোলাই করে। তবু বে-আইনি চোলাই তো। বিক্রি না করলেও, দোকান থেকে কিনে খাওয়াই আইন সিদ্ধ। সরকার দুটো পয়সা পায়। সেজন্যেই মাঝে মাঝে গিয়ে কেড়ে নিতে হয়, ফেলে দিতে হয়, কেসটেস্ ক'রে দিই। কিন্তু ওরা দোকানেরটা খাবে না কিছুতেই। বলে, 'বাবু, ওগুলো আমাদের ইচ্ছে যায় না খেতে। পয়সাকে পয়সা যায়, নেশাও হয় না।' লিকারের কেস্ ও অঞ্চলে তেমন কিছু নয়।

সুরেশবাবু বললেন, এখানে কিন্তু ভায়া গাঁজা আফিম বিশেষ পাবে না। পাবে। লিকারের চেয়ে কম। কিন্তু লিকার যা আছে, তার ঠ্যালাতেই অন্ধকার। একেবারে প্রলয় বন্যা ইল্লিসিট লিকারের। একেবারে খুঁগড়ো বান দেখিয়ে ছাড়ে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। এসেছ যখন, নিজেই দেখতে পাবে।

ব'লে, সুরেশবাবু নির্জন কামরাটার চারপাশে একবার দেখে নিলেন। তারপর পকেট থেকে বার করলেন ছোট একটি ফরাসী ব্র্যাণ্ডির বোতল। ছিপি খুলে, ঢক ঢক ক'রে কয়েক ঢোক কাঁচা-ই গিলে ফেললেন।

বলাই অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল সুরেশবাবুর দিকে। সুরেশবাবু ঝাঁজটা সামলাতে সামলাতেই নিঃশব্দে হাসলেন। তার মাংসলো ফর্শা মুখে রক্ত ছুটে এল। চোখ দুটি লাল হ'য়ে উঠল কোকিলের মত। জিজ্ঞেস করলেন, ভায়ার চলে নাকি ?

বলাই একটু হেসে বলল না।

সে পকেট থেকে সিগারেট বার করল। সুরেশবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, একটা সিগারেট দাও, খাই।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়া দেখেই বোঝা গেল, ধোঁয়ার চেয়ে জলেই ওঁর দখল বেশী। বললেন, কি ভায়া, রাগ করলে ?

রাগ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আবগারি বিভাগে

কাজ করলে মদ্যপান চলবে না, এরকম কোন আইন নেই। নীতিও নেই। বলল, না না, রাগ করব কেন?

—খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই?

—তা-ই বা কেন? ও জিনিসটা আমি নিজে পছন্দ করি নে।

—আমিও অপছন্দ-ই করতাম। ব্যাপারটা কি রকম হয়েছে জান?

সুরেশবাবু ফুলে ফুলে হাসলেন। বললেন, চোর ধরতে ধরতে চোর হয়ে গেছি। মানে, চুরি ক'রে চোলাই করিনে, চোরাই মদ ধরতে ধরতে মদ ধরেছি। কবে ধরেছিলাম, সেটা আর এখন খেয়াল নেই। একটা জবর লড়াইও করেছিলাম মনে মনে। ছি ছি, চোরাই মদ ধরে আমি অপরাধীদের সাজা দিই, আর আমিই নেশা করছি? তা ভায়া কি বলব, মদ জিনিষটি সহজ বস্তু নয়। সে যুক্তিহীনকে যুক্তি যোগায়। ব্যাটা আমার কানে কানে বললে, 'অপরাধীদের সাজা দাও, চোরা-চোলাইয়ের জন্য। মদ্য নিবারণের দারোগা তো তুমি নও। অপরের নেশা নিবারণ করতে গিয়ে যদি তুমি নেশা করতে, তবে তোমার অ-মহম্মদী দোষ হত।'

বলাই অবাক হয়ে বলল, অ-মহম্মদী দোষটা কি?

—কেন, ছেলেবেলায় পড় নি? গরীবের ছেলের মিষ্টি খাওয়ার জ্বালায় বাপ মা' ছেলেকে নিয়ে এল মহম্মদের কাছে। 'হেই গো বাবা, ব্যাটার মিঠাই যোগাতে যোগাতে হাব়্লাখ্ হো গয়া। লড়কার এ মিঠায়ী রোগ তুমি সারিয়ে দাও বাবা।' মহম্মদ তোবা তোবা করলেন। তিনি নিজেই মিঠাইখোর। বললেন, 'কয়েকদিন বাদে ছেলেকে নিয়ে এস, তখন ছাড়িয়ে দেব।' মিঠাই খাওয়া ছাড়লেন মহম্মদ, তারপরে সেই ছেলেকে বললেন, 'ছোড় দো বেটা মিঠাই।' ব্যাটার ঘাড় থেকে মিঠায়ের ভূত নেমে গেল। মানে কি হল?

ব'লে বলাইয়ের দিকে তাকালেন।

বলাই হেসে বলল, বোধহয় 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও।'

সুরেশবাবু বলাইয়ের পিঠ চাপড়ে বললেন, গুড্। এই না হলে আর বুদ্ধিমান ছেলে। সেই জন্যেই লড়াইয়ে হেরে গেলুম মদের কাছে। তাই তো, আমি তো মদ নিবারণের দারোগা নই। গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে খাওয়ার দারোগা আমি। আর একটা লড়াই হয়েছিল, স্ত্রীর সঙ্গে। সেটাও জবর লড়াই। প্রায় রোজ মারামারি ধরাধরি।

বলাই না হেসে পারল না। সুরেশবাবুর বলার ধরনটাই সেরকম। বললেন, আরে না না, হাসি নয় ভায়া। সে আমার এমন কুচ্ছো গাইতে লাগলে। বললে, 'এই না হলে আর আব্গারি দারোগা। উপযুক্ত চাকরিই জুটেছে মাতালের।' আর আমার স্ত্রী নাকি জানত একদিন আমার পরিণতি এই দাঁড়াবে। বলে, 'এত চোরাই মদ যে ধরে, সে মদ না ধ'রে পারে? ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো অমন চাকরির কপালে।' বোঝ ভায়া, চাকরিটাই খারাপ হয়ে গেল।

সুরেশবাবু দেখতে পেলেন না, বলাইয়ের হাসিতে আবার একটি বিষণ্ণ ছায়া খেলে গেল। তিনি আর একবার বোতল বার ক'রে গলায় ঢেলে বললেন, এসময়টা রোজ ভূতে পায়। একটু না খেলে পারিনে। আর এখন, জানলে ভায়া, মদ না খেলে মদ দেখতেই পাইনে। মানে চোরাই মদ।

বেলা প'ড়ে আসছে। পশ্চিম দিগন্তের নিয়ত সরে যাওয়া গ্রামটার গাছের কোলে ঢলে পড়েছে সূর্য। যেন নির্মেঘ ফর্সা আকাশটার টুঁটি টিপে ধরেছে কেউ, আর তার সারা মুখটা লাল হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। কিংবা আকাশটা সুরেশবাবুর মত কাঁচা মদ গিলছে ঢোকে ঢোকে তাই রক্তাক্ত হ'য়ে উঠছে।

গাড়ির জানালা দিয়ে রক্তাভা এসেছে পড়েছে। সুরেশবাবুর মাথাটা বাইরের দিকে এলানো। ওর মদরক্ত মুখে আকাশের লালিমা যেন দগদগে হ'য়ে উঠেছে।

দিগন্ত জুড়ে বৈশাখের মাঠ। রিক্ত দীর্ণ খরো। সারাদিনের

[illegible]তে এখনো পাঁশুটে হ'য়ে আছে। গরুর পালেরা ফিরে চলেছে। পাখীরা উড়ে চলেছে দল বেঁধে। তাদের ডাক শোনা যায় না রেলের শব্দ ছাপিয়ে।

সুরেশবাবু একটু শব্দ ক'রে হাসলেন আবার। বললেন, সত্যি, কেন যে নেশা ধরলুম, আজো ঠিক জানি নে। আসলে কি ব্যাপার জান ভায়া, কিসের জন্য কী, আজো তার মানে জানলুমনা। বুকে ক্রশ্ বেল্ট ঝুলিয়ে চিরদিন নেকড়ের মত ছুটে বেড়ালুম।

বলতে বলতেই হঠাৎ থামলেন সুরেশবাবু। ঝপ্ ক'রে পিঠ চাপড়ালেন বলাইয়ের। বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! বাজে কথা বকতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, আর তুমিত দিব্যি শুনে যাচ্ছ। ভাবছ, কোথায় নতুন জায়গায় নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজে যোগ দিতে আসছ। আর বুড়ো তোমাকে হতাশ ক'রে দিচ্ছে। তা' কিন্তু দিই নি। নিতান্তই নিজের কথা বললুম। বরং তুমি আসছ ব'লে, গোটা এরিয়া দম বন্ধ ক'রে আছে।

বলাই অবাক হ'য়ে বলল, কেন?

—আরে তবে আর তোমাকে বলছি কি? ইল্লিসিট লিকারের দৌরাত্ম্য কতদূর হ'তে পারে, সেইটে দেখতে পাবে এখানে। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে, সেইটাই সমস্যা হ'য়ে উঠবে। এখানে ঘরে ঘরে চোলাই। ভদ্র অভদ্রের কোন বাছাবাছি নেই। স্টেশনে আর পথে তোমাকে দেখবার জন্যে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে লোকেরা।

—লোকেরা?

—হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচারারস্ আর স্মাগলারস্। দেখে তুমি কাউকেই চিনতে পারবেনা।

—দেখে তো কোনো স্মাগলারকেই চেনা যায় না।

—তাই কি?

সুরেশবাবু ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

বলাই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল, না একেবারে চেনা যায় না,

তা' বলিনি। অনেক সময় দেখলেই বোঝা যায়। মন আপনা থেকেই বলে ওঠে, সন্দেহ ঘনিয়ে আসে।

সুরেশবাবু হেসে বললেন, একে বলে ইনস্টিংক্ট। তোমার ইনস্টিংক্ট তোমাকে ব'লে দেয়, এই লোকটা হ'তে পারে। তোমার মনে সন্দেহ এনে দেয়। তার মানে, তুমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটা আয়ত্ব করেছ দেখছি। তা' হলে দেখছ, দেখেই চেনা যায়।

—না, আমি বলছিলাম, এমনি পোষাকে চেহারায় কাউকেই চেনা যায় না।

সুরেশবাবু বললেন, এখানে সেভাবে চেনবার তো কোনো উপায় নেই-ই। তোমার ইনস্টিংক্ট হয়তো ফেল করবে। হয় তো বলছি এজন্যে, তুমি যেখান থেকে আসছ, সেটাও মারাত্মক জায়গা। কিন্তু এ অঞ্চলটা তার চেয়ে কিছু কম নয়। তুমি হয় তো সুবিধে করতে পারবে এখানে। তুমি আসছ তরাই থেকে। তরাইয়ের বাঘ তুমি।

—তরাইয়ের বাঘ ?

—হ্যাঁ। তোমার ওই নাম আমি রেখেছি। আর ওই নামটাই রটিয়ে দিয়েছি এখানে। তাতে একটা ফল হয়েছে। চোলাইকর আর স্মাগ্‌লারদের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে। দে আর এ্যাফ্রেড অব দি নিউ কামার। তাই বলছিলুম, তোমাকে সবাই দেখতে আসবে।

বলাই হেসে ফেলল। বলল, তার মানে, আপনি আগেই বাজার গরম করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, ফেইলিউর।

সুরেশবাবু বাইরের দিকে একবার দেখে নিয়ে শিশিটা আবার ঠোঁটে চেপে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ ক'রে যখন খুললেন, তখন মনে হ'ল, চোখে ওঁর জল আসছে। বোঝা গেল, ক্রমেই রক্তের ঘূর্ণী বাড়ছে। ব্যাং ঘ্যাংগানি স্বরে বললেন, তাতে অবাক হব না ভায়া। দেখ, তোমাকে আনতে যাচ্ছিলুম। পথে একবার ফরেন

লিকার শপে ঢু মেরে গেলুম। ওরা এই কনিয়াকের শিশিটা প্রেজেণ্ট করলে। এদের বুঝতে পারি। আই ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দেম্। দোকান সার্চ করতে গেলেই, ওদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হ'য়ে যাবে। কিন্তু ওরা ভদ্রলোক, পলিশ্‌ড। চোরাই মালের জন্য ওদের ইনভেস্ট-মেণ্ট আছে, গর্ব ক'রে ওরা বলে সেকথা। পোর্ট থেকে দোকান পর্যন্ত, একটা চেন্ বেঁধে এদের কারবার। নাড়া দেবার সাহস-ই বা আমাদের কোথায়। কোথায় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে বাবা। শেষে চাকরি নিয়ে টানাটানি। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে। তা' ছাড়া ভদ্রলোকের কারবার, গণ্ডগোলের মধ্যে কেউ নেই। চুপ! চুপ! চেপে যাও সব, চেপে চাও। মিষ্টি ক'রে হাসো। চেয়ার এগিয়ে দিয়েছে, ব'স। প্রেজেণ্টেশন নাও। অনেকদিন পরে এসেছে ফরাসী কনিয়াক। আসারই কথা নয়। এসে গেছে কয়েক বোতল। রসিকেরা এর স্বাদ না নিলে, বোতলগুলোরই জীবন বৃথা। নিয়ে যান আপনি একটা। আসতে না আসতেই সব লুটেপুটে নিয়ে যায়। ধরে রাখা যায় না। একটা রেখে দিয়েছিলুম আপনার জন্য। নিয়ে যান স্যার। তুমি একটু ন্যাকামি করবে, সত্যি! ওয়াণ্ডারফুল! অনেকদিন টেষ্ট করা হয় নি। কিন্তু নগদমূল্য কত? ছিছি, কী যে বলেন। মা কালী হার মেনে যাবে জিভ কাটা দেখে। তবে দামটা শোনাবে বৈ কি। নইলে কয়েক বোতল চোরাই মালের জন্য তোমার দক্ষিণা তুমি কত পেলে, সেটা অজানা থেকে যাবে যে? আইবুড়ো বয়স থেকে যে শুনে আসছ বিশেষ প্রশংসা, 'ছেলের উপুরি আয় আছে ভাল।' বুড়ো বয়সেও পরিবার ভেবে খুশি, 'আমার স্বামীর উপুরি আয় আছে। সেই উপুরি আয়টার কথা দোকানদার না শুনিয়ে পারে কখনো? বিগলিত হয়ে বলবে, যারা কিনেছে, তারা পঁচাত্তর টাকায় বোতল কিনেছে। ইচ্ছে করলে আরো বেশী নেওয়া যেত। তবে সকলেই তো চেনাশোনা খদ্দের। আর তাদের খুশি করবার জন্যেই এসব রিস্ক্ নিতে হয়। সামান্য প্রফিটেই ছেড়ে দিই। সেসব

ইচ্ছে পরের কথা; আপনাকে তা' বলে দামী দিতে হবে নাকি।

আপনাকে আমরা প্রেজেন্ট করছি।…এদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা যায়। কিন্তু এই ইল্লিসিট কান্ট্রি লিকার ম্যানুফাকচারারস্; এদের সঙ্গে বোঝাপড়ার কোনো প্রশ্নই নেই। অথচ এদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। এদের ধরাটাও বিরক্তিকর। আনন্দ তো নেই-ই, কোনো সান্ত্বনা পর্যন্ত পাইনে ভায়া। কিন্তু এদের না ধরতে পারলেও মাথার চুল ছিঁড়তে হয়। আমার ক্রশ বেল্ট আমারই টুঁটি টিপে ধরতে আসে। হেল্! হেল্! এরা আমার লাইফটাকে হেল্ ক'রে দিলে।

পাশ ফিরে বসলেন সুরেশবাবু। কাল্‌চে সবুজ রংএর মোটা গদীটা একটা বাঁধা মোষের মত ছটফটিয়ে উঠল ওঁর বিরাট শরীরের চাপে।

বলাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এ যে শুধু মাতালের মাতলামি নয়, তা' বুঝতে পারছিল বলাই। এ বয়স্ক অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টরের জীবনে কোথায় একটি বিশেষ অশান্তি হতাশা আর ক্লান্তি জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সবটুকু বোঝবার যোগ্যতা বোধহয় তার ছিল না। খানিকটা সহানুভূতির সুরে বলল, এ অঞ্চলটা আপনাকে খুব কষ্ট দিয়েছে, না?

—কষ্ট?

সুরেশবাবু যেন খেপে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, পাগল ক'রে দিয়েছে। কয়েক লাখ টাকা বলতে পার; এই সামান্য একটি জায়গা থেকে ফাঁকি যাচ্ছে। সরকারি ভাটিখানা তুচ্ছ এদের কাছে। কে তার ধার ধারে? তুমি ভাবতে পারবে না, একটা শুণ্ডিনী গোটা এলাকাটা তোল্‌পাড় করে তুলেছে।

বলাই ঠিক ধরতে পারে নি। বলল, শুণ্ডিনী কী?

—সে কি ভায়া। তুমি [illegible] লোক। শুণ্ডিনী না বুঝলে চলবে কেমন করে? মেয়ে শুণ্ডিকে শুণ্ডিনী বলে। যারা মদ চোলাই করে; তাদের তো শুঁড়িই বলে, না কি?

বলাই বলল, সংস্কৃত বলছেন আপনি।

—তা বটে। গুণ্ডিনী সংস্কৃতই বটে। গুণ্ডিনীর কথাই বলছিলুম তোমাকে। একটা মেয়ে চোলাইকারিণী। সে স্মাগলারনীও বটে। গোটা মহকুমাটাকে সে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। আমি তার নাম দিয়েছি বাঘিনী। একটুও বাড়িয়ে নাম দিই নি। তার চেয়েও মারাত্মক যদি কিছু থাকে, তবে সে তাই। এত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত তাকে আমি ধরতে পারি নি। মেয়েটা, মেয়েটা সত্যি একেবারে সর্বনাশী।

বলাই অবাক হল সুরেশবাবুর বিস্ময় দেখে। বাঘিনীর কথায়ও সে কম অবাক হয় নি। বলল, বলেন কি? একটা মেয়ে এত কাণ্ড করছে?

—করছে। কিন্তু সে মেয়ে নয়, বাঘিনী। এ অঞ্চলে এখন সে কিংবদন্তীর নায়িকা। মেয়েটার বাপও সাংঘাতিক লোক ছিল। নাম ছিল ব্যাটার বাঁকা বাগ্‌দি। আমি বলতুম, বাঘ। সবাইকে হয়রান করে মেরেছে। লোকটা যেদিন মরল, ভেবেছিলুম, যাক্ ব্যাটাদের একটা লীডার মরেছে। কিছুদিন শান্তি পাওয়া যাবে। পেয়েছিলুম। মাস ছ'য়েক। তারপরেই এই বাঘিনীর আবির্ভাব। তিন বছর আগে, মেয়েটাকে পলিটিকাল এ্যাফেয়ার্সে তিন দিন হাজত বাস করতে হয়েছিল। মহকুমা জুড়ে বিরাট কৃষক হাঙ্গামা হয়েছিল, সেই সময়। চার্জ ছিল, পুলিশকে খুন করবার জন্য আক্রমণ।

বলাইয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বয়স কত?

—কোয়ায়েট ইয়ং। আমাদের মেয়েদের মত ওদের বয়স কমাবার ভানটুকু নেই যতদূর জানি। বছর বাইশ বয়স হ'তে পারে। ওপরে নয়, কমের মধ্যে কুড়ি।

—খুবই অল্প বয়স তো?

—ইয়েস, এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডসাম্, বুঝলে ভায়া। মাথা ঘুরে প'ড়ে না

গেলেও, মাথা ঘুরে যেতে পারে। তোমার কথা বলছি না অবিশ্যি। কেন না মাথা ঘুরে যাবার মত মেয়ে রেহাই পায় নি তোমার হাত থেকে। কিন্তু সে তোমার করুণা চেয়েছিল। এ তোমার করুণাও চাইবে না। সে যেদিন থেকে শুরু করেছে, সেইদিন থেকেই আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেখেছে। আর মিথ্যে চ্যালেঞ্জ সে জানায় নি। আমাদের ইনফর্মাররা তো এবেলা ওবেলা ধোঁকা খাচ্ছে। রুরাল ইনফর্মাররা বলে, বাবু ছুঁড়িটা জাদু জানে। আমাদের চোখে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। বাঁকার মেয়ে আমাদের ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে। আসলে কি ব্যাপার জান ভায়া। এভ্রি বডি ইজ্ ইন্ লাভ উইথ্ হার।

বলাই হেসে বলল, লাভ?

সুরেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, ভালবাসা। সকলেই তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে মনে হয়। তাই সবাইকে সে জাদু করেছে। বোধ হয় আমিও তার প্রেমে পড়েছি, তাই আমার চোখেও সে চিরদিন ধুলো দিল।

ব'লে সুরেশবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। হাসির উচ্ছ্বাসে তার লাল মুখটা প্রকাণ্ড হ'য়ে, দলা পাকিয়ে উঠল। হাসতে হাসতেই বললেন, খুব সাবধান ভায়া, তোমাকে যেন জাদু করতে না পারে মেয়েটা। আমাদের রুরাল ইনফর্মাররা তো মদের গন্ধ শুঁকলে নাকি ব'লে দিতে পারে, ওই মেয়েটার মদ কিনা। আর সেই মদ তোমার মালখানায় তোলবার আগেই ইনফর্মাররা অনেকখানি সাবড়ে দেবে। সবাই দুর্গীর হাতে চোলাই রস খেতে ভালবাসে।

—দুর্গী?

—মেয়েটার ওই নাম। কিন্তু ভায়া, তুমি যা ভাবছ, তা' কিন্তু মোটেই নয়।

বলাই বলল, আমি আবার কী ভাবলুম?

সুরেশবাবু ফোলা ফোলা লাল চোখে তাকিয়ে বললেন, মেয়েটার সম্পর্কে তুমি হয় তো ভাবছ, সেই শিলিগুড়ির মেয়েটার মতই।

বলাই বলল, কই না তো, সে রকম কিছু ভাবি নি আমি।

—ভাবো নি? কেন ভাবো নি, সেইটাই আশ্চর্য। কিন্তু কি রেসপেক্টেব্‌ল কি লোফার, মেয়েটার বাড়িতে কিন্তু কাউকে ভিড় করতে দেখা যায় নি।

বলাই হেসে বলল, তাতে কি এসে যায়?

সুরেশবাবু চোখ ঘুরিয়ে বললেন, ও বাবা! ওকে খারাপ বলবার জো নেই কারুর। আমাদের স্টাফের লোকেরা পর্যন্ত মুখ আলো করে বলবে, মেয়েটার চরিত্র দোষ দেওয়া যাবে না।

এবার বলাই হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, মদ চোলাই করে, তার আবার চরিত্র নিয়ে ভাবতে হবে নাকি?

—তাই তো জানতুম এতদিন। তা হ'লে আর তোমাকে কিংবদন্তীর নায়িকা বলছি কেন? মেয়েটি একলা নয়, তার সঙ্গে আবার একটি ছেলেও আছে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ব্রাহ্মণের ছেলে হে। নাম চিরঞ্জীব ব্যানার্জি। দুর্গা যদি বাঘিনী হয়, তবে চিরঞ্জীব নির্ঘাৎ বাঘ। এখানকার লোকেরা বলে, ওদের দুজনের মধ্যে 'আছে।'

'আছে'টা এমন ভাবে বললেন, বলাই না হেসে পারল না আবার। বলল, রীতিমত নভেল বলুন।

—রিয়্যালি। চিরঞ্জীবের সঙ্গে তোমার আলাপ হবে নিশ্চয়। সেও এ তল্লাটের ফেমাস্ বয়। তখন তুমি বুঝতে পারবে।

মনে মনে যে একটু বিস্ময়ের ছোঁয়া না লাগছিল, তা নয়। তবু সমস্ত ব্যাপারটা শুনে বলাইয়ের হাসিই পাচ্ছিল।

সুরেশবাবু বললেন, তবে, চিরঞ্জীব হচ্ছে নীচু বাংলার বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তুমি তরাইয়ের বাঘ। লড়ে যাও ভাই, আমরা হারজিতের সংবাদ শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকব।

বলাই সিগারেট বার করে বলল, ওটুকুও আর বাদ দিচ্ছেন কেন যে, 'মাঝখানে রইল সেই বাঘিনী, লড়ায়ে যার জিত, সে তারই।'

—বেশ বলেছ ভায়া।

দু'জনের উচ্চ গলার হাসি জানালার বাইরে ছড়িয়ে গেল। গাড়ি এসে দাঁড়াল গন্তব্যে।

সুরেশবাবু বলাইকে নিয়ে নামলেন। কাসেম এগিয়ে এল সেলাম ক'রে। নতুন অফিসারকে দেখছে সে।

সুরেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, খবর সব বহাল কাশেম?

—হ্যাঁ স্যার!

সুরেশবাবু চারদিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাটাদের ভিড় কেমন কাশেম?

কাশেম জবাব দিল, শয়তানগুলো সব এসেছে স্যার। হুগ্‌গা চিরো ওরা আসে নি অবিশ্যি। তবে দলের লোকেরা অনেক এসেছে।

সুরেশবাবু বললেন, বলেছি তো আগেই। কি বলছে সব?

—কি আর বলবে, বলছে, 'কি গো কাশেম চাচা, আমাদের অন্ন নিকি ঘুচল? 'তা' আমিও শালাদের জবাব দিয়েছি। বলেছি, 'ইমানের ভাত খাবি ঘরে, তার আবার ঘোচাঘুচির আছে কি? বে-ইমানের অন্ন হলে ঘুচবে।'

বলাইয়ের পছন্দ হল কাশেমকে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অন্ধকারটা ঘন হ'য়ে আসেনি এখনো।

স্টেশনের বাইরে এলে, চোখের সামনে প্রথম যে-টুকু চোখে পড়ে, তাতে মনে হয়, যেন একটি মফস্বল শহরের শুরু। আসলে হুগলি জেলার একটি গ্রাম। শহর হ'য়ে ওঠার তাগিদটা লক্ষণীয়। যদিও লক্ষণটা স্টেশনের কয়েক শো গজের মধ্যেই ইতি টেনে দিয়েছে। পুনশ্চের আভাস যেটুকু আছে, তা' সামান্য।

গায়ে যদিও লেখা নেই কোথাও, তবু একটি প্রাচীনতার ছাপ আছে গ্রামটায়। বোঝা যায়, আগে ছিল বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এককালে ছিল একটি ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। বনস্পতির তলায় নানান নামী অনামী বনের মত কিছু হাড়ি-বাগ্‌দি ডোম। অবশ্যই বনস্পতির দূর

সীমানায়। কাছাকাছি মধ্যবানটা রক্ষা করতেন কিছু কায়স্থ আর বৈদ্য। আর ছিল একটি বড় হাট। সংলগ্ন এই রেল স্টেশন।

হাওড়া থেকে মেইন লাইন দিয়ে বেরিয়ে প্রায় মাইল পনর এসে ব্রাঞ্চ লাইনটা চলে এসেছে এই পশ্চিমে। পশ্চিমোত্তর কোণ বলা যায়। লাইনটা চলে গেছে আরো ভিতরে। হাওড়াকে মহীরুহ বললে এই লাইনগুলিকে সুদূর ব্যাপ্ত শিকড়ের মত বলা যায়।

গ্রামটার গ্রামীণ চেহারায় ভাঙন ধরেছে যুদ্ধের পর থেকেই। জীবনের ভাঙনটা তো চলে আসছে শতাব্দী ধরেই। চেহারায় টিকে থাকতে চেয়েছিল। সেটাও আর সম্ভব হয় নি।

বামুন শুদ্দুরের, জাতাজাতের বিচার অনেকদিনই গেছে। অনেক পুরনো গেছে। নতুন আসছে একটু একটু ক'রে। বুধবার রবিবারে হাট বসে এখনো। কিন্তু প্রত্যহের বাজার হিসেবেও এখন বেশ তেজী। এখন শুধু বুধ রবির হাটের সওদায় দিন কাটে না। লোক বেড়েছে প্রধানত দেশ বিভাগের কল্যাণেই। পশ্চিম বাংলার কোথায় বাড়ে নি। সরকারি একটি বড় হাসপাতাল হয়েছে। একটি রিসার্চ ব্যুরো আছে ছোটখাটো। আরো দু'চারটে নতুন বাড়ি উঠেছে হাল আমলের মত। উত্তর দক্ষিণে লম্বা রাস্তাটা এ্যাস্‌ফল্টের। দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ঘুরে গিয়েছে মহকুমা শহরে। উত্তরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে চন্দননগরের দিকে। সব নদী এক জায়গায় যায়। এখানকার বড় বাঁধানো শড়কেরা সবাই যায় জি, টি, রোডে।

বৈদ্যুতিক আলো এসেছে বটে। নিতান্তই ষ্টেশনে, ষ্টেশনের কাছে আর অ্যাস্‌ফল্টের রাস্তার ওপরে কয়েকটি দোকানে, এক-আধটি বাড়িতে আলো পৌঁছেছে। বিজলী স্থির আলো জ্বলছে সেখানে। সবচেয়ে বেশী আলোকিত ক'রে জ্বলছে হাসপাতালে, রিসার্চ ব্যুরো কম্পাউণ্ডে। কিন্তু আলো জ্বলেনি এখনো রাস্তায়। অর্থাৎ নাই। বাকী সবখানেই এই সন্ধ্যার বৈশাখী বাতাসে অস্থিরভাবে কাঁপছে চিমনীকলী

কেরোসিনের আলো। হাজাকের সবজোট আলো এখনো বিদায় নেয়নি সব দোকানপাট থেকে।

টাইপ মফস্বল শহরের এগুলি প্রাথমিক লক্ষণ। কাপড় মনিহারি ময়রা আর মুদী দোকানের এপাশে ওপাশে কয়েকটি চা'য়ের দোকান। চণ্ডীমণ্ডপের আধুনিক সংস্করণ। সকালে বিকালে সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে আড্ডা বসেই। যদিও সাইকেল রিকশার আমদানি হয়েছে এখানেও, তবু এখনো গরুর গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশী। বাজারের ধারে ধারে লাইনবন্দী গরুর গাড়ি ঘাড় গুঁজে প'ড়ে রয়েছে। পড়ে রয়েছে আরো ষ্টেশন প্রাঙ্গণে।

গাড়িগুলি ভোরবেলা থেকে সারাদিনই পড়ে থাকে। সন্ধ্যা থেকে গ্রামে ফিরতে আরম্ভ করে, আবার মাঝ রাত্রি থেকেই ষ্টেশনে আসতে আরম্ভ করে। ভোর চারটের প্রথম গাড়িটা ধরতে আসে সবাই মালপত্র নিয়ে। তরিতরকারি সব্জীর একটি বড় কেন্দ্র বলা যায় অঞ্চলটাকে। আশে পাশের সবগুলি ষ্টেশন থেকে তরকারী বোঝাই হ'য়ে কলকাতায় ছোটে। হুগলী জেলার এ ব্রাঞ্চ লাইনটাকে সব্জীর লাইন বললেই চলে।

গ্রামের ভিতর দিকে, দুদিক থেকে দুটি রাস্তা চ'লে গেছে। একটি কাঁচা, আর একটি পাকা। পাকা অর্থে, খোয়া দুরমুশ করা রাস্তা। সেটা খানিকটা গিয়ে শেষ পর্যন্ত কাঁচা সড়কের সঙ্গেই একাত্ম হয়েছে। বলতেই পাকা। আঁকাবাঁকা গভীর লিক্ রেখা তার দুপাশে। এবড়ো খেবড়ো গর্তও কিছু কম নেই। কারণ যানবাহনের মধ্যে গরুরগাড়িই আছে। কয়েক মাস সাইকেল রিকশা চলে। তাও সারাদিনে একবার কি দু'বার। কারণ রিকশায় চাপবার লোকেরও অভাব। গ্রামের বাসিন্দারা রিকশায় চেপে গ্রামে ঢুকলে সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। আলোচনা তো হয়ই। তবু কেউ কেউ চাপে। যারা তাকানো কিংবা কথাকে গ্রাহ্য করে না। তা' ছাড়া মানুষের সময় অসময় আছে বৈ কি।

বন জঙ্গলের আশেপাশে এখানে, পথের ধারে ধারে বট অশথের ছড়াছড়ি। শতায়ু গাছগুলি হাতীর শুঁড়ের মত ঝুরি নামিয়েছে, শিকড় ছড়িয়েছে কাঠা কাঠা জমি নিয়ে। বুড়ো গাছগুলির বাড়টা এখন উঁচুর চেয়ে নীচুর দিকেই বেশী। তাই ঝুরি নামা গাছগুলিকে এখন বেঁটে আর ঝাড়ালো দেখায়। এখানে ওখানে ভাঙা বটের শিকড়ে ঘাড় মোচড়ানো মন্দিরের ছড়াছড়ি। সেকালের পুরণো বড় বড় বাড়িও যে চোখে না পড়ে তাও নয়। সেগুলি এখন ভূতুড়ে বাড়ির মত। লোক যদি বা আছে টের পাওয়া যায় না। রাত্রি হলে বাতির অভাব। ঘরে ঘরে জ্বালাবার মত অত বাতি নেই।

বলাই দেখল সুরেশবাবু মিথ্যে বলেন নি। বাজারে দোকানে পথের ধারের সব লোক যেন তাকেই গিলছে ছ'চোখ দিয়ে। কিন্তু সুরেশবাবু যে-জন্যে বলেছেন, সেজন্যেই কি? গাঁয়ে নতুন মানুষ এলে তো লোকে এমনি ক'রেই তাকিয়ে থাকে বোধহয়।

কেউ কেউ নমস্কার করল সুরেশবাবুকে। ছ'একজন বড় দোকানদার তারা। সবচেয়ে বড় করে নমস্কার করলে ওকুর দে। শেয়ালের মত নজর তার বলাইয়ের দিকে। কথা সুরেশবাবুর সঙ্গে। বলল, সদরে গেছলেন নাকি স্যার?

সুরেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার দ্বারা তো আপনাদের সজুত করা গেল না। বুড়ো হয়েছি। এইবার আগে থেকেই সাবধান।

ওকুর দে তার সেই পেটেণ্ট হাসি হেসে বলল, কি যে বলেন স্যার।

বলাইকে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করল সে—আপনি এলেন বুঝি স্যার? নমস্কার।

ওকুর দে কোনকালে বোধহয় স্কুলে পড়ত। সেই থেকেই সে স্যার স্যার শিখেছে, সেটার উচ্চারণ আর সুর আজও ভুলতে পারে নি।

বলাইয়ের অস্বস্তি শুধু নয়। সুরেশবাবুর সঙ্গে এদের এত

মাখামাখি কথা শুনে মনে মনে যেন বিরক্তও হল। সে ওকুর দে'কে কোন জবাব দিল না।'

ওকুরের মুখের হাসিটা একটু নিষ্প্রভ হল। কুঁচকে উঠল চোখের কোণ দুটি।

গ্রামের ভিতরে যাবার পাকা সড়ক ধরে অগ্রসর হলেন সুরেশ বাবু। কাসেম যার মাথায় বলাইয়ের মাল চাপিয়ে দিয়েছিল সে আগেই চলে গেছে। বলাইয়ের চোখে কলাবাগানের আধিক্য চোখে পড়ল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই, কলাবাগানের মধ্যে, গাছের ঝুপসি ঝাড়ে দলা বেঁধে উঠেছে।

হঠাৎ কাসেম থম্‌কে দাঁড়াল। বাঁদিকে বটগাছের তলায় ভাঙা পুরানো শিব মন্দির। চারপাশে আসশেওড়ার জঙ্গল।

কাসেম বলল, কে রে ওখেনে?

কোন জবাব নেই। কিন্তু কাসেমের দৃষ্টি সরলো না। শিকারী কুকুরের মত তার চোখ তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। ফুলে উঠল নাকের পাটা। সে চীৎকার ক'রে হাঁক দিল, কে ওখানে?

—কেন?

পাল্টা প্রশ্ন শুনে কাসেম কয়েক পা এগিয়ে গেল আসশেওড়ার জঙ্গলে। বলাইও দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুরেশবাবুর সঙ্গে। মন্দিরের কাছে জঙ্গল থেকে 'কেন' শব্দটা পুরুষ গলায় নয়।

পরমুহূর্তেই কাসেমের বিস্মিত গলা শোনা গেল, তোবা তোবা দুগ্‌গা নিকি?

বলতে বলতেই কাসেম আরো এগিয়ে গেল। আর কাশেমকে লক্ষ্য ক'রে সুরেশবাবুর চোখে পড়ল খয়েরি রং এর ওপর কালো কালো ডোরাকাটা শাড়ি। তিনি বলাইকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ওই, ওই দেখ ভায়া, বটগাছটার কোল আঁধারে, মন্দিরের সিঁড়ির কাছে সেই বাঘিনীটা। যার কথা তোমাকে আসতে আসতে বলেছি। বোধ হয় তোমাকে দেখে রাখছে।'

বলাইয়েরও তখন চোখে পড়েছে। সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় সে অবাক হয়ে দেখল সেই ডোরাকাটা মূর্তি। চোখে পড়বার কথা নয়। কাশেমের ওপর আর এক প্রস্থ বিস্মিত বিশ্বাস স্থাপিত হল তার। সে দেখল, দুটি আয়ত চোখ, কিন্তু আশ্চর্য তীক্ষ্ণ। আর অদ্ভুত বলিষ্ঠতা তার ছিপছিপে শরীরের উজ্জ্বল ডোরায় ডোরায়। খোলা চুলের রাশি তার ছড়িয়ে আছে কাঁধের দু'পাশে। গায়ের রং কটাসে না হ'লে, মূর্তিটা সম্পূর্ণ মিশে থাকতে পারত অন্ধকারে।

বৈশাখের বাতাস ঝাপটা খাচ্ছে ভাঙা মন্দিরটার গায়ে। বাতাস যেন শাসাচ্ছে বটের ডালে ডালে।

কাশেমের রুক্ষ গলা শোনা গেল, এখানে কী হচ্ছে?

জবাব শোনা গেল, যা হয় এখেনে, তাই হচ্ছে।

গলার স্বরে চড়া ঝংকার। নির্ভয় ও শ্লেষের আভাস। আবার শোনা গেল, ঠাকুরের থানে আবার কী হয়?

বলাইয়ের মনে হল, তীক্ষ্ণ চোখ দুটি তার দিকেই। কাসেম ততক্ষণ আঁসশেওড়ার জঙ্গলের চারপাশে পা দিয়ে লাথি মেরে মেরে যেন কিছু খুঁজতে আরম্ভ করেছে। সে বলল, তা এখেনে কেন? গাঁয়ের মধ্যে আর ভাল মন্দির নাই?

—থাকলেও বা এখেনে আসতে মানা আছে নিকি? আবগারির এমন আইন তো শুনিনি বাবা।

বলতে বলতেই মূর্তি অদৃশ্য হল অন্ধকারে। কাসেম মন্দিরের চারপাশটা দ্রুত একটা পাক খেয়ে নিল। সুরেশবাবু ডাকলেন, চলে এস কাসেম। তুমি যা ভাবছ, তা নয়। মাল পাচারের উদ্দেশ্যে আসে নি ও। বলাই ভায়াকেই দেখতে এসেছিল।

কাসেমের সুরমা টানা শিকারী চোখে তখন আর রাগের কোন আভাস নেই। বরং একটি অবাক বিষণ্ণতা তার চোখে। বলল, দুনিয়াটা সত্যি আজব কারখানা।

সুরেশবাবু বললে, দেখলে তো ভায়া। শুধু বাঘিনী নয়, চিতাবাঘিনী।

বলাই হেসে বলল, তাই দেখছি।

সামনের অন্ধকারে একটি আলোর বিন্দু জ্বলে উঠল। তারপরেই একটি চীৎকার ভেসে এল, হেই শালা, দেখতে পাস না। কানা নিকি রে মাম্‌দোটা।

বোঝা গেল, গরুর গাড়ি আসছে একটা।

রাস্তাটা দু'দিকে বাঁক নিয়েছে। একটি গ্রামের অভ্যন্তরে। সেটা বাঁয়ে। ডাইনের রাস্তার মোড় ফিরলেই চোখে পড়ে, অন্ধকারের বুকে বিরাট সিংদরজাওয়ালা দোতালা প্রাসাদপুরী। সিংদরজার খিলানে একটি টিমটিমে লণ্ঠন ঝুলছে। বাতাসে কাঁপছে আলো। আলোটা কাঁপছে সামনেই একটি গাছের অন্ধ ঝুপসিতে; যে-গাছটি বাড়িটির মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। আলো যেটুকু পড়েছে, তাতে দরজার সামনে কোন রকমে একটু দেখা যায়। বাদবাকী বাড়িটা কালো দৈত্যের মত যেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। দোতালার একটি জানালায় সামান্য আলো দেখা যায়। বাড়িটা পূবে পশ্চিমে লম্বা। কিন্তু পশ্চিমের শেষটা দেখা যায় না। কতগুলি গাছের আড়ালে হারিয়ে গেছে। অলিন্দে অলিন্দে ঘা খেয়ে বাতাস যেন মোটা স্বরে ডাক ছেড়েছে।

প্রাসাদপুরী নয়, বাড়িটা প্রেতপুরীর মত। সামনে পিছনে যেন অনেকগুলি চোখ আছে।

বলাই বলল, সব জায়গায় একই ব্যাপার?

—কিসের?

—এই একসাইজের অফিস বাড়ি।

কথাটা মিথ্যে নয়। মফস্বলের অধিকাংশ একসাইজ ডিপার্ট-মেন্টের বাড়িই প্রায় এরকম বিরাট আর সেকালের। কারণ বোধহয়,

এত বড় নতুন বাড়ি পাওয়া দুঃসাধ্য। পুরনো কাছারি বাড়ি, বাগান-বাড়ি কিংবা পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ি চিরকাল এভাবে কাজে লেগে এসেছে। আসলে অফিস, হাজত, কোয়ার্টার কর্মচারীদের বাসস্থান, সেপাইদের আস্তানা, সব একটি বাড়িতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুরেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, এই একটি ব্যাপারে সরকারের নট নড়নচড়ন। আমাদের সঙ্গে বোধহয় পোস্টাপিসেরো আত্মীয়তা আছে। তাদেরো কপালে চিরদিন এরকম পুরনো বাড়ি।

বলাইয়ের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল। মুখ তুলে বলল, লিকারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

জবাব দিল কাসেম, মালখানা থেকে বাস ছেড়েছে। পড়ে টড়ে গেছে বোধহয়।

সিংদরজা দিয়ে ঢোকবার মুখে ছোট গলি। গলির দু'পাশে খিলেন করা বেঞ্চ। সেকালের বাড়ির মত। সেখানে শুয়েছিল দুটি লোক। সুরেশবাবুকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোয়াল ঢোকা কালো কালো মুখে, লোক দুটির লাল চোখগুলি ঠিক শ্মশানের কুকুরের মত ঢুলুঢুলু। তবু সেই ঢুলুঢুলু চোখে তাদের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। একটা কদর্য সন্দেহের স্থায়ী ছাপ তাদের চোখে। মুখে হালকা মদের গন্ধ।

সুরেশবাবু সামনের হ্যাজাক-আলোকিত ঘরটায় ঢুকলেন বলাইকে নিয়ে। কাসেম থম্‌কে দাঁড়াল। তার সুরমা টানা চোখ যেন দপ্‌দপিয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, শালারা মাল টেনে এসেছিস্।

দুজনেই হাসল। সলজ্জ বিব্রত পোষা জন্তুর হাসি। অপরাধী পোষা কুকুর ধমক খেলে বোধ হয় এরকমভাবে হাসে। যে-হাসি দেখলে রাগ থাকে না।

কাসেম বলল, আর আমার কাছে গাওনা হল, 'একজনের পিছু ধাওয়া করছি, এ্যাক্টা কেস্ ধরা পড়তে পারে।'

একজন বলল, তাই তো গেছলুম চাচা। এই সবে ফিরছি। সেই

ডিট্‌ট্যান্‌ সিন্‌গাল অবধি ধাওয়া করেছিলুম রেল নাইন ধরে। পাত্তা করতে পারলুম না।

ডিট্‌ট্যান সিনগাল নিশ্চয় ডিসট্যান্ট্‌ সিগ্‌ন্যাল। ভুল ধরার কিছু নেই। ওই হল আর কি!

কাসেম ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কিসের পিছু ধাওয়া করতে গেছিলি।

দ্বিতীয় জন, লাল ঢুলুঢুলু চোখে, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল। ঘড়ঘড়ে গোঙা স্বরে বলল, কার আবার। যার পিছু ধাওয়া করতে এ নাইনে এয়েছি তার।

প্রথম জন বসে প'ড়ে বলল, হ্যাঁ। যার জন্যে ফেউ হয়িচি।

দ্বিতীয়টিও এবার তার পাশে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। দুজনেই যেন মার খাওয়া পশুর মত পঙ্গু হ'য়ে বসে রইল। অনুভূতিহীন, ভাবশূন্য।

কাসেমের গোঁফের কোণে শ্লেষ দেখা গেল। বলল, বাঁকার বেটির পিছু ধাওয়া করেছিলি বুঝিন?

দুজনে প্রায় একই সঙ্গে গুঙিয়ে উঠল, হুঁ—!

—কার কাছে খবর পেলি যে সে ওই পথে গেছে।

—পাড়ার নোকের কাছে।

কাসেম মুখখিস্তি ক'রে বলল, যেমন তোরা, তেমনি তোদের পড়শী। তোরা গেছিস রেল লাইনে, তাকে দেখে এলুম আমি টিশানের রাস্তায়, ভাঙা মন্দিরের জঙ্গলে। ধু-র শালারা!

কাসেম ঢুকে গেল অফিস ঘরে।

লোক দুটি অথর্ব্বের মত অনড় হয়ে রইল। ফাঁসীর লাসের মত লাল উদ্দীপ্ত চোখে তারা তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

যেন স্বপ্নের ঘোরে একজন বলল, তা' হবে বা।

আর একজন তেমনি ভাবেই বলল, হুঁ। সোনার হরিণের মতন।

প্রথম জন আবার বলল, মায়াবিনী।

দ্বিতীয় জন—বড় বাবু বলে, চিতানী।

অর্থাৎ চিতা বাঘিনী।

হয় তো আরো কথা তারা বলত। সহসা একটা দমকা বাতাস সিংদরজার খিলানে ধাক্কা খেয়ে চাপা সোর তুলে দিল। ঝুলানো লণ্ঠনটা দুলে উঠল জোরে। তারা দুজনেই বাইরের দিকে ফিরে তাকাল। লণ্ঠনের আলোর একটি রেশ দুলে দুলে তাদের গায়ে পড়তে লাগল। পড়তে লাগল, সরতে লাগল।

ওরা দুজনেই আবার হাঁটু মাথা এক ক'রে বেঁকে দুমড়ে শুয়ে পড়ল।

লোক দুটি কেষ্ট আর ভোলা। বাঁকা বাগ্‌দির দলের লোক ছিল এক সময়ে। ওরা দুজনেই বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ের প্রেম প্রার্থী ছিল। দুর্গা হবে বীর্যশুল্কা, ওরা লড়বে, এই ছিল ওদের মনে। কিন্তু দুর্গা ওদের দুজনকেই নিরাশ করেছে।

তারপর দুর্গা একদিন চোলাই শুরু করলে। ওদের সাধ ছিল, চিরদিন দুর্গার আজ্ঞায়, দুর্গার কাছে থেকে তার কাজ করে দেবে। কিন্তু দুর্গা ওদের বিতাড়িত করেছে।

দুর্গা তাড়িয়েছে তো, আর কারুর সঙ্গে ওরা কাজ করতে পারে নি। মন ব'লে নাকি একটা কথা আছে। এত হেনস্থা-ই বা কেন ? মানুষের মন পোড়ে না !

পোড়ে। পোড়ে তাই ওদের চোখ দপদপিয়ে উঠেছিল। তাই ওরা এসে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। চ্যাংমুড়ি কানী মনসার মত ওরা দুর্গার পিছু পিছু ছুটবে। দিনে রাত্রে, ঝড়ে জলে রোদে, আকাশে পাতালে, সাপের মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে। তারপর একদিন ধরবে।

ওরা দুজনে শুয়ে শুয়ে বোধ হয় সেই কল্পিত ছবিই দেখতে লাগল, অসহায় দয়া প্রার্থিনী দুর্গা তাদের বন্দিনী। বোধ হয় তারা স্বপ্ন দেখতে লাগল, আহা ! এমন সুন্দর মনের মত পাখীটিকেও খাঁচায় পোরা যায়। ওকে ছেড়ে দেব আমরা।

অফিস ঘরে যারা ছিল, তাদের সকলের সঙ্গেই বলাইয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন সুরেশবাবু। এস. আই অখিল গাংগুলি, ছোট জমাদার ধীরেন পালিত। দুজন বাঙালী সেপাইও ছিল।

হ্যাজাকের উত্তাপে ঘরটা গরম হয়ে উঠেছে। টেবিল চেয়ার ছাড়া, এক পাশে দুটি খাটিয়া রয়েছে। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে দুটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো রাইফেল।

সুরেশবাবু বসে পড়েছিলেন। বলাইকেও বসতে অনুরোধ করলেন অখিলবাবু।

অখিলবাবু সুরেশবাবুরই সমবয়সী প্রায়। গোলগাল নাদুসনুদুস কালো আর বেঁটে মানুষ। খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা চুল। থ্যাবড়া নাকের ওপর কামড়ে বসেছে মোটা লেন্সের চশমা। হাফসার্টের ওপর প্যান্টের মত করে, মাল কোঁচা দিয়ে ধুতি পরা। বাঁ হাতের মনিবন্ধে একটি পুরনো রিস্টওয়াচ্।

পরিবার পরিজন কেউ নেই এখানে। বাঙালি সেপাইদের মেসেই খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। আমুদে লোক বলে খ্যাতি আছে। একটু মুখ খারাপ করা অভ্যাস। কিন্তু এমনিতে খুবই বিনয়ী। মোটা সোটা মুখখানি দেখে মনে হয়, অখিলবাবু ভাজার মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না।

একমাত্র সুরেশবাবু ওকে 'তুমি' বলেন। অখিলের কথায় বাধা দিয়ে সুরেশবাবু বললেন, না, না, এখন আর এখানে বসতে ব'লো না অখিল। সেই কাল দুপুরে বেচারী বেরিয়েছে, এখনো রেস্ট পায় নি। চণ্ডীটা বেরোয় নি তো আবার?

চণ্ডী সুরেশবাবুর চাকর এবং রাঁধুনি ব্রাহ্মণ, দুই-ই।

ধীরেন বলল, না স্যার, বাড়িতেই আছে।

সুরেশ বললেন বলাইকে, তা হলে ওঠ ভায়া। চার্জ তোমাকে কাল বোঝাব। এখন একটু রেস্ট নেবে চল।

—তাই চলুন।

সুরেশ উঠে ঘর থেকে বেরুবার উদ্যোগ করতেই অখিল বললেন, তাহ কাল কিন্তু কোর্টে কেস্ আছে।

সুরেশ থম্‌কে দাঁড়ালেন। প্রায় তেংচে বললেন, দেখ অখিল, তুমি সব সময় বাগ্‌ড়া দিও না। কোর্টে কি ঘুম চোখেই যেতে হবে? কাল সকালে কথা বলা যাবে না?

বোঝা যায়, এ শুধু পদমর্যাদার ধমক নয়। তা সম্ভবও নয়। পদমর্যাদার অন্তরালে একটি অকথিত বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে অনেকদিন ধরে। উভয়েই সেটা জানেন। তাই অখিল ভারী একটা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে, গাল ফুলিয়ে বললেন, তাই বলছিলুম। যদি মনে না থাকে, তাই আর কি।

সুরেশ আর একপ্রস্থ ধমকালেন। প্রায় খিঁচিয়েই বললেন, খালি তোমারই মনে থাকে, না? লোকটা একটা যাচ্ছেতাই রকম কর্তব্যপরায়ণ। কিছু খায়-টায় নাকি কে জানে? এস হে ভায়া।

বলেই বেরিয়ে গেলেন।

বীরেন হাসতে যাচ্ছিল। তার আগেই অখিল পাখার বাট দিয়ে টেবিলের ওপর মেরে বললেন, থাক্, আর রসিকতা করতে হবে না। কমলাপুরের কেসের ফাইলটা বার কর দয়া ক'রে।

ধমক খেয়ে হাসির অট্টরোলটা ফেটে পড়ল না বটে। অন্তস্রোতে চাপা রইল না কৌতুকের বান।

সুরেশবাবু বললেন, সাবধানে এসো ভায়া, বড় পেছল।

মিথ্যে নয়, বলাইয়ের রবার শোল বায়ে বায়ে পিছলে যেতে চাইছিল। মনে হচ্ছিল, যেন কোন অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হচ্ছে তারা। দুদিকে চাপা ঘর, মাঝখানে সরু গলি। কাসেম আগেই সেখানে হ্যারিকেন বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় এই মান্ধাতা আমলের গলিটায় চেপে বসা অন্ধকার তাতে ঘোচে নি। শুধু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে চামচিকেরা।

বোধহয় একটি মহল পার হয়ে এল ওরা। একটি বাঁক নিতেই, সামনে উঠোন। উঠোনের চার পাশেই ঘর। সংলগ্ন বারান্দা। ভিতর মহলের এই উঠোন যেন একটা হাড়ল কুয়োর গর্ত। আলো বাতাস এখানে নিষিদ্ধ। ওপর দিকে তাকালে একখানি চৌকো আকাশের টুকরো দেখা যায়। বোঝা যায়, অন্দর মহলের অতীত অধিবাসীনীরা সারাদিন ওই চৌকো আকাশটুকুর দিকে ব্যাকুল হ'য়ে তাকিয়ে থাকত। কখন সূর্য ওই চৌকো জায়গাটুকুতে উঁকি দিয়ে পালাবে। বোঝা যায়, বাতাস এখানে একবার কোনোরকমে ঢুকে পড়লে সহজে বেরোতে পারে না। বন্দী বাতাস এখানে ঢুকে ফোঁসে, আবর্তিত হয়, চাপা গর্জনে শাসায়। হয় তো হা হা শব্দে কাঁদেও।

আজকের বৈশাখী বাতাসও নোনা ইঁটের বদ্ধ কারায় মাথা কুটছে। যেন চাপা স্বরে শাসাচ্ছে। দু'টি হ্যারিকেন দুদিকের বারান্দায় রাখা আছে। ঢুকে পড়া বাতাসের আবর্তে চিমনী-বন্দী শিখা কাঁপছে থরো থরো।

বারান্দা পেরিয়ে প্রশস্ত দালানেও আলো দেখা যায়। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে মানুষের। শিলের বুকে নোড়ার পাথুরে পেষনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে রান্নার।

সুরেশ আঙুল দেখিয়ে বললেন, যে-দিকটা অন্ধকার দেখছ, ওদিককার ঘরগুলি লোহার শিক ঘিরে আমি হাজত করে নিয়েছি। ওপাশের দিকটায় আছে মালখানা। কাল সকালে তোমাকে দেখাব। আর এদিকটায় মোটামুটি রান্নার কাজ হয়। ঘর অনেকগুলি। একটাতে স্টাফ মেসের কিচেন, আর একটা আমার। এর পরে আমার কিচেনটাই তোমার কাজে লাগবে। ওদেরটা ওদেরই থাকবে। অবিশ্যি, ইচ্ছে করলে তোমারটা ওপরেই ব্যবস্থা করে নিতে পার। দোতলার রাজ্যটা পুরোপুরি তোমারই থাকবে! তবে জল টানাটানি করাই মুশকিল।

বলাই বলল, নীচে যদি আপনার চলে থাকে, তবে আমারও চলবে।

সুরেশ দালানে ঢুকে বললেন, সেটা আপাতত গিন্নীর বিচারের ওপর ছেড়ে রেখে দাও। কারণ, ম্যান প্রোপোজেস্ এ্যণ্ড গড ডিস্‌পোজেস্। তুমি করবে এক, ভগবতী দেবী এসে করবেন আর এক। নইলে ওঁরা আর ওঁরা কেন, বল?

এমন মোক্ষম যুক্তির ওপরে কথা চলে না। বলাই হেসে, সীঁড়ি ভাঙতে গিয়ে অবাক হল। একমাত্র দোতলায় উঠতেই সীঁড়ির চারটে বাঁক। সে বলল, এ যে প্রায় রিভলভিং স্টেয়ার কেস্।

সুরেশ বললেন, প্রায় তাই। সেকেলে বাড়ি তো। ডাকাতের ভয় ছিল। এ বাঁকগুলো হচ্ছে বাধা। নয়তো বলতে পার লড়াইয়ের বাঁক। এই সব বাঁকের মুখে মুখে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই হয় গৃহস্থের।

বদ্ধ সীঁড়িতে পুরনো ইঁটের গন্ধ। দেয়ালে হাত দিতে ভয় করে। চুণকামের এই আপাত পালিশ বোধ হয় খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভয় হয়, ঝুরঝুর ক'রে সব ঝ'রে পড়বে।

দোতলায় এসে পাওয়া গেল হ্যাজাকের আলো। কাসেম সেখানে উপস্থিত।

কাসেম সুরেশকে বলল, বিছানা পেতে দিয়েছি আপনার পাশের ঘরে। আলো দিয়ে দিয়েছি হাত মুখ ধোবার জল রাখা আছে পেছনের বারান্দায়। চণ্ডী চা জলখাবার নিয়ে আসছে।

সুরেশ বললেন, বটে? তবে আর কি। যাও হে ভায়া, এক হাতে জলখাবার নাও, অন্য হাতে হাত মুখ ধোও, ওর.মধ্যেই একটু বিছানায় আরাম ক'রেও নাও।

কাসেম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তোবা তোবা! তা বলি নাই। ধীরে সুস্থে সব হোক। সব তৈয়ারী আছে, সে খবরটা জানিয়ে দিলাম স্যার।

বলাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে কাসেম একটু হাসল। বোঝা গেল, সুরেশবাবুর এই চরিত্রের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। সকলের সঙ্গেই সুরেশবাবুর সৌহার্দ্য।

সুরেশ মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, সব অখিলের চেলা, এত বেশী কর্তব্যপরায়ণ যে দেখলে গা জ্বালা করে। বস ভায়া বস, ওই ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটু বস।

বলাই প্রায় ভয়ে ভয়ে বলল, আর বসব না, ভাবছি একেবারে গা' হাত পা ধুয়ে, জামা-কাপড় ছেড়ে বসব।

সুরেশ আরক্ত চোখে তাকালেন বলাইয়ের দিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় নেড়ে হতাশ গলায় বললেন, বুঝেছি। তুমিও একই দলের দলী। যাও তাই'লে।

বলাই ঘর দিয়ে পেছনের বারান্দায় গেল। সব দিক অন্ধকার। বাতাস শোঁ শোঁ সোর তুলেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু দূরে অন্ধকারে কী একটা দুলছে। চক্‌চক্ করছে। বলাই ভাল করে লক্ষ্য করল। দেখল, একটি পুকুর। চারপাশেই যেন ঘন অরণ্যের জটলা। সহসা মনে হয়, এ বাড়িটা যেন শূন্যে উড়ে চলেছে। আশেপাশে যে বাড়ি নেই একটিও। নোনা ইঁট আর মালখানার মদের গন্ধে বাতাস ভারী। দূরে কোথায় শেয়াল ডাকছে। বোধহয় প্রথম প্রহরের শুরু হল।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল বলাই, সেখান থেকে বাড়ীটার পিছনের অনেকখানি অংশ দেখা যায়। বোঝা যায়, ছাদের আলসে ভেঙেছে কয়েক জায়গায়। ফাটল ধরেছে নানান খানে। শ্যাওলা জমেছে গায়ে গায়ে। অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে ফাটলে। আর সর্বত্র বাতাস যেন কখনো শাসাচ্ছে। কখনো দীর্ঘশ্বাসের মত হাহাকার করছে।

স্ত্রী'র কথা মনে পড়ল বলাইয়ের। মলিনা এসে থাকবে কেমন ক'রে এখানে। যদিও মলিনা ভিড়ের মধ্যে থেকে কখনোই অভ্যস্ত

নয়, তবু, এই নির্জন পুরনো রাক্ষুসে বাড়িটার কোটরে থাকতে তার কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে মলিনার। সেজন্যে বলাইয়েরও মনে মনে কষ্ট হবে। কিন্তু চিন্তা করা নিরর্থক। কোনো উপায় নেই। চাকরি ছাড়া যায় না। মলিনাকে ছেড়ে থাকা আরো দুঃসাধ্য।

বলাই চা জলখাবার খেল। সুরেশবাবু কিছুই খেলেন না। গোঙা স্বরে বললেন, লাইট, টেলিফোন কিছুই নেই। থানাও এখান থেকে অনেক দূর। সৌভাগ্য তোমার মাত্র একটিই। যদিও থানার আণ্ডারেই আছে, তবু একটি জীপ গাড়ি তুমি প্রায় সর্বক্ষণের জন্যেই পাবে।

বলাই মনে মনে ভাবল, আপাতত সেটা হলেই চলবে।

* * *

নীচে দেউড়ির গলিতে, কেষ্ট হঠাৎ উঠে বসল। ভোলার নাকে শব্দ হচ্ছে। ঠিক নাক ডাকার শব্দ বলা যাবে না সেটাকে। নিশ্বাস চাপা পড়ে যেন হিস্ হিস্ করছে।

কেষ্ট তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল, হেই ভোলা, ভোলা।

ভোলা ধড় মড় ক'রে উঠে বসল বলল, অ্যাঁ, কী?

কেষ্ট বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, না কিছু লয়। তুই তো শালা খালি ঘুম মারছিস্ প'ড়ে প'ড়ে।

ভোলা বলল, ঘুমুই নাই, এট্টু ঘোরে আছি।

—তোর কি মনে লয় না, দুগ্‌গা নিচ্চয় কোথাও বেরিয়েছে?

—মনে লেয়।

—তবে চ' যাই, গাঁয়ের মধ্যে। খবর-টবর কিছু মেলে কি না।

—চ', মাতি মুচিনীর কাছে যাই।

ওরা দুজনে দু'দণ্ড নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। বিভোর হয়ে ঘুমোতে পারে না পুরো রাত্রিটুকু। শয়নে স্বপনে ওরা দ্যাখে,

বাঁকা বাগ্‌দীর মেয়ে যেন ওদেরই আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তাই ওরা ঘুমন্তও চমকায়।

মানুষের অনেক রকম শত্রু। কিন্তু ভোলা আর কেষ্টর জীবনে যে-রকম শত্রু জুটেছে, এমন শত্রু বোধ হয় মানুষের জোটে না। ওরা ছিল বাঘের সঙ্গী, এখন হয়েছে ফেউ! কিন্তু ওদের জাত গেছে, পেট ভরে নি। জীবন নিশ্চিন্ত হয় নি। সরকারের চাকুরে নয় ওরা। পেট চলে খবর বেচে। তাও সঠিক খবর। যা তা খবর হলে চলবে না। সত্য মিথ্যা প্রমাণ হওয়া দরকার। একদিন যে-কাগজ দুটি নিয়ে ওদের অহঙ্কার ছিল, সে কাগজ দুটি এখন ওদের ট্যাঁকে কিংবা পকেটে তেলচিটে হয়ে গেছে। কাগজ দুটি হল লোকাল আবগারি বিভাগ থেকে দেওয়া 'স্বেচ্ছা-সংবাদদাতা'র স্বীকৃতিপত্র। ওগুলি ওদের কাছে কেউ যেচে দেখতে চায় নি। ওরা নিজেরাই সবাইকে ডেকে দেখিয়েছে। আজকাল আর দেখায় না। কারণ ওরা যে ফেউ, সেটা কাগজ না দেখালেও লোকে এখন জানে।

ভোলা বলল, কিন্তুন, মুচিনী বুড়িটা নিকি দুগ্‌গার দলে ভিড়েছে আজকাল।

কেষ্ট বলল, তবু চ' একবার দেখি।

ওরা দুজনে বেরিয়ে এল দেউড়ির বাইরে। মাথার ওপরে লণ্ঠনটা তেমনি দুলছে। ভোলা কেষ্টর দুটি অমানুষিক ছায়া লণ্ঠনের তালে তালে কাঁপতে লাগল মাটিতে। অন্ধকার কোলে, জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে চোখ। নাকের পাটা উঠল ফুলে ফুলে।

ভোলা বলল, রসের গন্ধ।

কেষ্ট জবাব দিল, মালখানা থেকে বাস ছাড়ছে।

—দুগ্‌গার হাতের রসও আছে মালখানায়।

—তাই বোধহয় অমন কড়া বাস।

—শুঁকেই নেশা ধরে যায়।

—আর শালা খোয়ারি কাটতে চায় না।

কথাগুলি ওদের চাপা গোঙানীর মত। ওরা ছাড়া, সে কথা বোধহয় কেউ বুঝতে পারবে না। গোদা গোদা ফাটা পায়ে ওরা নিঃশব্দে গ্রামের দিকে অগ্রসর হ'ল।

তিন দিন পর বলাই চিঠি লিখতে বসল মলিনাকে। লিখল—

মলিন,

সবচেয়ে জরুরী সংবাদ যেটা, সেটা হল, কাজে জয়েন করেছি। এবং ততোধিক জরুরী, তুমিও পত্র পাঠ জয়েন করতে চলে এসো। ওদিককার ব্যবস্থা তো সব ঠিকই আছে। এদিককার ব্যবস্থা জানিয়ে চিঠি দেবার কথা ছিল আমার। এদিককার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। অবশ্যই আমার মতে। এখন তুমি এলেই হয়। কারণ বয়স্থ সুরেশবাবু (আমি যাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছি) একটি মহাজন বাক্য শোনালেন, ম্যান প্রোপোজেস্ এ্যাণ্ড গড্ ডিস্‌পোজেস্। সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরে নিজের মত করে নেওয়া, তোমার জন্য রইল। যদিও বিভাগটা সেই আবগারি-ই, স্বামী তোমার আবগারি দারোগা-ই। পুলিশের লোক তোমার স্বামী, ও-দুঃখটা কোনক্রমেই আমি ঘোচাতে পারব না। দোহাই, রেগে যেও না যেন, এ কিন্তু খোঁটা নয়।

বর্তমান বাসস্থানের বিবরণ দিয়ে আগেই তোমার ভাললাগা মন্দলাগার ভাবনা চাপাতে চাইনে। এসে নিজের চোখেই দেখবে। সুরেশবাবু থাকতে থাকতে এলেই ভালো হয়। তোমার খুব ভালো লাগবে ওঁকে। ভয় নেই বয়স অনেক। আমাদের পিতৃতুল্য। অবশ্য নারী এবং পুরুষের শুনেছি মাঝে মাঝে তৃতীয় নয়ন খোলে। আর সে নয়ন খুললে নাকি রূপ গুণ বয়স সব গৌণ হয়ে যায়। সে সব থাক্, আমি তা বলছিনে। লোকটি এক কথায় চমৎকার। আমার খুব ভয় করে ওঁকে। উনি যে-সব কথা বলেন চাকরী ও জীবন সম্পর্কে, সে কথা শুনলে আর চাকরি করা যায় না। অন্তত দারোগার চাকরি। ওঁর সঙ্গে কথা বললে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোমাদের মতের মিল হবে।

চিঠি যখন যাবে, তোমার হাতে তখন নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যের রসের জোয়ার খেলছে। এরকম অক্লান্ত পাঠিকার অবশ্য এ পত্র পড়তে বিরক্তি লাগবে। তবু আজ সন্ধেবেলাতেই আমার ধরা প্রথম কেস্ ও আসামীর কথা তোমাকে না লিখে পারলাম না। অবশ্যই এটা কোনো সাহিত্য পদবাচ্য নয়। তবে অবাক হতে হবে। তার সঙ্গে আরো কিছু ভাবনা মনে আসতে পারে। আর সেই সঙ্গেই আমার নতুন কর্মস্থানের কিঞ্চিৎ চারিত্রিক পরিচয় মিলতে পারে।

নতুন জয়েন করেছি, সুতরাং এখনো সব হালচাল এখানকার বুঝিনে। বিকেলবেলার দিকে সুরেশবাবু কাছে না থাকায়, অগত্যা একটু ষ্টেশনেই গিয়েছিলাম বেড়াতে। এখনো অনেকেই অচেনা। যদিও সুরেশবাবু এবং সাবর্ডিনেটস্‌দের কাছে শুনতে পাই, এখানে প্রথম যেদিন এসেছি, সেইদিনই আমাকে সবাই চিনে রেখেছে।

যাই হোক, প্ল্যাটফর্মেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সন্ধ্যা তখন হবো হবো। এখন কথা হচ্ছে, আমি যে ঘুরেই বেড়াচ্ছিলাম, একথা বিশ্বাস করবে কে? সংসারে অনেক লোকই বিকেলে বেড়াতে পারে। কিন্তু আমাদের মত লোক যে ঘুরে বেড়ায়, এসব কথা অচল টাকা চালাবার মত বাটপাড়ি ছাড়া আর কি? এ শুধু তোমাকে ব'লেই লিখতে সাহস করছি, কথাটা সত্যি। আমি আমার মলিনের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, আজ মলিনকে একটি চিঠি লিখতে হবে।

দুটি প্ল্যাটফরমেই কিছু কিছু লোক ছিল। সকলেই আপ 'ডাউনের যাত্রী। আমার মত কেউ ছিল কি না জানিনে। বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে যখন স্থির করে ফেলেছি, তোমাকে কী কী লিখব, তখন বাসায় ফেরার জন্যে প্ল্যাটফরম থেকে বেরুতে গেলাম। ঠিক সেই সময়, সেই দুটি চোখের সঙ্গে আমার দু চোখের মিলন হল। যাকে বলে একেবারে 'চারি চক্ষুর মিলন।'

রোসো, ভয় পেও না। ভাবছ নিশ্চয়, শিলিগুড়ির সেই দাদার দোকানে যেসব বই পাওয়া যায়, যেগুলি কলকাতার বটতলা

থেকে ওখানকার পাইনতলায় গেছে, যে সব বইয়ের কাহিনী ছাঁকা ঝেড়ে দিচ্ছি। তা' কিন্তু মোটেই নয়।

কেন যে চোখে চোখ পড়ল, ভেবে আমার নিজেরই তারপর রাগ হচ্ছিল। প্রথমবারে নিতান্তই চোখে চোখ পড়েছিল। পৃথিবীর কত লোকের সঙ্গেই চোখাচোখি হয়। সেই ভেবেই চোখ ফিরিয়ে চলে আসছিলাম। কিন্তু আমার ভিতরে কী ঘটে গেল। ওই চোখ দুটি আমাকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করল। আমি আবার ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য! সেই চোখ দুটিও আমার চোখের ওপরেই। আমার তাকাতেই চকিতে দৃষ্টি বিনিময় এবং চোখ দুটি দ্রুত অন্যদিকে ফিরল।

কিন্তু আমার দুটি পায়ে যেন তখন কে স্ক্রু এঁটে দিয়েছে। আমি ফিরে দাঁড়ালাম। সরে যেতে যেতেও সেই চোখদুটির সঙ্গে আবার আভাসে একবার দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল। আমি সেই চোখ দুটির দিকে খুব ধীরে অগ্রসর হলাম। বুঝতে পারলাম না, আমার চোখেই পাপ, না পাপ ওই চোখ দুটিতে?

নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠছ? চোখ দুটির মালিকের একটু পরিচয় প্রয়োজন, না? অন্ততঃ নারী না পুরুষ, সেটা বলা দরকার। এ ক্ষেত্রে তোমার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে, চোখ দুটির মালিক যিনি তিনি নারী। জমেছে নিশ্চয়? উঁহু, নীচের লাইন পড়বে না। যেমন যেমন লিখছি, তেমনি পড়ে যাও।

তারপর, আমি যেমন বেড়াবার ছলে একটু একটু করে অগ্রসর হই, সেই চোখ দুটিও তেমনি আড়ে আড়ে চেয়ে, যেন বসবার একটি জায়গা খুঁজছে এমনিভাবে এগুতে লাগল। আমি ভাবলাম, কী কুক্ষণেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। আমার ভিতরে একটি বিশেষ প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমেই নিকুণ্ডল হ'চ্ছে লাগল। দৃঢ় হতে লাগল সন্দেহ।

কিন্তু এ ও কি সম্ভব? আমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে? স্টেশনের লোকেরা বলবে কি আমাকে? ওইরকম একজন ভদ্রমহিলার

যাকে বলে 'পশ্চাদ্ধাবন' করলেই হল নাকি? যা দিনকাল। দারোগারই চামড়া খুলে নেবে লোকে।

কারণ ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের কাছাকাছি নিশ্চয়। ভদ্রঘরের বিধবা এবং তাঁর আধময়লা থানের পুরনো ক্ষারে কাচা গরদের চাদরখানি যত ছেঁড়াই হোক, আমাদের মা দিদিমাদের চেয়ে তাঁকে কোন অংশেই কম সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল না। তিনি ধনী নন, কিন্তু মানী, এটুকু তাঁর চেহারায় চোখে মুখে সর্বত্র বর্তমান। হাতে একখানি পুরনো ছোট টিনের সুটকেশ। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। ওঁকে যদি সন্দেহ করতে হয়, তবে নিজের মা দিদিমাদেরও করতে হয়।

কিন্তু আমি নাচার। যে আমাকে প্রথম স্ক্রু এঁটে দিয়েছিল পায়ে, সে-ই টেনে নিয়ে চলল আমাকে। তখন আর কোন উপায় নেই। টিকিট কাটা হয়ে গেছে ঘোড়া ছুটবেই। তারপর কপালে যা থাকে।

আমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি পা চালালাম। ভদ্রমহিলাও ততোধিক তাড়াতাড়ি। শুনতে পেলাম উনি বিড়বিড় ক'রে বলছেন, হে মধুসূদন! হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ!

তারপর দেখলাম, উনি দৌড়বার তাল করছেন। আমি ডাকলাম, শুনুন, দাঁড়ান।

কিন্তু তিনি দাঁড়ালেন না। চলতেই লাগলেন। উদ্দেশ্য, প্ল্যাটফরম পার হ'য়ে যাবেন। আমি গলা তুলে বললাম, দাঁড়ান বলছি।

ভদ্রমহিলা ফিরে প্রায় কেঁদে উঠে করুণভাবে বললেন, কেন? কে বাবা তুমি? তোমাকে তো আমি চিনি নে।

বললাম, না চিনলেন। আপনি দাঁড়ান।

কিন্তু পা তাঁর থামল না। একটু গলা তুলেই বললেন, কেন? একি কথা? ভদ্দরলোকের মেয়েছেলের সঙ্গে এ কি ব্যাভার বাপু তোমার?

—আপনি দাঁড়ান, নইলে আমি ছুটে ধরব।

এইবার ভদ্রমহিলা ধপাস্ করে বসে পড়লেন। লোকজন লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। তারা এসে জড়ো হল তাড়াতাড়ি।

ভদ্রমহিলা অসহায় চোখে তাকালেন আমার দিকে। মলিন! আমি তো জানি, এবার তুমি আমার ওপর রাগ করবে। কারণ, আমি ভদ্রমহিলার চোখে যেন পরিষ্কার এই অনুনয় দেখতে পেলাম, 'লক্ষ্মী বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও এবারটি।' কিন্তু তা' আমি পারি নে। এই লোকেরা আমাকে ছাড়বে কেন? এটা একটা অলিখিত নিয়মের মত। তাদের সামনেই প্রমাণ হওয়া দরকার।

ভদ্রমহিলা বললেন, কি চাও বাবা তুমি আমার কাছে।

বললাম, আমি আপনার স্যুটকেশটা দেখব।

—কেন বাবা। গরীব বামুনের বিধবার বাসকো আর কি দেখবে বাবা?

কিছুতেই দেখাবেন না।

বললাম, খুলুন, খুলতেই বা আপত্তি করছেন কেন?

ইতিমধ্যে আমাদের জমাদার কাশেম এসে উপস্থিত। সে একেবারেই হতবাক। বুঝলাম, ভদ্রমহিলাকে দেখে, আমাকেই সে সন্দেহ করেছে।

উনি তখনো বলছিলেন, বাস্‌কোয় কি থাক্‌তে পারে? বড় মেয়ে পোয়াতী, তাকে দেখতে যাচ্ছি। ছোট মেয়ে বাস্‌কো সাজিয়ে দিয়েছে। দেখবার কি আছে?

এবার আমার হয়ে কাশেম তার বাজখাই গলায় হুকুম দিল, বুড়ি বাজে বকে মরবে, না খুলবে? খোল জল্‌দি জল্‌দি।

স্যুটকেশ খোলা হল। দেখলাম, ভদ্রমহিলার গায়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল একটি পরিচ্ছন্ন থান কাপড়ের ওপর রুদ্রাক্ষের বড় একগুচ্ছ মালা। তার নীচে আর একটি পুরনো গরদের থান। তার নীচে, চারটি চোলাই মদ ভরা বোতল।

মলিন! তুমি হয় তো বিশ্বাস করবে না, সেই মুহূর্তে আমি আমারই পরাজয় কামনা করছিলাম। তাতে আমার অহঙ্কার কমত কি না জানি নে, মলিনা সান্যালের স্বামী সুখী হত।

আমি আশা করলাম, ভদ্রমহিলাকে কেউ তখুনি জামিনে খালাস করতে আসবে। কিন্তু, এখন রাত অনেক, এখনো পর্যন্ত কেউ আসে নি। আমি ওঁকে হাজতেই রেখে দিয়েছি।

নাম হেমাঙ্গিনী দেবী। এই অঞ্চলেই বাড়ি। উনি নিজের মনেই কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, এক মুঠো চাল নেই, এক ফোঁটা কেরোসিন তেল নেই ঘরে। উপোস ক'রে আমার সোমত্ত মেয়েটা আঁধারে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাবে।

তারপরে বললেন, যাক্! আমাকে বাস্কো থেকে ওই রুদ্রাক্ষের মালাটি দাও বাবা, বসে একটু জপ করি।

মলিন, শুনে তুমি রাগ করবে, আমি মালাখানি দিই নি। অবিকল ওইভাবেই ওটা আমি কোর্টে প্রডিউস্ করতে চাই। তুমি নিশ্চয় বিদ্রূপ ক'রে হাস্ছ আর এই বৃদ্ধার ভবিষ্যৎ বিচারের কথা ভেবে, আমাকেই ধিক্কার দিচ্ছ। কিন্তু কি করব, আমি এইটাই পারি।

তবু, এমন আসামী আমি আর পাইনি। কারণ এই বৃদ্ধা ছদ্মবেশিনী নন। সেইজন্যে আমি আমার এই নতুন অঞ্চলটার দিকে অবাক আর বোবা হ'য়ে তাকিয়ে আছি। এ আবার কেমন দেশ?

যাকগে এসব কথা। প্রথম কেস্ ধরার কাহিনী শোনালাম তোমাকে। আরো শোনাব, একটা দারুণ প্রেমের গল্প, অবশ্যই সেটা এখনো সুরেশবাবুর ভাষ্য। কিন্তু সাক্ষাতে শোনাব।

জান তো, সরকারী চাকুরিতে ঝড় জল বলে কোন কথা নেই। ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে হবেই হবে। অতএব পত্রপাঠ জানাও, কবে রওনা হচ্ছ, স্টেশনে হুজুরে হাজির থাকব। অন্যথায় ভিতর দুয়ারের অফিস লণ্ডভণ্ড!

বড়দের প্রণাম, ছোটদের স্নেহ জানাই। সঙ্গে তোমাকেও। ইতি,

বলাই।

চিঠি দেবার পাঁচদিন পরেই মলিনার জবাব এল। বলাইয়ের বাবার চিঠিও এল একদিনেই। মলিনা আসছে তিন দিন পরেই, কলকাতায় আগত একটি পরিচিত পরিবারের সঙ্গে। বলাই যেন উপস্থিত থাকে স্টেশনে।

যথা দিনে ও যথাসময়ে মলিনাকে শিয়ালদা' থেকে নিয়ে এল বলাই। তারপর হাওড়া। হাওড়া থেকে হুগলীর ব্রাঞ্চ লাইন।

পথে জিজ্ঞেস করেছিল মলিনা, সে ভদ্রমহিলার কি হল?

বলাই জবাব দিয়েছিল, জামিন পেয়েছেন। কেস্ চলবে।

মলিনা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, স্যুটকেশটা কোর্টে প্রডিউস্ করতে চেয়েছ কেন?

বলাই দেখেছিল, যা ভেবেছিল তাই, মলিনার ঠোঁটের কোনে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। বলাই সবে বলতে যাচ্ছিল, যাতে—

মালিনা যেন মুখিয়ে ছিল। বলে উঠল, যাতে বিচারক অনুভব করেন, কী নিদারুণ অভাব ও দারিদ্র এ অঞ্চলের ভদ্র পরিবারগুলিকে ধ্বংস করছে, না?

—হ্যাঁ।

—আর সমাজের গভীর স্তরে পাপ আজ প্রবেশ করেছে, সেটাও বোঝা যাবে আসামীকে দেখে, কি বল?

—হ্যাঁ।

—আর বিচারক শুধু সাজার খাতায় সই ক'রে দেবেন।

ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠেছিল মলিনা।

বলাই বলেছিল, আসতে না আসতেই ঝগড়া শুরু ক'রে দিলে?

মলিনা বলেছিল, ঝগড়া আবার কোথায় করলাম? তোমার কথা শুনে হাসলাম।

—হাসবার কি আছে?

তোমার সদিচ্ছা দেখে।

বলাই চুপ করেছিল। মলিনা যে-নামে স্বামীকে আদর ক'রে ডাকে, সেই নামে ডেকে বলেছিল, রাগ করলে বলাইবাবু ?

রাগ করেনি, কিন্তু মন ভার হয়েছিল বৈকি। বলেছিল, না।

মলিনা বলেছিল, তোমাকে কিন্তু আমি কিছু বলি নি।

বলাই বলেছিল, জানি।

তারপর মলিনাও ঠিক বলাইয়ের মতই আবগারি বাড়িটার ভুতুড়ে গর্ভে এসে প্রথম অন্ধকারে ঢুকেছিল।

॥ তিন ॥

সাইকেলটা দাওয়ার সঙ্গে ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। আর অন্ধকার সজনে তলায়, সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ দপদপিয়ে উঠছে ঘন ঘন। নিরন্ধ্র অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। ঘন ঘন সিগারেটের আগুনে শুধু চকচকিয়ে উঠছে দুটি তীক্ষ্ণ চোখ। ব্যাকুল উৎকণ্ঠা সেই চোখে।

সারাদিনের অসহ্য গরমের পর বাতাস যেন পাগলা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে ছুটে আসছে দক্ষিণ থেকে। চৈত্রের ঝরা পাতারা এখনো ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। বাতাসে পাতা সড়সড়িয়ে উঠছে। কিংবা পাতার ওপরে হেঁটে ফিরে 'বেড়াচ্ছে ইঁদুর গিরগিটিরা। বাঁশঝাড়ের বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে চাপা মোটা স্বরের গোঙানি উঠছে। কোথায় একটা পাখী ডেকে চলেছে অক্লান্ত। টেনে টেনে ভয় পাওয়া স্বরে ডাকছে। হয়তো আশঙ্কা করছে, কিংবা চোখে পড়েছে, ধীর গতি ধূর্ত অব্যর্থ সাপটাকে। আরো দূরে, হয়তো 'খালপাড়ের ওদিকে কোথাও একটা মদ্দা পাখী গলা ফাটিয়ে ডেকে মরছে, বউ কথা কও! বউ কথা কও! এর মানে বোধ হয়, কোথায় আছিস্, সাড়া দে। একটা কাঁদছে মরার ভয়ে। আর একটা ডাকছে প্রেমের আশায়। দু'তিনটে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে কাছে ও দূরে। আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের সভা। চণ্ডীতলার মাঠে কৃষক সভার মত। যেন গোটা আকাশটার কোথাও এতটুকু জায়গা ফাঁক নেই।

একটা সিগারেট শেষ হল। আর একটি সিগারেট ধরাল চিরঞ্জীব। বার কয়েক পায়চারী করল উঠোনে। তারপর আবার সজনে তলায় গিয়ে দাঁড়াল চোখ তুলে।

পাড়ার মধ্যে কোথায় একটি ছেলে কাঁদছে। ভাঙা ভাঙা বুড়ি গলায় বক্‌বক্ করছে কেউ। একটা মালগাড়ি যাবার শব্দ শোনা গেল।

অন্ধকার থেকে একটি মোটা মেয়েলি গলা ভেসে এল, ছোট্ঠাকুর নিকি?

চিরঞ্জীব ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে। পরিষ্কার দেখতে পেল যমুনাকে। দুর্গার যমুনা মাসী।

চিরঞ্জীব এগিয়ে এসে বলল, হ্যাঁ। যমুনা মাসী?

—হুঁ।

—তোমাদের মেয়ে বেরিয়েছে কখন?

—অনেকক্ষণ। সেই সনজেবেলা লাগাদ্।

—গেল কোথায়?

—জানি না। দেখা হয় নাই। এয়েছিলুম আর একবার, দেখা পাই নাই। খাল-কেষ্টা, দলেরই লোক আমাদের, সে বললে, সে নিকি দেখেছে, ইষ্টিশানের দিকে যেতে।

বোধ হয় অনেক কেষ্টর এক কেষ্ট খাল পাড়ের বাসিন্দা তাই নাম হয়েছে খাল-কেষ্টা। যমুনা আবার বলল, আমারটা আমি পাচার করে এয়েছি ছোট্ঠাকুর।

চিরঞ্জীবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বলল, কোথায় গেছলে তুমি?

যমুনার গলা ক্রমেই আরো মোটা এবং গদগদ হয়ে উঠল। বলল, নিল্লায়।

মাইল তিনেক দূরের গ্রাম, নির্লা। আসলে হয়ত নিরালা। চল্‌তিতে দাঁড়িয়েছে নিল্লা। মহকুমা শহরের আরো কাছাকাছি জায়গা। শহরে যাবার চোরা রাস্তা আছে। নির্লাতে রোজই লোক আসে মদ নিয়ে যাবার জন্যে।

চিরঞ্জীব জিজ্ঞেস করল, কি ক'রে নিয়ে গেলে?

যমুনা হাতের ঝাপটা দিল এমনভাবে যেন ওসব কিছুই নয়। একটু জড়িয়ে জড়িয়ে হেসে বলল, অই যে গো, তোমার রপারের টিউক, তাইতে ভরে, সারা শরীলে আমার পেঁচিয়ে বেঁধে দে'ছেল দুগ্‌গা। নিষ্টেপিষ্টে দে'ছেল কারুর বাবার টের পাবার সাধ্যি ছেল

না। কয়লা কুড়োবার ঝুড়ি নিলুম সড়ক ধরে সোজা হেঁটে গেলুম রেল্ল লাইনে। লাইন ধরে ধরে নিল্লায়।

ব'লে আর একবার গুডিয়ে গুডিয়ে হাসল দুর্গার যমুনা মাসী। তার রপারের টিউক আসলে রবারের টিউব। সাইকেলের টিউব এসব কাজের মস্ত সহায়।

চিরঞ্জীব কিছু বলার আগেই যমুনা আবার বলল, তা ক্ষার বস্তু কিনা। আমার সারা গায়ের মধ্যে জ্বলছিল।

চিরঞ্জীব রুক্ষু গলায় জিজ্ঞেস করল, টিউবটা খুলেছিলে নাকি?

যমুনা ভয় পেয়ে বলল, ওমা! ছি! অমন বেইমানি করতে আছে? ধরা পড়ে যাবার ভয় নাই আমার?

চিরঞ্জীব বলল, তবে নেশা করলে কোত্থেকে, জল পেলে কোথায়?

মদ নয়, মাল নয়, জল। যমুনা আর এক চোট হেসে নিল। অন্ধকার সয়ে যাওয়ায় চোখে পরিষ্কার দেখা যায়, যমুনার প্রৌঢ়া চোখ দুটি হাসিতে যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বলল, অ! সেই কথা। মেয়ে আমাকে দয়া করেছে যে আজ। বললুম কিনা, 'সারাটা দিন আজ পেটে কিছু পড়ে নাই মা দুগ্‌গো, শরীলে বল নাই তেমন। টুকুসখানি ভাজা জল আমাকে দাও, গলায় দিয়ে নি। তোমার ঘড়ামি মেসো এখনো কাজ সেরে ফেরে নাই। তাই দেছেলো। তা' শরীল আর মন আমার বেশ বশে আছে ছোট্‌ঠাকুর। জিনিষ নে' আর এক পাক দে' আসতে পারি।

চিরঞ্জীব বলল, সে তো বুঝতেই পারছি।

—পারছ ছোট্‌ঠাকুর?

চিরঞ্জীব প্রায় ধমকে উঠল, খুব পারছি। দয়া করে আর ওরকম ভাজা জল খেয়ে জিনিষ নয়ে কোথাও যেও না। এই নাও।

বলে পকেট থেকে দুটি টাকা বের করে দিয়ে বলল, ঘরে গিয়ে রান্না বান্না করোগে এখন।

পরমুহূর্তেই আবার চিরঞ্জীব অন্ধকারে দু'চোখ তুলে তাকাল।

টাকা দুটি নিয়ে যমুনা খানিকক্ষণ হা করে রইল। তারপর বলল, এ কি আমার মজুরি দিলে ছোট্‌ঠাকুর ?

—হ্যাঁ।

—সে তো আমাকে পর্শুকে আগাম দে' রেখেছেল দুগ্‌গা।

একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল চিরঞ্জীব, এও না হয় আগাম দেয়া হল, এখন যাও। বারে বারে যেন নিও না।

যমুনা বলল, ছি, তাতে বেইমানি হবে না আমার।

কথা শেষ হবার আগেই চিরঞ্জীব সিগারেটের আগুন হাতের আড়াল করে, চাপা গলায় বলে উঠল, চুপ! চুপ কর মাসী। কে যেন আসছে।

তারা দুজনেই সজনে গাছটার কোলে আঁধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

হন্ হন্ ক'রে এসে ঢুকল একজন দুর্গার বাড়ির উঠোনে। একেবারে দাওয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চিরঞ্জীব এতক্ষণ চিনেছে মূর্তিটাকে। বলল, গুলি না ?

—হ্যাঁ।

গুলি এসে দাঁড়াল কাছে। চিরঞ্জীব জিজ্ঞেস করল, কি ? গোলমাল কিছু ?

গুলি হাঁপাচ্ছে। বলল, এখনো হয়নি।

—দুর্গা কোথায় ?

—সে-ই কথাই বলতে এলুম।

—বল্।

চিরঞ্জীবের দু' চোখ সত্যি যেন বাঘের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। শক্ত হয়ে উঠল তার শরীর।

গুলি বলল, দুগ্‌গাদি' ন্যাড়াকালীতলায় চলে গেছে।

চিরঞ্জীবের গলায় শংকিত বিস্ময়। সেটা চাপবার চেষ্টা করে বলল, ন্যাড়াকালীতলায় কেন ?

গুলি বলল, গজু আর সতীশ জিনিষ নে' যাচ্ছিল গরুর গাড়িতে করে।

—সে তো জানি। বিচুলির গাড়ি ছিল। কোন রাস্তা দিয়ে গেছে।

গুলি বলল, খালধারের রাস্তা দিয়ে। সে সবে কোন গণ্ডগোল নেই। কিন্তু ভোলা আর কেষ্ট, ওই দু'শালার কেমন যেন নজর পড়ে গেছে। পেছু নিয়েছে গাড়িটার। গজুর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল। গজু সতীশও তো খুব শক্ত নয়। খবরটা আমিই দিয়েছিলুম দুগ্‌গাদিদিকে। তা শুনেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিরঞ্জীব যেন আর এ গল্প শুনতে পারছিল না। অসহিষ্ণু হ'য়ে বলল, তারপর বল্। ন্যাড়াকালীতলায় গেল কেমন ক'রে?

গুলি বোধহয় ভয় পেল চিরঞ্জীবের গলা শুনে। বলল, দুগ্‌গাদি' অন্য পথ দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে, খাল পাড়ের সেই একেবারে সাহেব-বাগানের ধারে, আগে থেকেই পথে বসেছিল। আমি দূর থেকে দেখেছি। তারপরে, ভোলা কেষ্টর সঙ্গে দেখা হ'তে কি কথা হল দুগ্‌গাদি'র। ভোলা কেষ্ট গাড়ির পেছু ছেড়ে দিয়ে, দুগগাদিদির সঙ্গে চলে গেল।

—কোথায় গেল?

—ন্যাড়াকালীতলায় বসে কথা বলতে দেখে এয়েছি ভোলা কেষ্টর সঙ্গে।

—আর গাড়ি?

—গাড়ি চলে গেছে।

—হুঁ।

চিরঞ্জীব কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল চুপ ক'রে। কিছু যেন ভাবল। আবার জিজ্ঞেস করল, জটারা চন্দননগরে চলে গেছে?

—বেরিয়ে গেছে জানি।

—কলোনীর সেই মেয়েটাও সঙ্গে গেছে ওদের ?

—বীণা ? হ্যাঁ, ছিল।

চিরঞ্জীব এক হাতে সাইকেলটা টেনে নিল। পকেট থেকে বার ক'রে টর্চ লাইটটা হাতের চেটোয় চেপে একবার দেখে নিল বোতাম টিপে। জ্বলছে ঠিকই। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে যমুনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, মাসী, তুই দাঁড়িয়ে কেন ? চলে যা।

যমুনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, মেয়ের কি হবে ছোট্ ঠাকুর ?

—কি আবার হবে ? নতুন তো নয়। তারপরেও যদি কেউ অসাবধান হ'য়ে ধরা পড়ে, কারুর তো কিছু করবার নেই।

চিরঞ্জীবের গলায় একটু বিরক্তির ঝাঁজ। যদিও তার চোখে মুখে বিরক্তির সঙ্গে উৎকণ্ঠার গাঢ় ছাপই বেশী।

যমুনা বলল, তা' বাপের বেটি তো। শুনে চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

—না পারে তো মরবে, আমার কি ?

ব'লে সাইকেলে উঠতে উদ্যত হয়ে থামল চিরঞ্জীব। গুলিকে বলল, কাছে পিঠেই থাকিস্, আমি আসছি।

তারপর চেনা পথের অন্ধকারে, যেন বাতাসের আগে চলে গেল সে।

ন্যাড়াকালীতলা মহকুমা সহরে যাবার বড় রাস্তার ধারেই। যে-বড় রাস্তাটি গিয়ে, জি, টি, রোডে প'ড়েছে। বাঁ দিকে গেলে চন্দন-নগর। পূর্বদক্ষিণে বাঁকে ফেরা রাস্তাটা গেছে মহকুমা শহরে।

রাস্তাটা সাধারণত নির্জনই। দিনেরবেলা লোক চলাচল থাকে। রাত্রে নিঝুম হ'য়ে আসে। মাঝে মধ্যে এক আধখানা মোটর গাড়ি হেড্‌ লাইটের চোখ ঝলসে চলে যায়।

গরুরগাড়ির চাকার কঁকানি গোঙানিও শোনা যায় প্রায় সারা রাত্রিই। লোক চলাচলও যে একেবারেই নেই, তা নয়। তবে খুব কম। রাস্তাটার দু' পাশেই গ্রাম আছে। গ্রামের ফাঁকে ফাঁকে

অবশ্য বাগান আর জঙ্গলের বিরতিই বেশী! তবু, রাত্তিরেতে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে লোকের একটু আধটু যাতায়াত আছে বৈ কি। প্রথম রাতেই অবশ্য। পাড়াগাঁয়ের প্রথম রাত যাকে বলা যায়।

এ রাস্তাটার ধারেই, একটি অন্ধকার আমবাগানের পাশ ঘেঁষে ন্যাড়াকালীতলার থান। কোনো মন্দির নেই, বিগ্রহ নেই। আছে গোটাকয়েক মান্ধাতা আমলের বট অশত্থ। ঝাড়ালো বেঁটে আর অজস্র ঝুরিতে গাছগুলি শতাব্দীকাল ধরে বংশ বাড়িয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে কাঠা কাঠা জমি নিয়ে। রাত দূরের কথা, দিনের বেলাতেও এখানে ছায়া ছায়া অন্ধকার ঘুচতে চায় না। বাতাস এখানে অষ্টপ্রহর অনেক অশরীরিদের ফিস্‌ফিস্ কানাকানি চুপি চুপি কথার মত শব্দ করে। যে ঝুরিগুলি মাথার ওপরে ছাদ সৃষ্টি ক'রে, দৈত্যের কঙ্কালের মত থাম্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাস সেখানে বাঁধা পড়া পশুর মত মরণের ডাক ছাড়ে। লোকের ভয় আছে, ভয় নেই শুধু কাছের ডোমপাড়াটার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের! ওরা সারাদিন ঝুরি স্তম্ভগুলির আড়ালে আবডালে লুকোচুরি খেলে। দিনের বেলা হঠাৎ বৃষ্টিবাদলায়, পথিকেরা আশ্রয় নেয় ঝুরির তলায়। ডোমপাড়ায় স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হ'লে, যে কোনো এক পক্ষ এসে আশ্রয় নেয় রাতের মত। তবে সে খুবই কম।

কালীতলায় কালীর দেখা নেই। একটি বটের গোড়া বাঁধানো। তার ওপরে রাশি রাশি পোড়া মাটির ছাঁচের ঘোড়া রয়েছে প'ড়ে। লোকে দিয়ে গেছে মানসিক ক'রে। একপাশে এক ষষ্ঠি মূর্তি, আর এক পাশে শীতলার। দুই-ই মাটির। পূজো ক'রে, যাদের জলে বিসর্জ্জন দিতে নেই, তাদের শেষ আশ্রয় এই গাছের গোড়ায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে দেখা যাবে এই সব মূর্তি জলে ধুয়ে গেছে। প'ড়ে আছে শুধু খান কয়েক ব্যাকারি কঞ্চি। খড়গুলি ন্যাড়াকালীতলার স্থায়ী বাসিন্দা পাখীদের ঠোঁটে ঠোঁটেই উঠে যায়।

বাঁধানো জায়গাটিতে সন্ধে দেবার স্থায়ী খুপরি আছে, ডোমপাড়ার

মেয়ে বউরা রোজই সেই খুপরির মধ্যে বাতি জ্বেলে রেখে যায়। যতক্ষণ তেল থাকে ততক্ষণ জ্বলে। চারদিকের ঘুটঘুটি অন্ধকারে ওই আলোটুকুই যেন গোটা ন্যাড়াকালীতলায় অস্পষ্ট আলো আঁধারির মায়া সৃষ্টি করে।

আজো সেই আলো রয়েছে। ছোট খুপরির মধ্যে টিম্‌টিমে সেই আলো, ডোমপাড়ার অতি কষ্টের ছিটে ফোঁটা তেলের আয়ু নিয়ে বাতাসে মরো মরো করছে। সেই আলোয় দুর্গার পুষ্ট শরীরের মায়াবিনী অবয়র রেখা কাঁপছে। সে হাসছে খিল্‌খিল্‌ ক'রে। যেন ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। হাসির দমকে পড়ছে ঢলে ঢলে। কাপড়ের খয়েরী ডোরা অস্পষ্ট। চুলে নেই বাঁধন, এলো খোঁপা খসা ঘাড়ের কাছে। পান খেয়েছে সে, রক্ত রঞ্জিত ঠোঁটে, নিশিন্দা-পাতা আয়ত কালো চোখের ধাঁধাঁয়, ন্যাড়াকালীতলায় যেন সে একটি সর্বনাশের খেলায় মেতেছে।

কয়েক হাত দূরেই অস্পষ্ট ছায়া নিয়ে বসে আছে ভোলা আর কেষ্ট। বলীর ছাগ নয়, মন্ত্রমুগ্ধ বিহ্বল দুটি মানুষ যেন সারা জীবনের আরাধ্য দেবীর দেখা পেয়ে বাক্যহারা। নিমেষহারা দু' জোড়া রক্তাক্ত চোখ। ফাটা ফাটা কালো ঠোঁটগুলি হা হ'য়ে রয়েছে। কালো কালো দুটি খোলা শরীর অবশ, পাথরের মত স্তব্ধ।

তাদের কিছু বলার নেই। সন্ধ্যার ঝোঁকে তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়েছিল। খালপাড়ে এসে হয় তো শুয়ে থাকত, কিংবা বসে থাকত। মন চাইলে খালধার ধরে চলে যেত হয় তো শ্মশানে। অথবা শুধু ঘুরতেই থাকত গোটা গ্রামটা। পাক খেতে খেতে চক্রটাকে ছোট ক'রে নিয়ে আসত বাগ্‌দিপাড়ার সীমনায় এসে। আরো ছোট ক'রে নিয়ে আসত বাঁকাবাগ্‌দির বাড়িটাকে ঘিরে।

কিন্তু হঠাৎ তাদের নজরে প'ড়ে গিয়েছিল গজেনের বিচুলীর গাড়িটা। গজেন, অর্থাৎ গজু হেঁটে হেঁটে গাড়ি চালাচ্ছে। সতীশ বসে আছে গাদার মাথায়। এমনিতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

গজেন সতীশ মোটামুটি চেনাশোনা লোক। বড়লোক জোতদারের স্থায়ী কৃষি-চাকর।

কিন্তু একটু ঘুরে গেলে যারা, শহরে যাবার পীচের রাস্তা পেত, তারা কেন খালধারের কাঁচা রাস্তা ধরেছে? তাও আবার সন্ধ্যা-বেলা। যেতে চায় কোথায়? শহরে? বেশ, কিন্তু এখন রওনা হ'য়ে তো রাত বারোটায় শহরে পৌঁছুবে। রাত বারোটায় পৌঁছে লাভ কি? এসব কাজ তো ভোলা কেষ্টও করেছে কোনো এক কালে। অজানা কিছুই নেই।

খালধার দিয়েও অনেকে যায়, রাস্তাটা 'শট্‌কাট্‌।' কিন্তু রাত বারোটায় শহরে পৌঁছুবার জন্য কেউ বিচুলীর গাড়ি বার করে না। বরং রাত বারোটায় বেরিয়ে ভোর ভোর শহরে পৌঁছুবার চেষ্টা করে সবাই। সারাদিন ঘুরে বিচুলী বেচে ফিরে আসে। নয় তো দুপুরের মুখে বেরিয়ে, সন্ধ্যায় শহরে পৌঁছে, রাতে কোনো কাজকর্ম থাকলে সেরে নেয়। অনেক কাজকর্মই থাকে। মামলা মোকদ্দমা থাকলে উকীল মশায়ের বাড়ী যেতে হয়। মামলা মোকদ্দমার তদ্বির তদারক থাকে। হিসেব নিকেশ থাকে শহরের মহাজনের কাছে। কেনা-কাটাও থাকতে পারে।

কিন্তু এমন অসময়ে কেন? একমাত্র গজেন সতীশ বলেই সন্দেহটা পাকাপাকি গেঁথে যায় নি মনে। কারণ গজেন সতীশ এ 'নাইনের' লোক বলে তারা জানে না। কিন্তু এ সন্দেহ শাওনের মেঘ। একবার যখন ঘনিয়ে এসেছে, সে না বোর্ষে ছাড়বে না। তাই, গাড়িটা দেখা-মাত্র-ই তাদের মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। প্রথম ভোলা এগিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথা চললে হে গজু?

গজু খুব নির্বিকার ভাবেই আগে গরুটাকে মুখতাড়া দিয়েছিল, ছাখ্‌ ছাখ শালা জোড়া বলদের কীর্তি। শালাদের লজর থানে যায় না, অস্থানে যায়। সোজা চল্‌।

কেষ্ট বলেছিল, বলদের আর দোষ কি বল। ঢাল দেখলে গড়িয়ে যেতে চায়।

কথার মধ্যে উভয় পক্ষের যেন কিছু অর্থপূর্ণ বাক্য বিনিময় হয়েছিল।

গজু তেমনি নির্বিকার ভাবে কথার জের টেনে জবাব দিয়েছিল, শহরে যাব।

ভোলা বলেছিল, তা' এই সনজেবেলায় কেন গো? মাঝ রাতে গে' পৌঁছুবে যে?

—তা' পৌঁছুব। কি করব বল। ভোর পাঁচটায় খদ্দেরের বাড়ি মাল দিতে হবে, মনিবের হুকুম। যন্ত্রন্না কি কম? রাতের ঘুমের তো তেইশটি মারা হয়ে গেল।

জবাবটা গজু ভালই দিয়েছিল। বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ। কিন্তু তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলে কই? অমন লাগসই জবাবটাও সন্দেহ ঘোচাতে পারে নি। কেষ্ট ভোলা আবার চোখাচোখি করেছিল। ওদের ভাবলেশহীন রক্তাভ চোখের চাউনি দেখলে লোকে কিছু ঠাহর করতে পারে না। কিন্তু ওদের পরস্পরের অ-ভাবের মধ্যে ভাবের খেলা নিজেরা ঠিক বুঝতে পারে। ওদের চোখ ওদের বলে দিয়েছিল, না, এ গাড়ির পিছন ছাড়া যায় না। শাওনের মেঘ একবার যখন ঘনিয়েছে—।

ভোলা আবার 'বলেছিল, পাকা সড়ক দে' না গে' এ পথে যাচ্ছ যে?

দায় বড় ভারী। ভিতরে ভিতরে দুর্বলতা না থাকলে গজু কৈফিয়ৎ না দেবার জেদ্ করতে পারত। কিন্তু তাকে বলতে হল, রাস্তাটা 'শট্‌কাট্' তাই।

আজকাল গাঁয়ের সব লোকেই 'শট্‌কাট্' বলে। ভোলা কেষ্টও এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিল গজুর মুখ থেকে।

কেষ্ট তৎক্ষণাৎ বলেছিল, হাজার শট্‌কাট্ হ'লেও, রাত ক'রে কেউ

এ পথে যায়? ব'লে, হেঁটে যেতেই ভরসা হয় না। শীসসি কাল, কিসের থেকে কি হয়, বলা যায়? রাস্তাও সরু, তার ওপরে গাড়ি। এটা তোমার ঠিক হয় নাই হে গজু।

এসব হচ্ছে লোক চটাবার কথা। চটাতেই চাইছিল ভোলা কেষ্ট। তাতেই ওদের সুবিধা। কিন্তু চটবার অধিকার নেই গজেন সতীশের। এবারে সতীশ জবাব না দিয়ে পারে নি, বাপ্পু ইসরে, তোমাদের যে বড় দুশ্চিন্তা দেখি? তোমাদের কি শহরে যাবার মতলব আছে?

—থাকলে?

—উঠে এস না কেন গাড়িতে। গাড়িতে যাবার জন্যেই তো এত কথা, না—কি?

চালটা মন্দ চালে নি সতীশ। আর একবার চোখাচোখি করতে হয়েছিল ভোলা কেষ্টকে। কিন্তু শাওনের মেঘ একবার যখন ঘনিয়েছে—।

তবে সে ঢালবেই এমন কথা নেই। উথালি পাথালি পুবে ঝড় অনেক সময় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। ভোলা কেষ্ট তো জানত না, এতক্ষণ ধরে সেই বাতাসের আয়োজন চলছিল। তারা দেখেছিল, সাহেববাগানের ধারে, গাছতলায় দুর্গা।

সে বসে থাকা, বসে থাকা নয়। ঝড়ের চেয়েও ভয়ংকর। লোক দেখে দুর্গা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাঁ হাতে তার কোঁচড় ধরা। ডান হাত কোঁচড়ের মধ্যে। চোখের নজর বাগানের দিকে।

গজু জিজ্ঞেস করেছিল, দুগ্‌গা না? এখেনে কি হচ্ছে?

ন্যাকামিটা গজু ভালই করেছিল দুর্গা আর একবার বাগানের দিকে উঁকি মেরে বলেছিল, ছাখ না। সেই কখন বেরিয়েছি একটু ন্যাড়াকালীতলায় যাব ব'লে। এখেনে এসে আটকে পড়েচি।

—কেন?

—আর কেন? মরণ ধরেছে এ্যাট্টা মিন্সের। চিনি টিনি না, অনেকক্ষণ থেকে পেছু লেগেছে। তোমরা আসছ সাড়া পেয়ে, বাগানে গে' ঢুকেছে। এখন না পারি ঘরে ফিরতে, না পারি কালী-তলায় যেতে। কেন যে মরতে এ পথে এলুম।

ভোলা কেষ্ট তখন নিজেদের চোখে চোখে তাকাতেও ভুলে গিয়েছিল। শাওনের মেঘ গিয়েছিল উড়ে। বুঝি দুর্গারই ইশারায় গজেনের গাড়ি গিয়েছিল এগিয়ে। কিন্তু ভোলা কেষ্টর শক্ত পা চারটে বাঁধা প'ড়ে গিয়েছিল কোন্ মায়াপাশে।

পশ্চিমের রক্তাভ আকাশ তখন পুরোপুরি ছায়ার আলিঙ্গনে। সন্ধ্যা তারাটা উঠেছে অনেকক্ষণ। আরো কয়েকটি নক্ষত্র ফুটে উঠেছে এদিকে ওদিকে। যেন খালের ধারে এই খেলাটা দেখবার জন্য। আকাশের সভায় সব জায়গা নিয়ে বসেছে আগে থেকেই। ঝিঁঝিঁরা ডাক দিয়েছিল আগেই। খালপাড়ের কোন্ গাছে বসে একটা একলা পাখী তখনো শিস্ দিয়ে দিয়ে ডাকছিল।

দুর্গা ফিক্ করে হেসে উঠেছিল। সেই শব্দে স্থির হ'য়ে গিয়েছিল গোটা খালপাড়টা। ভোলা কেষ্ট চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

দুর্গা বলেছিল, কি গো, তোমরাও কি আমার পেছু লেগেছ নিকি?

ভোলা বলেছিল, তা' লাগতে পারি।

কেষ্ট বলেছিল, যাদের যা কাজ।

দুর্গা হেসে উঠেছিল। বলেছিল, তা' বেশ করেছ। মস্ত মরদ সব তোমরা, এখন পেছু লেগে আমাকে ইট্টুস্ সাহেববাগানটা পার কর দি'নি।

ভোলা কেষ্ট তাকিয়ে দেখেছিল, গজুর বিচুলীর গাড়ি হট্টর হট্টর ক'রে পুবে চলে যাচ্ছে। এইবার আর একবার চোখাচোখি করেছিল ভোলা আর কেষ্ট। আর সেই মুহূর্তেই নিজেদের বুকের ভিতর থেকেই শুনতে পেয়েছিল ওরা, গাড়ি যাক, দুর্গা থাক। গাড়ি

অনেক ধরা যাবে, তুর্গাকে ধরা যাবে একবারই। দেখি, তুর্গা কোথায় নিয়ে যায়।

দেখি নয়, দেখতে হবে। ভাগ্যের লিখন খণ্ডানো যায়! রক্তের পাকেপাকে যে লিখন আছে তাকে খণ্ডানো সবচেয়ে তুরূহ এই সংসারে।

তুর্গা ততক্ষণে মোড় নিয়েছে সাহেববাগানে। ভোলা কেষ্ট পা' বাড়িয়েছিল তাদের চিরশত্রুর পিছনে পিছনে।

ভোলা জিজ্ঞেস করেছিল, কোঁচড়ে কি?

তুর্গার পা'য়ে যেন চল চল নাচের তাল। বলেছিল, মা'য়ের বাহন, দেব কালীতলায়। মানসিক আছে।

কেষ্ট—এমন অসময়ে যে?

—অসময় কোথা? বেরিয়েছি সেই কখন। সারাদিন উপোস ক'রে, বিকেলে নেয়ে, তা'পর বেরিয়েছি। ভাবলুম কি না পুজো দে' ফিরে এসে খাব। তা, কী আপদ লেগেছে, ছাখ না। মিনসেটা এ বাগানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

কত ভয় তুর্গার। এত যদি ভয়, তবে চোখে মুখে অমন অন্ধকারের ছুরির মত হাসি চমকাচ্ছে কেন? আন্ মিনসের এত ভয় এই রাতের ঘোর লাগা নির্জন সাহেববাগানে। ভোলা কেষ্টর কাছে কেমন ক'রে ভরসা পেল তুর্গা?

কোনো ভরসা নেই। সাহেববাগানের এদিকে পুকুর, ওদিকে পুকুর। বিঘার পর বিঘা জমিতে আম বাগান। অযত্নে বেড়েছে কালকাসুন্দে আর আসসেওড়ার বন। নোনার ঝাড় আর ধুতুরার ঝোপ। প্রায় মানুষের বুক সমান! কোনো এক কালে এক সাহেব তার বাগান বাড়ি করেছিল। এখন সাহেব নেই, বাংলোটা আছে। তারও জানালা দরজা চুরি হ'য়ে গেছে অনেকদিন। মাথার টালিগুলিও নেই। টালির ফ্রেমের কাঠও গেছে। বেড়া ভেঙ্গেছে বহুকাল। খালধার থেকে যারা পীচের রাস্তায় আসতে চায়, তারা এই আধমাইল বাগান পার হয়। পীচের রাস্তায় প'ড়ে, খানিকটা ঘুরে গেলেই ফ্যাড়াকালীতলা।

এই নির্জন ভুতুড়ে বাগানে, প্রথম রাত্রির ঘোরে, কোনো ভরসা নেই দুর্গার ভোলা কেষ্টর কাছে। তবু দুর্গা নিজের ভয়ের সঙ্গে রাস্তা ধরে এসেছে। দুর্গা ব'লেই এমন দুঃসাহসিক কাজ সম্ভব হয়েছে। এই জন্যেই বোধ হয় লোকে তাকে নাম দিয়েছে বাঘিনী। ভোলা কেষ্ট যে ক্রমেই তার গায়ের কাছে ঘেঁসে আসছিল, তাও টের পাচ্ছিল দুর্গা। বুকের মধ্যে কাঁপছিল তার। বোধ হয় সেই কাঁপুনিকেই হাসির ঢুলুনিতে রঙিয়ে তুলছিল সে! ভরসা মাত্র একটি-ই। একটা লড়ায়ে, ভোলা কেষ্টর কাছ থেকে পাঞ্জা জিতে নিয়েছিল দুর্গা আগেই। ওদের সাহসকে তার চেনা ছিল।

কথাটা মিথ্যে নয়। যে-বাগানে গা-ঘেঁষা পাখীরাও বাস করে না, সেই বাগানের নির্জনে দুর্গার হাসি শুনে ভোলা কেষ্টর বুকের মধ্যেও বুঝি কাঁপছিল। ওরা যেন কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানে এক বিচিত্র মেয়ের পিছু পিছু চলছিল। বোধ হয় অস্বস্তিতেই জিজ্ঞেস করেছিল ভোলা, এত হাসি কিসের?

দুর্গা আরো হাসতে হাসতে বলেছিল, হাসব না? যত ভাবছি, তত হাসি পাচ্ছে।

ভোলা কেষ্ট চোখাচোখি করেছিল। দুর্গার যতটা কাছে যেতে প্রাণ চাইছিল ওদের, তত কাছে যেতে পারছিল না। তবু এক চুম্বকের টানে যেন, দুর্গার গায়ের বাতাসের আওতায় চলতে চাইছিল।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল, কি ভাবছ, আমাদের এট্টু শোনাও।

দুর্গা একবার তাকিয়েছিল তার আয়ত চোখ তুলে। কেমন যেন নেশা ধরা গলা মনে হচ্ছিল ভোলা কেষ্টর। এই নির্জনে একবার যদি নেশায় ওরা পাগল হয়, তবে, কে বাঁচাবে দুর্গাকে।

দুর্গা জবাব দিয়েছিল, এই আমার কালীতলায় যাবার ব্যাপারখানা ভাবছি, আর আমার হাসি পাচ্ছে। তোমরা কোথায় ভাবছিলে, দুর্গাকে বামাল ধরতে হবে। তা' নয়, মুশকিল আসান করতে হচ্ছে

বলতে বলতে দুর্গা হেসেছিল আবার।

কিন্তু ভোলা কেষ্টর মনের অন্ধিসন্ধি, সব কি জানে দুর্গা।

ভোলা বলেছিল, তা' মুশকিলে যখন পড়েছ—

মুখের কথা কেড়ে বলেছিল কেষ্ট, আসান তো করতেই হয়, না কিরে ভোলা?

ভোলা বলেছিল, বটে। যখন যেমন, তখন তেমন—

হ্যাঁ। তুমি যদি এখন মাল পাচার করতে তা' ব'লে কি ছেড়ে—

—সেটা আমাদের সরকারি ডিউটি। তা' কখনো হয়?

ওরা যে নিজেদের কথা নিজেরা কেড়ে নিয়ে বলছিল, তাতে ওদের রাগ হচ্ছিল না। ওরা একটা ঝোঁকের মাথায় কথা বলছিল।

কিন্তু ভোলাই প্রথম টিপে টিপে বলেছিল, তবে এই আঁধারে, বনে বাঁদাড়ে আমাদের ওপর ভরসা করে এলে—

কেষ্ট—হ্যাঁ, সেটা ইট্টু বেশী সাহস হ'য়ে গেছে।

দুর্গা হেসেছিল খিল্‌খিল্ ক'রে। বলেছিল, তোমরা তো চেনা লোক।

ভোলা—তা' বটে।

কেষ্ট—চেরকালের চেনাশোনা, কিন্তুক্—

ভোলা—আমাদের কপাল মন্দ।

কেষ্ট—হ্যাঁ, সে কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম।

ভোলা কেষ্ট তখন দুর্গার গায়ের কাছে। দুর্গার আঁচল বাতাসে উড়ে ওদের গায়ে পড়ছিল। নাকের পাটা ফুলছিল দুর্গার। চোখের কোণে কোণে ধিকি ধিকি আগুন দেখা যাচ্ছিল। আর শিরায় শিরায় যেন একটি রুদ্ধ বেগ থমকে ছিল।

ভোলা কেষ্টও যেন কেমন মিইয়ে গিয়েছিল দুর্গাকে না হাসতে দেখে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে-অবস্থায় থাকতে হয় নি। অন্ধকার তখন চেপে বসলেও, রাস্তাটা দুর্গা দেখতে পেয়েছিল। দেখছিল, একটি গরুর গাড়ি যাচ্ছে, বুকের তলায় হ্যারিকেন ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে। হ্যারিকেনের আলোয় রাস্তা জুড়ে ছায়া পড়েছিল গাড়ির চাকার, আর বলদের পায়ের।

কিন্তু ভোলা কেষ্টকে ভ্রষ্ট করা গেছে, ওদের মতলব নষ্ট করা হয় নি। রাস্তায় প'ড়ে বলেছিল, পূজো দে'। ফেরাও মুশ্‌কিল। রাত হ'য়ে যাবে অনেক। আমাকে একটি কাজ ক'রে দেবে তোমরা ?

ভোলা বলেছিল, বল।

কাছেই একটি দোকান ছিল। দোকানের বাতি দেখিয়ে বলেছিল, ওখেন থেকে দু' পয়সার বাতাসা এনে দেবে ? কালীতলায় দেব।

কেষ্ট তাড়াতাড়ি ছুটেছিল দোকানের দিকে। দুর্গা চেঁচিয়ে বলেছিল, পয়সা নে যাও।

—ফিরে এসে নেব। কাছে আছে।

বাতাসা আর পুতুল কালীতলায় দিয়ে, প্রণাম ক'রে বাঁধানো কালীতলায় বসেছিল দুর্গা।

ভোলা বলেছিল, বলছিলে যে সারাদিনের উপোস রয়েছে।

দুর্গা তার সারা মায়াবিনী শরীর মোচড় দিয়ে, হাই তুলে বলেছিল, এখন আর হাঁটতে পারছিনে। বড় তেষ্টা লাগছে।

ভোলাই ছুটেছিল জল আনতে। কোত্থেকে যেন ঘটি সংগ্রহ ক'রে জল এনেছিল। সঙ্গে কিছু চিঁড়ে মুড়ি মুড়কি। খান কয়েক রসমণ্ডিও ছিল।

দুর্গা বলেছিল, ও মা! উকি, না না, এসব কেন ?

ভোলা বলেছিল, খাও। পুণ্যি করতে এয়েছ। মাল পাচারে তো বেরোও নাই। সারা দিনের উপোস। শুনলে—

—খাওয়াতে হয়।

কেষ্ট বলেছিল। দুর্গা হেসেছিল খিলখিল ক'রে। সেই হাসিতে ন্যাড়াকালীতলার অশরীরি মায়া তার মোহ বিস্তার ক'রে দিয়েছিল। দুর্গা বলেছিল, দাও।

দুর্গা খেতে খেতে কেবলি হাসছিল। সে হাসি শুনে বুঝি

ডোমপাড়ার মানুষরাও গা ছমছমানি নিয়ে তাকিয়েছিল কালীতলার দিকে। প্যাঁচা ডাকছিল চ্যাঁ চ্যাঁ....।

খাওয়ার পরে, দু' খিলি পান এগিয়ে দিয়েছিল ভোলা। চির-শত্রুর সঙ্গে আজ ভোলা কেষ্টর অতিথি সম্পর্ক। অতিথি সৎকারে কোনো ত্রুটি রাখেনি তারা।

সেই পান খেয়ে, ঠোঁট দুটি রক্তাক্ত ক'রে, জমিয়ে বসেছিল দুর্গা। সেই থেকে বসেই আছে। অর্থহীন বিহ্বল প্রলাপের মত কী দু' একটা কথা বলছে ভোলা কেষ্ট। দুর্গা শুধু হাসছে। তবু খুপরির ওই মরো মরো শিখা বাতিটার মতই হাসিটুকু ক্ষয়ে আসছে তার। ওঠবার তার উপায় নেই। কে জানে, গজেন সতীশ বুদ্ধি ক'রে রাস্তা বদলাল কি না।

দুর্গা হঠাৎ বলল, আজ রাতের কাজ তোদের মাটি হল।

ভোলা কেষ্টর আসল আসামী পাশে ব'সে। কাজ মাটি হবে কেন। তবু ভোলা বলল, তা' রোজ রোজ কি আর কাজ হয়। আজ না হয় তোমার কাছেই বসে কাটল।

কেষ্ট বলল, হ্যাঁ, একদিন তো!

যেন রোজ রোজ হ'লে আর ওরা কাজ করত না। চিরদিন ধরে ওরা এমনি বসে থাকতে চায়। কথা শুনে দুর্গা হেসে উঠল। লেন আসলে আমাকে চোখে চোখে রেখেছ বল?

ভোলা—রাখতে চাইলেই কি রাখা যায়।

কেষ্ট—আছ, তাই রেখেছি!

ভোলা—কিন্তুক্ এট্টা কথা—

কেষ্ট—হ্যাঁ, আমিও বলছিলুম—

ভোলা—একদিন তোমাকে ধরা পড়তে হবে।

কেষ্ট—সেদিনে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

দুর্গা হেসে, নিজের হাঁটুর উপর নুয়ে পড়ল। বলল, সত্যি? তা' আগে থেকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ যে বড়?

ভোলা কেষ্ট চোখাচোখি করল। কথাটা না বলতে চেয়েও বলেছে তারা। ভোলা বলল, না, এমনি বললুম আর কি।

তারপরে আর কোনো কথা নেই। দুর্গা যেন বাঁধানো গাছতলায় সদ্য আবির্ভূতা দেবী মূর্তি। হ্যাড়াকালীতলার চিররহস্যময় অন্ধকারে মরো মরো প্রদীপের আলোয়, যার চারপাশে ঘিরে রয়েচে ভয় ও মোহ।

আর ভোলা কেষ্ট দেখছে সেই দেবী মূর্তি, তাদের হাতের নাগালের মধ্যে। কিন্তু হাত তাদের অবশ। সমস্ত দেহ অবশ। তারা যেন ভারবাহী ক্লান্ত পশু। কিন্তু চোখ ভরে নেশার আমেজ।

এমন সময়ে একটি শব্দ শুনে তারা তিনজনেই ফিরে তাকাল। দেখল বাঁধানো চত্বরের পাশে এক দীর্ঘ মূর্তি। সঙ্গে সাইকেল। পরমুহূর্তেই টর্চের তীব্র আলো চকিতে একবার দুর্গাকে ছুঁয়ে, ভোলা কেষ্টর ওপর গিয়ে পড়ল।

আলো সহ্য করতে না পেরে ভোলা আর কেষ্ট চোখে হাত চাপা দিল। ভোলা অসন্তুষ্ট স্বরে ব'লে উঠল, উ আবার কি রকম ঢং। চোখ থেকে বাতি সরাও।

চিরঞ্জীব টর্চ নিভিয়ে বলল, একটু দেখে নিচ্ছি, কে কে বসে আছিস্।

কেষ্ট বলল, সে খবর না লিয়ে কি আর এয়েছ?

চিরঞ্জীব ফিরে তাকাল দুর্গার দিকে। দুর্গার আয়ত চোখের বাঁকা চাউনি সহজ হ'য়ে এল। যেন ঘুমে জড়িয়ে এল তার চোখ। ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে, সে আর একবার হেসে উঠল কালীতলা শিউরিয়ে।

চিরঞ্জীবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বাঁধানো চত্বরের ওপর বসে সে ভোলা কেষ্টকে জিজ্ঞেস করল, পূজো দিতে এয়েছিস নাকি তোরা?

জবাব দিল কেষ্ট, না, একটা মামদো ভূতে নিকি পেছু নে'ছেল দুগ্‌গার সেটাকে দেখতে এয়েছিলুম।

চিরঞ্জীব আবার তাকাল দুর্গার দিকে। দুর্গা হেসে উঠল খিলখিল ক'রে।

ভোলা বলল চেপে চেপে, তবে সে ভূত বোধ হয় এতক্ষণে পগার পার হ'য়ে গেছে।

ব'লে সে গোঙা স্বরে হাসল। তাকাল দুর্গার দিকে।

চিরঞ্জীব হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। দুর্গার দিকে তাকিয়ে বলল, বাড়ি যাবি এখন?

তার গলায় চাপা বিরক্তি। দুর্গা বলল, ইট্টু বসে যাও না।

—না, আমার বসবার সময় নেই। যাবি তো ওঠ্।

ব'লে সে সাইকেল নিয়ে তৈরী হ'ল। দুর্গা আর একবার হাই তুলে, সারা শরীরের একটি হিল্লোল তুলে উঠে দাঁড়াল। ভোলা কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, চলি গো তা'লে। অনেক উব্‌গার করেছ তোমরা।

ভোলা বলল, এস গে' ভালয় ভালয়।

কেষ্ট বলল, মানসিক ক'রে গেলে। ফল ফললে আমাদের বারেক মনে ক'র।

ভোলা আবার বলল, তোমার হাতে বানানো রস খাইও এট্টু।

দুর্গা হেসে বলল, রস? আচ্ছা খাওয়াব।

ব'লে সে অবলীলাক্রমে চিরঞ্জীবের হাতে ধরা সাইকেলের ডাণ্ডার ওপরে কাঠের সীটে লাফ দিয়ে উঠে বসল। পরমুহূর্তেই চিরঞ্জীব সাইকেলে উঠে, দুর্গাকে নিয়ে অদৃশ্য হল অন্ধকারে।

ভোলা কেষ্ট দেখল, টর্চের আলো একবার জ্বলে উঠল বড় রাস্তার ওপরে। টিং টিং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠল দু'বার। তারপর থেকে থেকে যন্ত্রণা কাতর গোঙানির মত, একটি চলন্ত গরুর গাড়ির চাকা ককাতে লাগল।

খানিকক্ষণ ওরা দু'জনেই তেমনি বসে রইল। খুপরির আলোটা জ্বলছিল তখনো। তবু যেন সামান্য আলোটুকুও দুর্গা তার আঁচলের

ঝাপ্‌টায় নিয়ে চলে গেছে। গাঢ় অন্ধকার দলা দলা হ'য়ে উঠেছে।

ভোলা প্রথম বলল, গজুর বিচালীর গাড়িটা এতক্ষণে বেশী দূরে যেতে পারে নাই।

কেষ্ট বলল, এতক্ষণে নিচ্চয় রাস্তা বদলে ফেলেছে।

ভোলা—বদলালেই বা যাবে কোথা? গায়েব হ'য়ে তো যাবে না।

কেষ্ট—না। বেরুলেই ধরা যায়।

ভোলা—এখুনি!

কেষ্ট—বিচালীর গাড়িতে যখন যাচ্ছে, মাল তা'লে অনেক আছে।

ভোলা—তা' আছে। ধরলে, রোজগার মন্দ হবে না।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপরে হঠাৎ ভোলা বলল, কিন্তুক্ আজ ধরব না, কি বলিস কেষ্টা?

কেষ্ট অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, আজ আর কাউকে ধরব না। মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে।

ভোলা—বিগড়ে গেছে সব।

দুজনেই ক্লান্তভাবে এলিয়ে বসল। আর গোটা জীবনের ব্যর্থতাটা তাদের দুজনেরই হঠাৎ এখন মনে পড়ল।

ভোলা বলল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল, সোম্‌সারে দুটো বস্তু দরকার, বুইলি কেষ্টা। এট্টা মাটি, আর এট্টা বউ।

কেষ্ট যেন অবাক হ'য়ে বলল, অ্যাঁ?

ভোলা আবার বলল, দুটো জিনিষ। এট্টা মাটি, আর এট্টা বউ।

কেষ্ট যেন ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলল, এট্টা না থাকলে আর এট্টা পাওয়া যায় না।

ভোলা—হ্যাঁ। মাটি না থাকলে বউ হয় না। এসে পা' দেবে কোথায়?

কেষ্ট—সে জন্য আমার বউটা রইল না। মাটি ছেল না, দাঁড়াতে পারল না।

ভোলা—হুঁ।……আমাকে বাঁকা খুড়ো একবার ব'লেছেল, 'ভোলা তোর সঙ্গে আমার দুগ্‌গার বে' দিতে পারি, কিন্তুক্ আমার সঙ্গে এসব চোলাই কারবার ছাড়তে হবে। জমি জিরেৎ ক'রে, গুছিয়ে গাছিয়ে বসতে পারলে, আমার মেয়েকে দেব।' ব'লেছেল একদিন বাঁকা খুড়ো—।

একটা দমকা বাতাস এসে যেন তার কথার মুখে থাবাড়ি দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। তারপর তারা দুজনে বাঁধানো চত্বরের ওপর শুয়ে পড়ল।

খুপরির আলোটার আয়ু তখন শেষ হ'য়ে গেছে।

দুর্গা বলল চাপা গলায়, ঘুটঘুটে আঁধার ইট্টু আস্তে চালাও।

চিরঞ্জীব সে কথার কোন জবাব দিল না। অদূরেই স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। স্টেশন আর হাটের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া চলবে না। টর্চ লাইটটা আর একবার জ্বালাল চিরঞ্জীব। বাঁ দিকে, একটি কাঁচা রাস্তা গেছে মাঠের মাঝখান দিয়ে। সেই রাস্তায় বাঁক নিল সাইকেল। সাইকেলের ঝাঁকুনি বাড়ল, কিন্তু গতি কমল না।

দুর্গা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল, উঃ! লাগছে যে?

কিন্তু সাইকেল সমান গতিতে চলতে লাগল। দুর্গা এবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল চিরঞ্জীবের দিকে। প্রায় মুখে মুখে ঠেকে যাওয়ার মত কাছাকাছি। দুজনের নিশ্বাস দুজনেরই গায়ে মুখে লাগছে। দুর্গার কষ্ট হ'লেও, চোখের কোণে একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, ছোট ঠাকুর কি রাগ করেছ?

চিরঞ্জীব সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, না।

—তবে?

—তবে কি?

—রাগ রাগ মনে হচ্ছে যে?

সাইকেল আবার খাল ধারেই এসে পড়ল। গ্রামের বাইরে

যাওয়া আসার এইটিই সবচেয়ে নির্জন রাস্তা। কি দিনে, কি রাত্রে।

একটু চুপ ক'রে থেকে জবাব দিল চিরঞ্জীব, আমার রাগের কি আছে? যার যা স্বভাব, সে তো তাই করবে।

ঠিক এই কথাটি কোনোদিন সহ্য করতে পারবে না দুর্গা। চিরঞ্জীবও বড় একটা বলে না। যে দিন সে রাগ সামলাতে না পারে, সেদিন অজান্তে, অনিচ্ছায় বেরিয়ে যায়। দুর্গার কাছে এ কথা বরাবরই অপমানকর বোধ হয়েছে। মনে হয়েছে, এর মধ্যে কোথায় একটি নিষ্ঠুর বিদ্রূপাত্মক খোঁচা আছে। তাদের জাত, তাদের জীবন, বিশেষ ক'রে দুর্গার জীবনের প্রতি যেন অতি সহজ বিশ্রী একটা কটাক্ষ আছে।

সহসা সাইকেলটা টলমল ক'রে উঠল। চিরঞ্জীব বলল, কি হ'ল?

দুর্গার চাপা গলা শোনা গেল, নামব। নাম্মিয়ে দাও আমাকে।

চিরঞ্জীব হ্যাণ্ডেলটা আরও জোরে চেপে ধরল। সেই ধরার বাঁধনে, দুর্গাকেও আরো শক্ত ক'রে ঘিরল। বলল, পথে তো আমার র‍্যালা করার সময় নেই। চুপচাপ ব'সে থাক্।

কিন্তু দুর্গা বারে বারে পা ঠেকাতে লাগল মাটিতে। হ্যাণ্ডেলে ঝাঁকুনি খেতে লাগল। দুর্গা ঝাঁকি দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে বলল, আমারো র‍্যালা শোনবার সোময় নাই। নাম্মিয়ে দাও না।

চিরঞ্জীব জবাব দিল না। সে শুধু তার শক্ত মুঠি দুটি হ্যাণ্ডেলের মাঝখানে বরাবর চেপে ধরল। তাতে তার দুই কনুই প্রায় সাঁড়াসীর মত দুর্গার ক্ষীণ কটি ধরল আঁকড়ে। স্ক্রু-আঁটা-যন্ত্রের মত দুর্গা প্রায় অনড়, নিশ্চল।

ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দুর্গা ঠোঁট কামড়ে ধরে, সামনের অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তবু যেন একটা শেষ চেষ্টা ক'রে ঝাঁকুনি দিল। চিরঞ্জীব সামলে নিল।

দুর্গা বলল, এই বা কেমন ভাল স্বভাবের কাজ হচ্ছে?

চিরঞ্জীব বলল, বুঝে ছাখ্‌?

—দেখেছি।

আর একটা ঝাঁকুনি দিল দুর্গা। চিরঞ্জীব তৈরীই ছিল। সামলে নিল।

কিন্তু দুর্গার ফোঁসানি বাড়ল বৈ কমল না। বলল, স্বভাব মন্দ বলবে আবার ধরেও রাখবে, এ কেমন ধারা? নামতে দাও আমাকে। আমি যাব না তোমার সঙ্গে।

ব'লে দুর্গা বারে বারে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল সাইকেল ঠিক রাখা।

চিরঞ্জীব আরো শক্ত হয়ে দম আটকানো গলায় বলল, পড়বি, পড়ে হাত পা ভাঙবি।

—ভাঙি ভাঙব, তোমার তাতে কি? নাম্মিয়ে দাও।

চিরঞ্জীব শান্ত গলায় বলল, বাড়ি গিয়ে নামবি। এসে গেছি। ওই তো দেখা যায়।

নামা যে সম্ভব নয়, একথা প্রথম থেকেই জানত দুর্গা। তবু সে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাইছিল না চিরঞ্জীবের সান্নিধ্যে। বাড়ির দিকে নজর পড়তে সে আর কিছু বলল না। চিরঞ্জীব একেবারে উঠোনে এসে নামল সাইকেল থেকে। দুর্গা দ্রুত উঠোন পার হয়ে দাওয়ায় উঠে ঝনাৎ করে শিকল খুলল। ঘরে ঢুকে অন্ধকারে একটি কোণে বসে রইল চুপ করে।

গুলি ভেসে উঠল অন্ধকার উঠোনে। দু'জনকেই ফিরে আসতে দেখেছে সে। জিজ্ঞাস করল, জলগুলোর কি ব্যবস্থা হল চিরোদা? ধরা পড়ে যাবে না?

চিরঞ্জীব বলল, ব্যবস্থা একটা করেছি। গাড়ী থেকে জিনিস বার করে সতীশকে খালের ওপার করে দিয়েছি। বলেছি, চিতে পাড়ার ফটিকের ওখানে উঠতে। যদি হামলা না হয়, তবে ফটিককে নিয়ে

শহরে চলে যাবে রাতারাতি। গজু গাড়ি নিয়ে যেমন যাচ্ছে, তেমনই যাবে।

ভোলা কেষ্ট শুধু গাড়ি ধরবার কথাই ভেবেছিল। যদিও চিরঞ্জীব জানে না, ভোলা কেষ্টর নাকি আজ মন বিগড়ে গেছে। তাই তারা আজ আর মাল ধরবে না। তারা দুজনেই শুয়ে আছে কালীতলায়। কিন্তু চিরঞ্জীব আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল, ভোলা কেষ্ট গাড়ির পিছন ছাড়বে না। দরকার হলে ওরা শহর অবধি ধাওয়া করবে। তাই সে ব্যবস্থা পাকাপাকি ক'রেই, ন্যাড়াকালীতলায় গিয়েছিল।

গুলি বলল, যাক্, তাহলে ব্যবস্থা একটা হয়ে গেছে। কাসেম শালা একটা চক্কর মেরে গেছে এদিকে। আমি তো ভাবলুম, তোমাদের সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে যাবে।

—দেখা হলেই বা কি হত?

—তবু একটা—মানে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে আবার নানানখানা ভেবে বসত।

—বসত তো বসত।

কথার ভাবেই বুঝল গুলি, চিরঞ্জীবের মেজাজ ভাল নেই। বলল, তোমাদের ঝগড়া হয়েছে নাকি?

চিরঞ্জীব মুখ বিকৃত করে বলল, কে জানে কি হয়েছে? আর ভাল লাগে না। তুই বাড়ি চলে যা। কাল সকলে জটাকে একবার দেখা করতে বলিস্।

গুলির বয়স বেশী নয়। বছর আঠারো উনিশ হবে। এই গ্রামেরই ছেলে কিন্তু জল খেয়েছে অনেক ঘাটের। নামের পিছনের ইতিহাস লুকোনোই আছে। কালো কুচকুচে রং, আর গুলির মত ছোট একটুখানি। ছেলে কামারবাড়ির। গুলি ছাড়া এখন বংশটাই লোপ পেয়েছে। হাটে বাটে ঘুরে কেমন করে বেঁচে গেল সেইটা বিস্ময়। এখন বেঁচে থাকাটা আর বিস্ময় নয়। এখন দেহে বড় হয়েছে, শক্তিও কম ধরে না। আজ জীবনের সব ঘাট অঘাট সমান

হয়ে গেছে। সংসারে গুলিদের সৎ হয়ে বাঁচার উপদেশ দেবার সাহস কারুর নেই। সৎভাবে মরবার পদ্ধতিটাও শেখে নি। কারণ, শেখায় নি কেউ। জীবনে শ্রদ্ধা নেই। বাঁচার আকাঙ্খাটুকু মরে না। সংসারের কতগুলি মিল অমিলের দুর্বোধ্য বোঝা নিয়ে, একটা সমূহ আবেগে চলে বেড়ায়।

কেন যে ও গ্রামে ফিরে এসেছিল, নিজেই জানে না। বোধহয় ওর অবচেতন মনে একটি অস্পষ্ট ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এ সংসারের প্রতি কোনো একটি বিক্ষুব্ধ ব্যাথাহত মুহূর্তে, বাপ মায়ের সান্নিধ্যের জন্য মন ছটফটিয়ে উঠেছিল। বাপ মা তো মারা গেছে অনেকদিনই। তবু হারিয়ে-যাওয়া ভিটে আর গ্রামে এলে, তাদের যেন কাছকাছি মনে হয়।

এসে আর যাওয়া হয় নি। ওকুর দে বলে, 'শালা বেইমান ছোঁড়াটাকে আমিই পীক্ আপ্ করেছিলুম।' অর্থাৎ ওকুর দে'ই প্রথম তাকে এ পথে এনেছিল, দলে ভিড়িয়েছিল। না খেয়ে না মরুক, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হত সেদিন গুলিকে। কিন্তু বাঁদরকে নাকি মুলো খেত দেখাতে নেই। প্রমাণ, গুলি চিরঞ্জীবের দলে যোগ দিয়েছে।

ওকুরদে'র আফশোস অকারণ নয়। সে জানে, তার 'পীক্-আপ'টা বারুদের মত কাজ দিয়েছিল তাকে। কিন্তু চিরঞ্জীবের দলে স্বাভাবিক টানে যোগ দিয়েছিল গুলি। ওকুর দে ছিল বাবু। চিরঞ্জীব চিরোদা। বয়স আর সম্পর্কই শুধু নয়, স্নেহের ছিটেফোঁটাও কিছু ছিল বোধ হয়। যে-টুকুর জন্যে গুলি আশৈশব লালায়িত ছিল। গুলির আশ্রয়ও মিলেছে চিরঞ্জীবদের বাড়ীতেই। খাওয়াটা যদিও নিজের করে নেওয়ার কথা, অধিকাংশ দিনই সেটা এদিক ওদিক করে হয়ে যায়। কখনো দুর্গার কাছে। কখনো চিরঞ্জীবের মায়ের কাছে। ওই দু'জনের মর্জি এবং সুবিধে মতোই জোটে। কিন্তু ভাগাভাগি ক'রে জুটে যায় ঠিকই। আশ্রয়টাও তার ভাগাভাগির মধ্যে। মাঝে মাঝে দুর্গার কাছেও থাকে সে।

গুলিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিরঞ্জীব বলল, কি হল? দাঁড়িয়ে রইলি যে? খাবি নাকি এখানে?

গুলি বলল, না। একটা কথা বলছিলুম চিরোদা। জটা তোমাকে ডোবাবে। কলোনীর বীণাকে নিয়ে একটা গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে কোন্‌দিন।

চিরঞ্জীব শান্ত গলাতে বলল, জানি। সেইজন্যেই জটাকে কাল দেখা করতে বলেছি।

গুলি চলে গেল। তার যাওয়ার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল আরো কিছু বলতে চাইছিল সে। চিরঞ্জীব সিগারেট ধরালে একটা। ফিরে তাকাল একবার অন্ধকার ঘরের দিকে। মুখ ফিরিয়ে, আরো কয়েক মুহূর্ত পর দাওয়ায় এসে উঠল সে। ঘরের অন্ধকারকে লক্ষ্য করে বলল, অন্ধকারে বসে আছিস কেন? বাতি জ্বেলে খেয়ে শুয়ে পড়।

বলে আরো একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দাওয়া থেকে নেমে এসে, সিগারেটটা ফেলে, সাইকেলে হাত দিল।

দুর্গা বেরিয়ে এল দাওয়ায়। বলল, যাচ্ছ কোথা?

চিরঞ্জীব উঠোন পার হতে হতে বলল, বাড়ি।

দুর্গা পিছনে পিছনে এসে বলল, বাড়ি যাচ্ছ কি রকম? রান্না করতে বলেছিলে যে?

চিরঞ্জীব বলল, করেছিস কি না তা জানব কেমন করে? তখন থেকে তো ফোরকে রইছিস।

দুর্গাও কম যায় না কিছু। বলল, তা কি জানি। আজ আমার হাতে খেলে তোমার জাত যাবে কি না কে জানে?

চিরঞ্জীব ঠোঁট কুঁচকে বলল, তাই নাকি?

দুর্গা বলল, তাই তো। তা পাপ তো নিজের ইচ্ছায় করি নাই। তুমি খেতে চাইলে, না রেঁধে উপায় কি?

চিরঞ্জীব বলল, শাঁখের করাত বল্? যেতেও কাটে আসতেও কাটে। তা এসব ধম্মোজ্ঞানটা অন্য সময় থাকে কোথায়?

চিরঞ্জীব দুর্গার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কতদিন না তোকে বারণ করেছি, তুই যেখানে সেখানে ওরকম ঝাঁপিয়ে পড়বি নে ? তুই জানিস, তোর ওপর সকলের ঝোঁক বেশী, ধরতে পারলে আর রক্ষে নেই।

—তা নিজের জন্যে যাই নিকি ?।

—না হয় পরের জন্যেই যাস। কিন্তু এত পরোপকার না করলে নয় ?

চিরোঠাকুরের এ কেমন ধারা যুক্তি, দুর্গার মগজে ঢোকে না। নিজের জন্যে নয় মানে কি, দুর্গা একেবারে নিজেকে বাদ দিয়ে বলছে ? সে অন্ধকারে চিরঞ্জীবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিজে যখন ঝাঁপিয়ে পড়, তখন কার কথা শোন শুনি ? ছামুখে এট্‌টা বেপদ দেখলে কেউ চুপ করে থাকতে পারে ? তুমি নিজে পার ?

কথাটা মিথ্যে না। চিরঞ্জীব নিজের কানে শুনলে আজ স্থির থাকতে পারত না। একটা কিছু করতে হত তাকে। মুখে সে যাই বলুক, অন্তরে জানে, দুর্গা মাঝখানে গিয়ে না পড়লে, এতক্ষণে ভোলা কেষ্ট কাজ হাসিল করে ফেলত। আর জিনিষ ধরা পড়লে যে চিরঞ্জীবের অবস্থা কেমন হয়, সে অভিজ্ঞতা থেকে দুর্গা বঞ্চিত নয়। যদিও সে অভিজ্ঞতার দায় থেকে মুক্তির জন্যেই দুর্গা ঝাঁপিয়ে পড়েনি আজ। এইটিই দুর্গার আসল পরিচয়। তার চরিত্রের রীতি। নিজের করনীয় কিছু থাকলে যে কোনো অবস্থার সামনে সে ছুটে যাবে।

চিরঞ্জীব তা ভাল করে জানে। বোধহয় সবচেয়ে বেশী জানে। আর ডাকাবুকো নির্ভীক চিরঞ্জীবের মনে তাই ভয়। দল তার অনেক বড়। সকলের সঙ্গে তার সমান সম্পর্ক নয়। কিন্তু অধিকাংশের সঙ্গেই তার প্রীতি ও ভালবাসা আছে। তবু চিরঞ্জীবের এ ভয়ের লীলা বড় বিচিত্র।

চিরঞ্জীব বলল, সবই তোকে পারতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি ?

দুর্গা জবাব দিল, সব পারার কথা বলছেটা কে ? যা পারি

তাই করি। দলে যখন আছি, তখন করব বৈকি। না যদি করতে দাও, তবে বিদেয় করে দাও।

ওকথা শুনলে আবার চিরঞ্জীবের রাগ হয়। বলল, বিদেয় নেবার বুঝি বড় ইচ্ছে তোর?

দুর্গা বলল, ইচ্ছেটা তোমার না আমার তুমিই ভেবে দেখ।

—আমি তো দেখি তোরই ইচ্ছে।

—তা বটে। মন তো কেউ দেখতে পায় না।

বলে অন্ধকারে দুর্গা আর একবার চিরঞ্জীবের চোখের দিকে তাকাল। তারপর মুখ নামিয়ে পিছিয়ে এল দু পা।

চিরঞ্জীব জানে দুর্গার মুখ এবার ভার হয়ে উঠেছে। রাগে নয়, অন্য কারণে। চিরঞ্জীব নিজেও একটি চকিত মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে উঠল, মন বুঝি তুই একলা দেখতে পাস?

দুর্গা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আমার আবার মন, আমার আবার চোখ! রাত হয়েছে অনেক, খেয়ে নাও।

চিরঞ্জীব সাইকেল নিয়ে দাওয়ার দিকে যেতে যেতে বলল, আসল ব্যাপারটা অন্যরকম। ভোলা কেষ্ট তোর পুরনো বন্ধু। ওদের কথা শুনলে ঘরে থাকতে পারিস নে।

এতক্ষণে বৈশাখের বাতাস দোলা অন্ধকার রাত্রিটা দুর্গার খিল্‌খিল্‌ হাসিতে শিউরে উঠল। সহসা সেই হাসির লহরে, বুঝি চমকে ওঠা পাখী একটা ডেকে উঠল পিক্‌ পিক্‌ শব্দে। পাশের বাড়ির কুকুরটা ডেকে উঠল দুবার ঘেউ ঘেউ করে।

চিরঞ্জীব শাসিয়ে উঠল, এই, এই দুর্গা এত রাত্রে অমন করে হাসছিস কি? পাড়ার লোক জেগে যাবে না?

দুর্গা গলা নামালেও, হাসি তার সহজে বন্ধ হতে চায় না। বলল, এতক্ষণে এট্টা কথার মত কথা বলেছ চিরোঠাকুর। পুরনো বন্ধু কেন, প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলী। সত্যি, তাদের নাম শুনলে কি ঘরে থাকা যায়?

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে, দেশলাই খুঁজে বার করল দুর্গা। চিরঞ্জীবও পিছন পিছন এসে ঢুকল। বলল হাসছিস যে? ভোলা কেষ্টর নাম শুনলেই ছুটে যাস বুঝি না তুই?

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বলে উঠল দুর্গার হাতে। কিন্তু দুর্গার মুখে তখন কথা। কথার ঘায়ে মুর্চ্ছা গেল আলো। দুর্গা বলল, যাই-ই তো। যেখেনে জোঁক, সেখেনেই নুন না গেলে চলবে কেমন করে?

পায়ে পায়ে দুর্গার আরো কাছে এসে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। বলল, ঠাট্টা নয়। একদিন কোন্ নুনের মুখে কে যে জোঁক হয়ে বসে থাকবে, তখন আর রক্ষে থাকবে না। জিনিস ধরা পড়বে কি না পড়বে, সে কথা ভাবি নে। কত বিপদ আপদ হতে পারে।

আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলেছিল দুর্গা কিন্তু চিরঞ্জীবের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, সেই মুহূর্তেই হিসিয়ে উঠল সে, ঈস! মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আমার দেখা আছে।

—তোর সবই দেখা আছে, না?

বলে, চিরঞ্জীব নিজেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে হ্যারিকেনটা ধরাল এবার।

সিকার ওপর থেকে ভাত তরকারি নামাতে নামাতে জবাব দিল দুর্গা, অত শত আমি জানি না। যা করবার তাই করেছি। যে বিচার তোমার মন চায় কর। এখন রাত হয়েছে, খেয়ে নাও।

থালায় ভাত বেড়ে, জল গড়িয়ে দিল দুর্গা। রান্না জিনিসপত্র সব এগিয়ে দিল কাছে।

চিরঞ্জীব বলল, বিচারের কথা তো বলেছি। এভাবে তুই যেখানে সেখানে ছুটবিনে আর।

—আর ছুটলে।

—এ্যাদ্দিন যা করিনি, তাই করব। ধরে তোকে ঘা কয়েক দিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখে দেব।

দুর্গা হাসতে হাসতে প্রায় ঢলে পড়ল। বলল, নতুন কথা শোনালে দেখছি।

—কেন নতুন কথা হল কিসে ?

—যেন তুমি আমাকে মার নাই কোনদিন। ওকুর ব্যাটা এয়ে যিদ্দিন খারাপ খারাপ কথাগুলো বলেছিল, সিদিনে ওকে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছিলুম বলে, তুমি আমার চুল ধরে টান নাই ? আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দাও নাই দাওয়ায় ?

চিরঞ্জীব যেন বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাকে মনে করবার চেষ্টা করছে। আসলে মনে তার পড়েছে ঠিকই। বরং একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

দুর্গা ঠোঁট উল্টে, চোখ ঘুরিয়ে একটু বিদ্রূপের রসান দিয়ে বলল, মনে পড়ছে না ? বেশীদিনের কথা নয়। মাস ছয়েক হবে। আমি বলেছিলুম, 'আমার বাপ আমাকে কোনদিন মারে নাই বড় হওয়া ইস্তক। আর তুমি আমাকে মারলে ? আমি তোমার মুখো দশ্‌শন করব না।'

—তা আবার দর্শন করেছিলি কেন ?

—গুলিকে পাঠিয়ে খোসামুদ করেছিলে। তাতে হয় নাই, তা'পর নিজে এয়েছিলে মনে নাই ?

—তা কথা হচ্ছিল, কথা শুনিয়ে দিয়েছিলি। অত বড় ইঁট মেরে লোকটার কাঁধ ফুলিয়ে দিয়েছিলি, তোকে মারব না ? মামলা মোমদ্দমা করত কে ?

—তা বললে কি হবে ? ওসব খচ্চর মিনসের বুকে বসে নোড়া থেতো করা দরকার।

—বটেই তো। নইলে ফাঁসি যাবার সুবিধে হবে কেমন করে ? নে নে, খেতে দে

—তবে যে বলছ, মারবে ? মেরেছ তো আগেই। ঘরের দরজাটা অবিশ্যি বন্ধ করে রাখ নাই।

—এবার তাই রাখব। আর মারও যে সে মার নয়। এ্যায়সা ঠ্যাঙানি দেব, তখন দেখিস।

দুর্গার সঙ্গে চকিতে একবার চোখাচোখি হল চিরঞ্জীবের। দুর্গার চোখে ঠোঁটে বিদ্যুত ঝিলিকের মত হাসি দেখা দিল। বলল, তাই দিও। দাঁড়াও আসনটা দিই—

—থাক্।

চিরঞ্জীব লেপা মেঝেতেই থেবড়ে বসল। হাত ধোবার নাম পর্যন্ত নেই। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। তার উসকো খুসকো চুল, ময়লা ময়লা জামাকাপড়। সাইকেল চালিয়ে ধুলো ভরা পা, সব কিছুর সঙ্গে থালা বাসনগুলিরও কোন মিল নেই। মানুষের জীবন বোধ হয় এইখানেই বিচিত্র। দুর্গার জীবনের সঙ্গেও থালা-বাসন-ব্যঞ্জনের কোনো মিল নেই। সেগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে। সযত্ন হাতের নিয়ত স্পর্শ ছাড়া এমনটি সম্ভব নয়। পটু হাতের রান্না এমন সতর্ক প্রহরায় না থাকলে, রান্না খাওয়ার শুচিটুকু থাকে না। কিন্তু এ ঘরের বাসিন্দার জীবনের সঙ্গে, ওই মনটা খুঁজে পাওয়া দায়। মিল অমিলের সংমিশ্রণ আছে বলেই বোধহয় বৈচিত্র্য আছে সংসারকে ঘিরে।

দুর্গার বাবা বেঁচে থাকতে ঘরের চেহারা এমনি ছিল। আজো আছে। কিন্তু দুনিয়ার লোক জানে, দুর্গা আর সে দুর্গা নেই। লোকে বলে, হ্যাঁ, বাঁকা বাগদির বেটি বটে। সেটা আগেকার অর্থে নয়। খরখরে চোপাউলী ডাকিনী মেয়ে বলে নয়। অন্য অর্থে। যে অর্থে লোকে সর্বনাশের কথা বলে। মাতি মুচিনীর ভাষায়, 'সারা পিরথিমীতে এত বড় মেয়ে ডাকাত নেই। এত বুকের পাটা আর দেখা যায় নি কোথাও। আইবুড়ো নাম ঘোচে নি দুর্গার। কিন্তু অরক্ষনীয়া আর কেউ বলে না তাকে। যে-পিপড়েরা একদিন অবিশ্রান্ত আসছিল তাকে ঘিরে, আজ তারা থতিয়ে গেছে। থতিয়ে গেছে চিরঞ্জীবকে দেখে। মাতি মুচিনী বলে, ডাকা পেয়েছে ডাকিনী। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। ও মেয়ে ইচ্ছে করলে, রাত করে গোটা গাঁয়ের ঘরে ঘরে শেকল তুলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

যদিও মাতি মুচিনী নিজেও দুর্গার চোলাই রসের চালানদারনী হয়েছে আজকাল। এটাও সংসারের বৈচিত্র্যের মধ্যেই পড়ে। তবে মাতি মুচিনীর মনে যদি কেউ কান পাতে, তা হলে শুনতে পাবে, দুর্গাকে তার কত ভয়, কত ভক্তি। দুর্গা তার সারা জীবনের অনেক দেখার একমাত্র বিস্ময়।

সেই ভয় বিস্ময়টা আজ গোটা অঞ্চল জুড়েই। মাতির মত ভক্তিও তাকে অনেকে করে। এটাও সংসারের একটি বিচিত্র। সুরেশবাবু মিথ্যে বলেন নি, দুর্গা আজ কিংবদন্তির নায়িকা। মাঠে হাটে, দোকানে, গরুর গাড়ীতে, গল্প-গুজবের মধ্যে দুর্গার আলোচনা আকচার। বৌ-ঝিদের গুলতানির মধ্যে দুর্গার নাম ওঠে বারে বারে। সেই সব আলোচনা গুলতানির মধ্যে, অনেককেই হলফ করে বলতে শোনা যায়, অলৌকিক মায়া জানে দুর্গা। শুধু যে ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে দুর্গার কথা বলে তারা, তা নয়। দুর্গার মধ্যে তারা তাদের অবদমিত বাসনা চরিতার্থতার প্রকাশ যেন দেখতে পায়। সেটা যত বিকারগ্রস্তই হোক তবু সেটা হল দুর্গার দুর্জয় সাহস! একটা সর্বনাশের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ। আর চিরোঠাকুরের মত লোককে আঁচলে বেঁধে রাখা। লোকে ওইভাবেই দেখে। তার কারণ, তার যত দেবীত্ব কিংবা অপদেবীত্ব, সবটাই চিরঞ্জীবের মত দেবতার পরিমণ্ডলেই কল্পিত। আরো ভীত ও খুশি তারা দুর্গার স্বচ্ছন্দ বিহার দেখে। দুর্গা যে নিপাটে ভাজ হয়ে নেই, দাপটে বাঁচছে, এইটাই যেন তাদের বাসনার রূপ। মাতি মুচিনীদের যৌবনের কিংবা আজকের গানি মুচিনীর মত দুর্গা তাদের কাছে দেহপোজীবিনী স্বৈরিনী নয়।

কথায় বলে, যা রটে, তার কিছু বটে। কিন্তু যা ঘটনা, রটনা যে তার চেয়ে বেশী, এখন দুর্গাকে দেখলে সেই কথাই মনে হয়। দুর্গা শুধু সারা জীবন এমনি করে বসে থাকতে চেয়েছে। এমনি করে তার স্বাভাবিক ভঙ্গি মুখের ওপর আঁচল তুলে, একটু অন্ধকার

বেছে নিয়ে, অস্পষ্ট আড়াল থেকে দু'চোখ মেলে এমনি চেয়ে চেয়ে দেখতে চেয়েছে একজনকে।

খেতে খেতে হঠাৎ খাওয়া থামাল চিরঞ্জীব। ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওরকম তাকিয়ে থাকিসনে তো। আমার বড্ড গায়ে বেঁধে।

দুর্গা চমকে উঠে বলে, ওমা তাকিয়ে আছি কোথা?

আমি বুঝি জানি নে? ওরকম তাকিয়ে থাকিস নে আমার দিকে।

আসলে এই উষ্মা লজ্জা থেকে। এবং চোখে না দেখলে, কানে না শুনলে, মাত্র তেইশ বছরের বে-আইনি চোলাই স্মাগলার দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ চিরঞ্জীবের এই বিচিত্র লজ্জা বিশ্বাস করা যায় না। যার সঙ্গে তার কোন লজ্জার বালাই নেই, তারই চোখের চাউনিতে তেইশ বছরের পুরুষের এই লজ্জা অভাবিত। কিন্তু মিথ্যে নয়।

দুর্গা রাগ করল না। বরং আঁচলে ঠোঁট চাপা থাকলেও, তার চোখ দেখে বোঝা গেল, হাসছে সে। বলল, কেন, চোখে কি আমার ছুচ আছে যে বেঁধে।

চিরঞ্জীবকে যেন ছেলেমানুষ বোধ হয়। বলল, কি জানি। আমার গায়ের মধ্যে যেন কি রকম করতে থাকে। তুই যেন কি!

দুর্গা এবার সশব্দে হেসে উঠল। বলল, কি আমি?

—কি জানি আমি বুঝিনে।

দুর্গার শরীরের কাঁপুনি দেখলেই বোঝা যায়, হাসি সামলাতে পারছে না সে। একটু পরে বলল, তুমি যখন তাকিয়ে থাক, তখন?

—আমি আবার কখন তাকিয়ে থাকি?

—মনে ক'রে দেখ। তখন আমারও তোমার মতন হয়।

ওরা দু'জনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের দুজনের মধ্যেই যেন কেমন করে। কিন্তু কেন তাকিয়ে থাকে আর কেমন করে, ওরা তা জানে না। বছর ঘুরে চলেছে, ওরা প্রায় এক সঙ্গেই আছে। ওদের যা কাজ, সেই কাজ করে। হাসে ঝগড়া করে, এমনি খাওয়ানো আর খাওয়াও প্রায় রোজ দাঁড়িয়েছে। তবু ওরা

যেন জানে না, ওদের মন প্রাণের স্বরলিপি কোন পর্দায় বাঁধা। কেন ওরা মাঝে মাঝে নিরালা চায়। আর যদিও বা পায়, সেই নিরালা মুহূর্তগুলি কেন ঘূর্ণী জলের আবর্তের মত পাক খেতে থাকে। সৃষ্টি করে দহ। একটা স্রোতের ধারা খুঁজে পায় না।

লোকে জানে, ওদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো সন্দেহেরও অবকাশ নেই। ওটা এখন তর্কেরও অতীত। শুধু ওরা ছজনেই তা জানে না।

কারণ, ওদের ছজনের বিষয় যে-কথা বলার চেয়ে বেশী, সেই বিষয়টাই একটা দুর্লঙ্ঘ না-বলার সীমায় ওদের ছজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ওরা একজন ডাকা, একজন ডাকিনী। চলতি প্রবাদটা যারা গা পেতে নিয়েছে 'লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়'। কিন্তু এই ডাকা আর ডাকিনীটা একটি ফাঁদের মায়ায় বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। কেন, ওরা জানে না। সেটা ওদের লজ্জা নয়, ভয় নয়, ঘেন্না নয়। সেটা ওদের অচেনা অ-বলা দুর্নিরিক্ষ্য অস্পষ্ট সীমা। যে সীমাটাকে লোকে দেখতে পায় না, ওরা ছজনে তার চারপাশে, কাজে সাজের নানান লীলায় ঘুরে কিংবদন্তী সৃষ্টি করছে

জেল মামলা ছাড়াও ওদের জীবনধারণের ঘেরা গলিটা কানা কিনা. সেই পরিণতিটাই যেমন জানে না ওরা, তেমনি ওরা জানে না নিজেদের পরিণতি।

তাই বোধহয় ওরা এখনো মারামারি চেঁচামেচি করতে পারে। ছজনে ছজনকে যা খুশি বলে আক্রমণ করতে পারে চুক্তিহীন ভাবে। যে-কোন মুহূর্তেই ছেড়ে যেতে পারে ছজনে ছজনকে।

তবু যে-ফাঁদটায় ওরা ধরা পড়েছে, সেখান থেকে ওদের মুক্তি নেই।

চিরঞ্জীব দুর্গার কথার খেই টানল। বলল, হয় তো বলিস না কেন? তা হলে আর তাকাব না তোর দিকে।

দুর্গার মুখে একটু ছায়া সঞ্চারিত হল। বলল, তাকিও না। তাতে কি হবে আমার শুনি?

বলে দুর্গা আর বেড়ায় হেলান দিয়ে রইল না। একেবারে ধপাস করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। আঁচলটা যেন গড়িয়ে গেল কোন দিকে। শুধু লাল ছিটের জামার উর্ধ্ব বাঁকে হ্যারিকেনের আলো একটি সর্বনাশের দ্যুতিতে দপ্ দপ্ করতে লাগল। মাথার নীচে কুণ্ডলী পাকানো একরাশ কেউটের মত এলিয়ে রইল চুল।

চিরঞ্জীব সেইদিকে একবার দেখে বলল, তোরা মেয়েছেলেগুলো যেন কেমন।

দুর্গা বলল টিপে টিপে, মন্দ তো? মেয়েছেলের সঙ্গে মেশো কেন

চিরঞ্জীব বলেই চলেছে, এ দুটো কথা বলে, সে দুটো কথা বলে।

দুর্গাও খুব নীরস নির্বিকার গলায় জবাব দিল, বলবেই তো। তুমি আমাকে সোনার গয়না দাও, রানীর মতন আদরে রাখ। বলবে না?

—আর ফুল বিছিয়ে দিই না তোর পায়ের তলায়?

—লোকে তো তাই বলে। এই তো সিদিনেও মাতি বুড়ি হাটে দাঁড়িয়ে বলে এয়েছে, সে স্বচক্ষে দেখেছে, মাঝ রাতে নিকি বাঁকা বাক্‌দির উঠোনে শেতল পাটি পেতে বসেছিল চিরোঠাকুর। আর তার বুকের মাঝখানে মাথা রেখে গুন্‌গুন্ করে গান গাইছেল দুগ্‌গা।

—বলছিল, না?

চিরঞ্জীবের গলায় রাগ ফুটল এবার।

কপালের ওপর হাত রাখায় দুর্গার মুখ অন্ধকারে। শুধু লাল কাঁচের চুড়িগুলি বিন্দু বিন্দু জ্বলছে। বলল, হ্যাঁ, বলছেল। আরো কত কথা বলছেল। চিরোঠাকুর দু হাতে জড়িয়ে ধরে দুগ্‌গাকে সোহাগ করছেল। আর দুগ্‌গা চিরোঠাকুরের মুখে পানের খিলি পুরে দিচ্ছেল।

চিরঞ্জীব প্রায় লাফিয়ে উঠে আর কি। বলল, মিথ্যুক বুড়িটার মুণ্ডুটা এবার ধড়ছাড়া করে ছাড়ব আমি।

এবার দুর্গা মুখ ফেরাল আলোর দিকে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, বটে? এনে দেব কাটারিখানা? এনে দেই, কেমন?

চিরঞ্জীব একমুহূর্ত থতিয়ে গিয়ে, দুর্গার দিকে একটু তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ও তুই ঠাট্টা করছিস?

—ঠাট্টা কোথায় দেখলে! সত্যিই তো। আর বলবে না বা কেন?

—কেন বলবে?

—তুমি আসবে কেন মেয়েছেলের কাছে? আসবে কিন্তুন দুন্নাম শুনবে না, তা কি হয়?

চিরঞ্জীব ঝাঁঝিয়ে উঠল, দুর্ণামের ভয় করছে কে? সে ভয় থাকলে কি আর এ লাইনে এসেছি? কিন্তু ও-বুড়ি মিছে কথা বলবে কেন?

দুর্গা কথায় খুবই শান্ত। কিন্তু শান্ত কথাগুলির মধ্যে বারুদ ছিল প্রচুর। বলল, আহা, চটছ কেন? সে কথা তো হচ্ছে না, কোন্ লাইনে এয়েছ আর আস নাই। কথা হচ্ছে মেয়েছেলে নে'। তুমি নিজেই বলছ, জনে জনে নানান কথা বলে। ত সবাইকে গে' মুণ্ডু কাট।

চিরঞ্জীবের নিজেরো মনে হল, তার রাগটা যেন ঠিক রাগের মত হচ্ছে না। বরং সন্দেহ হল, দুর্গা-ই রেগেছে। সে বলল, তোর বোধহয় এসব শুনলে রাগ হয় না?

—না।

—কেন?

—কেন হবে? ব্যাটাছেলের সঙ্গে মিশে চোলাই কারবার করি, দশজনে দশকথা বলবেই তো।

চিরঞ্জীব বলল, হ্যাঁ, তোর তো ওসব জল ভাত। গা সওয়া হয়ে গেছে।

দুর্গা একবার চোখ তুলে তাকাল চিরঞ্জীবের দিকে। তারপর একেবারে অন্ধকারের দিকে পাশ ফিরে শুল

চিরঞ্জীব বলল, কি হল ?

অন্ধকার থেকেই চাপা স্বর ভেসে এল দুর্গার, কি আবার ! আমি মেয়েছেলে, তায় বাগ্‌দিদের মেয়ে, তাই মন্দ। আমার তো ওসব গা সওয়া হবেই। তোমরা ভাল, তাই তোমাদের পট্‌পটানি দেখছি।

চিরঞ্জীব ততক্ষণে আচাতে চলে গেছে। ফিরে এসে বলল, নে এবার খেয়ে নে।

—খাব'খনি, তুমি যাও।

চিরঞ্জীব সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল। খেঁকিয়ে উঠল প্রায়, ওঠ্‌ ওঠ্‌, খেয়ে নে।

দুর্গাও ফুঁসে উঠল, মেলা ধমকাচ্ছ কেন ? তুমি বাড়ী যাও না, আমি যখন খুশি খাব।

চিরঞ্জীব ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুর্গার দিকে। চুলগুলি এলিয়ে প'ড়ে, পুরোপুরি গ্রীবা দেখা যাচ্ছে দুর্গার। জামাটা অনেকখানি উঠে গেছে পিঠের দিকে। চিরঞ্জীব তার শক্ত হাত দিয়ে টানতে গিয়ে দেখল, দুর্গা তার চেয়েও বেশী শক্ত হয়ে আছে। আবার বলল সে, উঠবি ভালয় ভালয় ?

দুর্গার সেই একই জেদী জবাব, তুমি যাও না কেন ?

কথা শেষ হবার আগেই চিরঞ্জীব তাকে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলে বসিয়ে দিল। দুর্গা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, উঃ !

আর এক হেঁচকায় একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল দুর্গা। এবার আরো জোরে আর্তনাদ করে উঠল দুর্গা, উঃ ! কবজিটা ভেঙে দিলে আমার।

পরমুহূর্তেই চিরঞ্জীবকে ধাক্কা দিয়ে, ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিল সে।

অন্য কেউ হলে এ ধাক্কা সামলাতে কতখানি ঘায়েল হত বলা

যায় না। চিরঞ্জীব সহজেই সামলে নিল। বলল, যা, খেয়ে নি'গে যা।

দুর্গা ফুঁসে উঠল, আমার যখন খুশি খাব, তোমার কি? যা খুশি তাই বলে হেনস্থা করবে, আবার জোরও খাটাবে? ভেবেছটা কি? তোমার মনের কথাটা কি? আমাকে এট্টা হ্যাংলা পেয়েছ?

—মানে?

মানে ভেবে দেখ গে'। যেন চিরোঠাকুরের পেছু পেছু আমি হ্যাংলাপনা করে মরছি। তাই তো বলছ তুমি।

সে কথা আমি বলেছি, না তুই বলছিস। আন্‌সাটে তুই কি বলছিস, আমি বুঝি বুঝতে পারিনে? এসব কথার মানে কি—'মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে লোকে তো বলবেই। দুর্ণাম তো হবেই।' তার মানে, আমি খারাপ, খারাপ মতলব নিয়ে আমি তোর কাছে আসি, না?

রাগে ও বিস্ময়ে যেন কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে রইল দুর্গা। তারপরে বলল, তুমি একখানি মিথ্যুক, ঘোর মিথ্যুক।

—হ্যাঁ, আর তুই সত্যবাদী।

চিরঞ্জীব সিগারেট ধরাল।

এত বাদানুবাদ, এত দোষারোপ আসলে ওদের ছলনা। এই ছলনাটাও ওরা জেনে করে না বোধহয়। যে দুর্লঙ্ঘ না-বলার সীমাটা ওদের মাঝখানে রয়েছে, সেই সীমাটা না পেরোতে পারার ক্ষোভে ওরা পরস্পরকে একটু খুঁচিয়ে নেয় মাঝে মাঝে।

দুর্গা এবার নিজে থেকেই খেতে বসে গেল।

চিরঞ্জীব হঠাৎ বলল, আমি একবার বাঁশঝাড়ের তলাটা দেখে আসি। জিনিসগুলো আবার ঠিক আছে কি না—

কথা শেষ হবার আগেই দুর্গা একেবারে যেন শিউরে উঠল। বলল, মাথাটা কি খারাপ হয়েছে নিকি?

—কেন?

—নয় তো? এখন যাবে তুমি বাঁশ ঝাড়ে, জিনিস দেখতে? জান না, ওখেনে কী আছে? বলে ছাগল গরুও ভুলে ওদিকে যায় না রাত করে। আর তুমি যাবে জিনিস দেখতে।

পকেট থেকে টর্চ লাইট বের করেছে চিরঞ্জীব। বলল, ও, সেই সাপটার কথা বলছিস?

দুর্গা ভয়ার্ত্ত গলায় উচ্চারণ করল, আস্তিক আস্তিক আস্তিক, গরুড় গরুড় গরুড়। কোন কথা আটকায় না, না? লতা বলতে পার না রাত করে?

চিরঞ্জীব বলল, তোর আবার যত ইয়ে। ধম্মো করবি, আবার অধম্মো করবি। বামুনের ছেলেকে রেঁধে খাওয়াতে পারিস, আর সাপকে লতা না বললেই—

—আঃ!

দুর্গা ঝাম্‌টা দিয়ে উঠল। বলল, মেলা বিস্তে ফলিও না তো ছোটঠাকুর, আমার গা জ্বালা করে। খাওয়ানোর সঙ্গে লতার কি আছে। খাইয়েছি, আমার পাপ হবে। তা বলে জেনে শুনে নিগ্‌ঘাৎ যমের মুখে যেতে হবে। তুমি যেতে পারবে না এখন উদিকে।

আবার বসে পড়ল চিরঞ্জীব। দুর্গা মুখে ভাত তুলতে গিয়ে থামল। বলল, আচ্ছা, বেশী রাত ক'রে বুড়ো মায়ের কষ্ট হবে বলে তুমি এখেনে খেলে। ত' গুলিটাকে বাড়ী পাঠালে কোন আক্কেলে! সে-ই তো গে বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দেবে।

চিরঞ্জীব বললে, বাঃ, সন্ধেবেলা টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে, বাইরে খাবে বলে। আর মাকে তো আমি রান্না করতেই বারণ করেছি।

—বাইরে কী খাবে? ময়রার খাবার?

—তা কি জানি। ওর আবার কারা সব সাঙ্গপাঙ্গ আছে তো বাজারে। তাদের কাছে খাবে হয় তো।

—আচ্ছা শোন্—

চিরঞ্জীব ফিরে তাকাল। দুর্গা তখন খেতে শুরু করেছে। চিরঞ্জীব বলল, কাল কি 'জাওয়া' বসছে তা হলে?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

অঘোর কবরেজ মশায়ের বাড়িতে।

চিরঞ্জীব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দুর্গার দিকে। দুর্গা খেতে খেতে হাসল।

'জাওয়া' বসান হল চোলাই করা। দেশীয় প্রথায় চোলাই করার, বোধহয় প্রাগৈতিহাসিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাটার নাম-ই জাওয়া বসান। যেন অনেকটা ভিয়েন বসার মত। কিন্তু অঘোর কবরেজ মশায়ের বাড়িতে?

চিরঞ্জীব বলল, কি যা তা বলছিস? নির্ঘাৎ একটা ফাঁদে গিয়ে পড়বি। অঘোর কবরেজের বাড়িতে জাওয়া বসবে এ কখনো হয়?

দুর্গা বলল, ওই নাও। বলছি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। মালমশলা সব পচছে আমার ওখেনে।

—অঘোর কবরেজ জানে?

—তা জানে। কবরেজ গিন্নি নিকি বলেছে কত্তাকে।

—কি করে কথা হল?

—রাঘব মিত্তিরের বাড়ি যে জাওয়া বসেছিল, গিন্নি সেটা টের পেয়েছে। আমাকে গিন্নি ডেকে বলছে কয়েকদিন আগে, 'ও দুগগা, আমাদের বাড়ীতে চোলাই করিস। পাঁচটা টাকা দিস আমাকে।' আমি বলেছিলুম, আচ্ছা।

—তারপর আবগারিতে খবর দিয়ে দেয় যদি!

মুখে ভাত তুলতে গিয়ে, থেমে বলল দুর্গা, তোমার যেমন কথা। মানুষ চিনি না আমি? কবরেজ মশায়ের তো আজ কত বছর ধ'রে আয় নাই। বড় ছেলে কোলকেতায় না কোথা থাকে। চাকরি করে, কিন্তুন

আসা দূরের কথা, চিঠি দে খবরটাও নেয় না। উদিকে বে'র যুগ্যি মেয়ে ঝুলছে গলায় দুটি। আর যিটিকে সোয়ামি নেয় না, সিটিও তো দুটো বাচ্চা নে এখেনে রয়েছে।

কিন্তু চিরঞ্জীব ছাড়ল না। তাতে তোর কি সুবিধে হল ?

—সুবিধে অসুবিধে আবার কি ? অবস্থা খারাপ বলে না সাহস করেছে। আর কবরেজ বাড়ি কি নতুন নিকি ! কে কেমন, আমি সবই জানি। গিন্নি এতখানিও বললে, 'তুই আমার মেয়েদের দেখিয়ে দিস, তা হলেই হবে। ওরা সব করে দেবে'খনি।'

—বলিস কি ?

—হ্যাঁ। আরো বললে, 'পেটে ভাত থাকলে ধম্মজ্ঞান থাকত। তোদের কবরেজ ঠাকুদ্দা তো ঠায় ব'সে আছে বললেই চলে। গাঁয়ে তো সবই মুখ শোঁকাশুঁকির ব্যাপার। সবার কথা-ই সবাই জানে। তবু মা তোকে দিব্যি দে বলছি, কোথাও যেন কিছু বলিস না। মেয়ে দুটোকে পার করতে হবে তো। লোকে আর কিছু না পারুক, দুর্ণাম দিতে কসুর করবে না।' তা'পর বললে, 'কোনকালে তো বাইরে বেরুই নাই। ঘরে বসে যেটুকুন হয়, সেটুকুন আমাদের সঙ্গে মিলে করিস।' তা আমি ভাবলুম সেই ভাল। আর মিত্তির বাড়ির ছোঁড়াগুলানকে বড্ড ভয় লাগে। কখন চেঁচিয়ে মেচিয়ে সোর তুলে দেবে, একেবারে হাটে হাড়ি ভাঙা।

চিরঞ্জীবের মুখে একটু চিন্তার ছায়া। অধিকাংশ চোলাই বনে-বাদাড়ে হয়ে থাকে। আবগারির সন্দেহভাজন কারুর বাড়িতেই চোলাই সম্ভব নয়। সেখানে নিয়ত সতর্ক চোখের পাহারা আছে। কান খাড়া আছে দেয়ালে বেড়ায়। এদিক দিয়ে চিরঞ্জীবেরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত। গ্রামের যে-সব বাড়িতে তাদের কাজ হয়, সে সব বাড়ি সম্পর্কে কারুর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মন কষাকষি হলেই সর্বনাশ। মিত্তিরবাড়ির লোকেরা রেগে গিয়ে খবর দিতে পারে। একটি ছেড়ে আর একটি ধরা, দুইয়েতেই বিপদ। নতুনকে ভয় না জানার। পুরনোকে ভয় ধরিয়ে দেবার।

দুর্গা বলল, কি হল? অমন গুম্ হ'য়ে রইলে যে?

চিরঞ্জীব এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, না, ঠিক আছে। সাবধানে থাকিস্ আমি চলি। ভোর রাত্রে আবার বেরুতে হবে। পাঁচ ঝাঁকা যাবে কাল কলকাতায়।

ঝাঁকা অর্থে সব্‌জি আর তরকারীর ঝাঁকা। এখানকার স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন শতাধিক তরকারির ঝাঁকা নিয়ে যায় চাষীরা। অনেক সময় শহরের ফড়েরাও মাল কিনে নিয়ে যায়। আর এসব ঝাঁকায় মদ চালান যাওয়া কিছু গোপন ঘটনা নয়। এখন এটা পুরনো ফন্দী। যদিও, সহজ এবং সুবিধাজনক। এত ঝাঁকা যায় যে, সবাইকে দেখে, সার্চ করে ওঠাই মুশকিল। আর সবদিনই পুলিশের দৃষ্টি একদিকেই থাকে না। বিশেষ, আগে খবর না থাকলে, অধিকাংশই বেরিয়ে যায়।

দুর্গা বলল, সে কি কথা। আজ ধরা পড়েছে ওকুরদের দু-ঝাঁকা আবার কালই পাঠাবে তুমি?

—হ্যাঁ, সেজন্যেই পাঠাব। ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আর শোন, কাল আমি কলকাতায় যাব মোটর গাড়ি নিয়ে। গাড়ী থাকবে চন্দননগরে। সেখান থেকেই উঠব। ফিরতে বোধহয় রাত হবে। তুই নিজে যেন আর বেরুসনি কোথাও কাল।

চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়াল। দুর্গাও তাড়াতাড়ি দাওয়ায় গেল ঘটি নিয়ে। মুখ ধুয়ে আবার ঘরে এল। চিরঞ্জীব গেল বেরিয়ে। গিয়ে দাঁড়াল একেবারে দাওয়ার নীচে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অন্ধকারে।

দুর্গাও বাইরে এল। দু'হাত দিয়ে বাঁশের খুঁটি জড়িয়ে দাঁড়াল।

চিরঞ্জীব বলল, যা দরজা বন্ধ করে দে।

দুর্গা বলল, দিচ্ছি তুমি যাও।

এই একটি সময়, কয়েকটি মুহূর্ত, প্রায় রাত্রেই ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। বোধহয় সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস, কঠিন কয়েকটি মুহূর্ত ওদের দুজনের। কথা ঝগড়া, হাসি, কিছুই হয় না এ সময়ে।

সব মিলে মিশে একাকার হয়ে, বোবা আর অর্থহীন সময় খানিকটা। দুটি হাত যত জোরে পারে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে। আর দুটি হাত দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখে খুঁটি। প্রবল বন্যার স্রোত বাধা পায়, ঘূর্ণী হ'তে থাকে।

দরজা দিয়ে আসা আলোয় অস্পষ্ট দেখা যায় চিরঞ্জীবের মুখ। আর দুর্গার পিছনে আলো সামনে থেকে তার ছায়া একটি রহস্যে দুলতে থাকে

চিরঞ্জীব বলল, চুলগুলো বাঁধিস্‌নে কেন ?

—বেঁধেছিলুম। কালীতলায় যাবার আগে খুলে দিয়েচি।

চিরঞ্জীব ঘুরে গেল উঠোনের মাঝখানে। দুর্গা যেন নিশির টানে নেমে আসে দাওয়া থেকে।

চিরঞ্জীব না ফিরেই বলল, গুলিকে থাকতে বলিস না কেন রোজ ?

—থাকেতো মাঝে মধ্যে। কেন ?

—একেবারে একলা থাকিস্‌।

তারপর সাইকেলে চড়ার একটা উদ্যোগ ক'রেও থেমে গেল চিরঞ্জীব। আর হঠাৎ একেবারে নতুন কথা শোনাল একটি। বলল, জানিস্‌ দুগ্‌গা, যে-কাজ করি, তাতে মা' রাগ করে না বরং খুশি। আমাকে লোকে বড়লোক বলে এখন। কিন্তু—

—আমার কাছে আস, তাই রাগ করে

দুর্গা ব'লে উঠলো শান্ত গলায়।

—হ্যাঁ কেমন ক'রে জানলি ?

—শুনিচি।

—আর তোর কাছে খাই ব'লে, আমার থালা বাসন সব আলাদা ক'রে দিয়েছে। আমি ম'লে নিশ্চয় মা আমার হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে।

—আচ্ছা, হয়েছে।

দুর্গা একটু ধমক দিল চিরঞ্জীবকে। তারপরে যেন ভয় ভয় চাপা গলায় বলল, আজ একথা বললে কেন ছোট্ঠাকুর?

চিরঞ্জীব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, মা বলেই শুধু বলছিনে। মানুষের ধর্মজ্ঞান দেখে বললুম।

দুর্গা বলল, মানুষের দোষ নেই। ধম্মোজ্ঞান এমনিই হয়। তুমি প্রথম যিদিনে আমাকে দেখেছিলে, তোমার চোখেও কত কি ছেল। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, 'হুঁ, তোর চলে কেমন ক'রে?'

চিরঞ্জীব কোনো জবাব দিল না।

দুর্গা বলল, রাগ করলে?

রাগ করে নি চিরঞ্জীব। দুর্গার কথাটা ভেবে দেখল সে। প্রথম যখন দেখেছিল সে অরক্ষণীয়া দুর্গাকে, তখন কত খারাপ সন্দেহ করেছিল। সকলেই ক'রে থাকে। তবু সে সন্দেহ মিথ্যে ছিল। মায়ের দোষ কি?

চিরঞ্জীব বলল, রাগ করিনি। কিন্তু ও সব ধর্মজ্ঞানে কী আসে যায়? আমি তোকে সন্দেহ করেছিলুম, তুই তখন রাগ করেছিলি। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হ'ত, তা হলেই বা ধর্মের কী এমন ক্ষতি হ'ত?

দুর্গা বলল, হ'ত বৈ কি ছোট্ঠাকুর। মেলা ক্ষতি হ'ত।

—কেমন ক'রে?

—তুমি আর আসতে না।

অন্ধকারের মধ্যেই চিরঞ্জীব দুর্গার মুখ দেখবার চেষ্টা করল। বলল, যারা আমার সঙ্গে কাজ করে, তারা কি সব খুব ধর্মিষ্ঠি নাকি?

দুর্গা বলল, তাদের কথা আমি জানি না। আমি নিজের কথা বললুম। এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছ, তবু এখনো তোমার সেই ধম্মোজ্ঞান কত টনটনে।

কথা অন্যদিকে মোড় নিল। সব নদী সমুদ্রে যায়। এখানকার সব রাস্তা জি, টি, রোডে যায়। দুর্গার সব কথা একটি জায়গায় এসে বাজে।

দুর্গার এ কথা হয়তো একটু বেশী স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। দিনেরবেলা হ'লে, একথা বলে আর সামনে দাঁড়াত না। অন্ধকার আছে বলেই, মুখ ফিরিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব'লে এখন লজ্জা করছে। যে-কথা মেয়েদের মুখ ফুটে বলতে নেই, তাই বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। শুনে চিরোঠাকুরের রাগ হ'তে পারে। বেহায়া ভাবতে পারে দুর্গাকে।

কিন্তু স্বৈরিণী হ'তে যার বাধা ছিল না, তবু বেআইনী চোলাইয়ের চোরা চালানদারনী যার জীবনধারণের পেশা, সে যে সব কিছুর ওপারে দাঁড়িয়ে শুধু একজনের দিকে তাকিয়ে আছে, একজন কবে একটু আঙুল তুলে ডাক দেবে, শোনবার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে আছে, সেই কথাটি ফাঁক পেলেই বেরিয়ে পড়ে তাকে চেপে রাখা যায় না।

চিরঞ্জীবের ছায়ায় আছে, তাইতেই কি অরক্ষণীয়া নামের সবটুকু ঘুচে যায়। দুর্গার মন, দুর্গার দেহ, কোথাও আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেতে চায়। দেবার জন্য যখন একজন হাত বাড়িয়ে থাকে আর একজন তখন হাতে তুলে না নিলে সে অরক্ষিতাই থেকে যায়।

চিরঞ্জীব চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে বলল, আমার ধর্মজ্ঞানের কথা বলছিস্? ব'লেও আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বলল, কাল আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?

—কলকাতায়? কেন?

—এমনি। একটু বেড়িয়ে আসবি।

—না।

মুখ না দেখা গেলেও, গলার স্বর শুনে বোঝা গেল, দুর্গা গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। বলল, তুমিই বা যাচ্ছ কেন, বুঝতে পারছি নে। তুমি কি অচেনা লোক নিকি যে, জিনিস নিয়ে গট্‌গটিয়ে গাড়ি চেপে যাবে?

চিরঞ্জীব বলল, মহকুমা শহর পার হ'য়ে আমি গাড়িতে উঠব। না গেলে নয়, কলকাতার লোকগুলো ভারী ছ্যাঁচড়া। টাকা পয়সা মেটাতে বড় গণ্ডগোল করছে কিছুদিন থেকে। তাই একবার নিজেই যাব। এসব গণ্ডগোল পাকিয়েছে জটা আর ওই মেয়েটা।

—কোন্ মেয়েটা?

—বীণা। সেজেগুজে ভদ্রলোকের মত বীণাই তো মোটরে ক'রে জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায়। চন্দনগরের আবগারি ওকে চিনেও ফেলেছে

—চিনল কেমন ক'রে?

—মেয়েটারই দোষ শুনিচি। অনেক বন্ধু জুটিয়েছে চন্দননগরে। আজ এর হাত ধরে সিনেমায় যায়। কাল ওর হাত ধরে চন্দননগরের স্ট্যাণ্ডের ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। কাপ্তেনরা সব প্যালা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। ছুড়ির মাথা ঘুরে গেছে। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। শুনি, আজকাল নাকি রোজ বাড়িও ফেরে না, চন্দননগরেই থেকে যায়। কোন্‌দিন শুনব, গঞ্জের মেয়েপাড়ায় গিয়ে ঠেকেছে।

—রাত ক'রে বাড়ি ফেরে না বলছ, ঠেকে যাওয়ার আর বাকী কী-আছে? কিন্তু এ সব করছে কে?

চিরঞ্জীব জানে, এ কথাটিই বলবে দুর্গা। এবং এর পিছনে যে-লোকটির নাম দুর্গা ইচ্ছে ক'রেই উহ্য রাখল, তাকে দল থেকে তাড়াবার কথা অনেকদিন বলেছে সে। কিন্তু তাড়ানো সহজ নয় জেনে, চিন্তিত মুখে নীরব থেকেছে চিরঞ্জীব। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

চিরঞ্জীব বলল, যাক্‌গে, সে সব কথা পরে হবে। অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘরে যা।

বিদায়ের আড়ষ্ট মুহূর্ত্তটা নতুন প্রসঙ্গে ভুলে গেছে দুজনেই। কিন্তু রাতটুকু এমনি উঠোনে দাঁড়িয়ে পুইয়ে গেলেও ক্ষতি কী? দুর্গার একলা অরক্ষিত জীবনের সেটা খুব বড় লাভ না হোক, ছোট একটি সান্ত্বনা বোধ হয়।

সেসব কথা না ভেবেও, দুর্গা না ব'লে পারল না, তুমি যদি না জান সে কে, তবে আমার কাছেই শোন। এ সবের মূলে তোমার ওই পয়লা নম্বর সাকরেদ জটিরাম। ওই জটা একদিন বারোটা বাজাবে, মনে রেখে দিও।

সে সন্দেহ চিরঞ্জীবেরও আছে। জটা যদিও তার দলভুক্ত তবু, ওর একটা স্বাধীন সত্তা বারেবারেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়।

চিরঞ্জীব বলল, হয় তো দলের বারোটা বাজাবে। কিন্তু, বীণার সঙ্গে নাকি জটার খুব ভালবাসা শুনতে পাই।

দুর্গা ফুঁসে উঠে বলল, ঝাঁটা মারি অমন ভালবাসার মুখে। পীরিতের নাম ক'রে এই পাকিস্তানের ছুঁড়িকে ঘরের বার ক'রে চোরাই চালানদারনী করেছে। এবার গিয়ে গাঁটছড়া বাঁধা হবে চন্দন-নগরের মেয়ে পাড়ায়। মেয়েটাকে খাটাবার তালে আছে, বুঝি না আমি?

কথাটা কোথায় গিয়ে যেন লাগল চিরঞ্জীবের। অন্ধকারের মধ্যে সে তীক্ষ্ণ চোখে দুর্গার মুখ দেখবার চেষ্টা করল। বীণাকে ঘরের বার ক'রে, চোরাই চালানদারনী করেছে জটা। কথাটা দুর্গা শুধু জটা আর বীণার কথা ভেবেই বলেছে কিনা কে জানে। কিন্তু কথাটা বাঁকা বঁড়শীর মত ঘুরে যেন একটি ইঙ্গিত নিয়ে চিরঞ্জীবের মনে বিঁধল। গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে রইল সে কয়েক মুহূর্ত্ত। তারপর ফিরতে উদ্যত হল।

দুর্গা আরো এগিয়ে এল। বলল, কি হল, রাগ হল নিকি ছোট্ ঠাকুরের।

প্যাডেলটা একবার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিল চিরঞ্জীব। বলল, না। কিন্তু আর রাত করব না।

দুর্গা বলল, দেখ বাপু, আমি কিন্তুন তোমার রাগের কথা কিছু কইনিকো। কাল তবে যাচ্ছ তুমি?

—হ্যাঁ।

চিরঞ্জীবের হাতে টর্চের আলো একবার ঝলকে উঠলো সামনে। আবার বলল সে, তোরও ধর্মজ্ঞান দেখছি খুব টনটনে। তোকে কিন্তু আমি এ পথে টেনে আনি নি। তুই নিজেই এসেছিস।

দুর্গা বলল, ও মা, ওদের সঙ্গে আমার কি কথা? ওদের মধ্যে নিকি ভালবাসা আছে বললে, তাই বললুম। আমাকে তোমাকে নিয়ে সে কথা কেন? আমি আমার বাপের পেশা ধরেছি।

চিরঞ্জীব আর একবার দুর্গার দিকে তাকিয়ে সাইকেলে উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। কোনো কথা বলল না।

অন্য সময় হ'লে বুঝি দুর্গা খিলখিলিয়ে হেসে উঠত। এখন এই নিশুতি রাত্রের অন্ধকারে, চিরঞ্জীবের চলে যাবার পর একলা দাঁড়িয়ে সে হাসতে পারল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

দক্ষিণের বাতাস উন্মাদ, তবু নিশ্বাস নিতে যেন একটু কষ্ট হল দুর্গার। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। শুকনো পাতার মর্মর অদৃশ্য প্রাণীর অস্তিত্ব যেন। দুর্গা ঘরে এসে খিল দিল। তারপর যেন রুদ্ধশ্বাসে, নিঃশব্দে, কাকে লুকিয়ে, চুপি চুপি ভংগীতে শুয়ে প'ড়ে, হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল।

যে-বাতিটি থেকে সহস্র প্রদীপ জ্বলে, তার নাম জীবন ও জন্মান্তর। সেই একটি বাতি যদি নিবিয়ে দাও, তবে মহানির্বাণের যাত্রা। কিন্তু হায়! বাঁকা বাগ্‌দির মেয়েটার চোখে, অন্ধকারেও সহস্র আলো দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলতে লাগল। বাঘিনী মেয়ের চোখের কোণ চুঁইয়ে মহাসাগরের লবণধারা উত্তরঙ্গ হ'ল।

চিরঞ্জীব বাড়ীর সামনে এসে সাইকেল থেকে নামল। যদিও সঠিক যুক্তি এবং ব্যাখ্যা নেই, তবু মনে মনে সে অশান্ত হয়ে উঠছে। রাগ করতে পারছে না। যদিও মনে করছে সে, দুর্গার ওপরে তার রাগ হয়েছে। একটা অস্পষ্ট বিক্ষোভে ধিকি ধিকি জ্বালা অনুভব করছে সে।

কিন্তু সাইকেল থেকে নেমে, সে একটু অবাক হল। দেখল, তার ঘরের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। গুলির কথা প্রথমেই মনে হল। কিন্তু গুলি তার ঘরে থাকে না। যদি বা কোনো কারণে থাকে, এত রাত্রে বাতি জ্বালিয়ে রাখবে কেন?

বাড়ির দরজা ব'লে কিছু নেই। বাঁশ ব্যাকারির আগল ঠেলে সে ঢুকল। এককালে দরজা ছিল। গজাল পোতা বড় দরজা। সেটা কোনো এককালের পতিতপাবন বাঁড়ুজ্জের গৌরব রক্ষা করত। হুগলি জেলারই কোনো এক রাজবাড়ির প্রধান আমলার আমলাত্ব এখনো এই ভাঙাচোরা পুরনো ইঁট বের করা একতলা বাড়িটার গায়ে ভূতের মত চেপে আছে। দক্ষিণাংশ অনেকদিনই প্রায় নোনা ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। নোনা ইট আর শুরকি খাওয়া ঘাস শেওলা বেড়েছে অবাধে। তেলাকুচ আর কুকুরছট্‌কে লতা গাছ দেয়াল যা পেয়েছে, সবকিছুকে জড়িয়ে দুর্ভেদ্য হ'য়ে উঠেছে। সাপ গোসাপ আর চোখ-খাবলারা বাসা ক'রে সুখেই আছে তাদের নির্দ্ধারিত সীমানায়। পিছনের বাগানটা ঊর্দ্ধতন আর এক পুরুষ আগেই বিক্রী হয়েছে। দক্ষিণাংশের জমি আর ধ্বংসস্তূপও বিকিয়ে গেছে চিরঞ্জীবের বাবা। কোণঠাসা উত্তরাংশ বন্ধক ছিল। সেই বন্ধকী তমস্সুক মুক্ত ক'রে এনেছে চিরঞ্জীব। রাজমিস্তিরি লাগিয়ে কিছুটা বাসযোগ্যও করেছে। তাই এখন গাঁয়ের লোকে বলে, বলু বাঁড়ুজ্জের ছেলে নতুন বাড়ি করেছে। পতিতপাবন বাঁড়ুজ্জের গৌরব বুঝি আবারো বা ফিরে আসে বেআইনি চোলাই মদের উজান ঠেলে। আরো কিছু বলে, চোলাই মদের চেয়ে যে-কথা বলতে লোকের উত্তেজনা আরো বেশী হয়। বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ে, আর বলু বাঁড়ুজ্জের মেয়ে। যদিও সেকথা সাহস ক'রে সামনে উচ্চারণ করা আর শমনের সঙ্গে লড়া এক।

তবু একথা ঠিক, প্রপিতামহ পতিতপাবনের ভিটায়, নোনা ইটে নতুন পলেস্তরা, জীর্ণ মেঝের সংস্কার, আর নতুন দরজা জানালা, সবাইকে চমক লাগিয়েছে। বলু বাঁড়ুজ্জের বিধবার গায়ে আস্ত থান

দেখে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখেছে কেউ কেউ। দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেখে, সংসারের সত্য মিথ্যায় সংশয় দেখা দিয়েছে সকলের। অচল আর সচল টাকার মূল্যবোধ নিয়ে সবাই যেন নতুন ক'রে ফ্যাসাদে পড়েছে।

বারান্দায় উঠে চিরঞ্জীব বুঝল, দরজায় শিকল তোলা নেই। প্রতিদিন তাই থাকে। ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে ভিতরে। জিনিস-পত্র এমন কিছু থাকে না, যা চুরি হ'তে পারে। শেয়াল কুকুরে ভাত খেয়ে যেতে পারে, সেই ভয়ে চিরঞ্জীবের মা, শিকল তুলে রাখে। জেগে থাকবার দরকার হয় না মায়ের। যদিও মা জেগেই থাকে। দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে। ছেলের খাওয়া দেখার জন্যেই কিনা কে জানে। তবে এসময় ছাড়া যেহেতু চিরঞ্জীবের সঙ্গে সংসারের কাজের কথা বলার সময় থাকে না, সেই হেতু মা'কে আসতেই হয়। সংসারের কাজের কথার মধ্যে একমাত্র টাকা। বলতে হয় না। চিরঞ্জীব হাত বাড়িয়ে টাকা দিয়ে দেয়।

মা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে, রাখ এখানে।

অর্থাৎ মাটিতে। কারণ, চিরোকে ছোঁবে না। তারপর মাটি থেকে টাকাটা তুলে আচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে, কাল কি খাবি? মাছ আনাবো একটু? না হয়, কালতো রোববার, অজা পাঁটা মারবে বোধহয়। একটু মাংস এনে রেঁধে দেব?

চিরঞ্জীব বলে, যা হয় ক'রো।

এড়িয়ে না গেলে আরো কিছু সাংসারিক প্রসঙ্গ উঠতে পারে। ওঠেও তাই। যদি না, চিরঞ্জীব আগে থেকেই চাপা দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বাতিই বা জ্বলছে কেন। দরজা বা কেন ভেজানো। সাইকেলের সামনের চাকা দিয়ে দরজা ঠেলতেই দেখা গেল, তক্ত-পোষের ওপর একজন শুয়ে আছে। শিয়রের কাছে বাতি, কিছু কাগজপত্র, ফাউন্টেন-পেন। মেঝেয় জুতো, পেরেকে ঝোলানো জামা। দরজার শব্দে গেঞ্জি গায়ে লোকটি পাশ ফিরে তাকাল।

চিরঞ্জীব থমকে দাঁড়াল। বলল শ্রীধরদা' নাকি?

শায়িত ব্যক্তি বললেন, অসুবিধে হল?

এক মুহূর্তের জন্য চিরঞ্জীবের দৃষ্টি স্থির হল! কঠিন হ'য়ে উঠল বুঝি মুখের ভাব। ঘরে ঢুকে সাইকেলটা দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখতে রাখতে বলল, না, অসুবিধে না। আমাদের বাড়িতে এসেছেন, তাই জিজ্ঞেস করলুম।

সাইকেলটা রেখে একটু দূরে, মুখোমুখী দাঁড়াল সে। শ্রীধর ততক্ষণে উঠে বসেছেন। কালো, বলিষ্ঠ চেহারা। সামনের চুলে কিছু পাক ধরেছে। মুখের সব রেখাগুলি শুধু বয়সেরই নয়। জীবনধারণের ঝড় ঝাপটার চিহ্ন হিসাবেই অত্যন্ত অনাড়ম্বর মাঠে-খাটা মানুষের মত রেখাবহুল মুখ। চওড়া কপাল, মোটা ভ্রূর তলায় তীব্র এক জোড়া চোখ। রাজ্যসভার উনি স্থানীয় প্রতিনিধি। লোকে বলে এম, এল, এ।

শ্রীধরের চোখে ঘৃণা-মিশ্রিত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা দেখে, চিরঞ্জীব ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল। দূরের একটা জলচৌকিতে গিয়ে বসল সে। যদিও মশার উৎপাতে বসা প্রায় মুশকিল।

শ্রীধর বললেন, প্রকৃতিস্থ আছিস্? না কি শুয়ে পড়তে হবে?

মুখ না ফিরিয়েই চিরঞ্জীব জবাব দিল, অপ্রকৃতিস্থ হবার কী আছে?

শ্রীধর বিদ্রূপ করে হেসে বললেন, লজ্জার কি আছে? তুই মদ খেয়ে এলে, আমাকেই মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে। কিছু বলব না। তাই আগেই জিজ্ঞেস করছি, ঠিক আছিস কিনা?

চিরঞ্জীব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, আমি মদ খাইনে।

—বটে?

শ্রীধর হেসে উঠলেন হা হা ক'রে। বললেন, তুই যে পিয়ারী বাঈজীর মত কথা বলছিস্ রে? বাঈজীগিরি করি বটে, তা' ব'লে বেশ্যা নই। ঘরের বউয়ের চেয়ে একটুও কম নই।

শ্রীধরের হাসির রেশ থামবার পর চিরঞ্জীব বলল, ওসব ভেবে দেখিনি। তবে ময়রাও তো অনেক সময় মিষ্টি খায় না। সেরকম ধরে নিন।

শ্রীধর একটু গম্ভীর হলেন। লক্ষ্য করলেন আর একবার চিরঞ্জীবকে। বললেন, সেই মেয়েটার ওখান থেকে ফিরলি বুঝি?

—হ্যাঁ!

—কী যেন নাম মেয়েটার?

—দুর্গা।

—দুর্গা। তা' ভালই করেছিস্। মেয়েটার সাহস ছিল বরাবরই, খুব স্পষ্টবাদী। কয়েকবছর আগে, আরো ছোট থাকতে, আন্দোলনের সময় মেয়েটার তেজ দেখে অবাক হয়েছিলুম। ওইরকম একটা মেয়েকে জজাতে পেরেছিস, তোর সুবিধেই হবে।

চিরঞ্জীব চুপ। শক্ত হ'য়ে, মাথা নীচু ক'রে বসে রইল সে।

শ্রীধর বললেন, মেয়েটার খুব নামডাকও হয়েছে আজকাল শুনতে পাই। আর তোদের দুজনের নাকি—

কথা শেষ হবার আগেই শ্রীধরের হাসি ফেটে পড়ল। আবার বললেন, তা বেশ করেছিস। এসব পথে ওরকম জুটি নিয়ে না নামলে ঠিক সুবিধে হয় না। তবে, মেয়েটা কি ক'রে তোর সঙ্গে এ পথে আসতে রাজী হ'ল, ভেবে পাইনা।

ঠোঁটের ওপর উপ্‌ছে আসা কয়েকটি তীক্ষ্ণ কথা চিরঞ্জীব দাঁতে কামড়ে ধরল। তার বলতে ইচ্ছে করছিল, আপনারা রক্ষা করতে পারলেন না, তাই রাজী হয়েছিল। কিছু না ব'লে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, দরজা বন্ধ ক'রে তা' হ'লে আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি পাশের ঘরটায় যাচ্ছি।

শ্রীধর বললেন, সেখানে তোর এক শাকরেদ রয়েছে।

—ওর কাছেই শুয়ে পড়ব।

—খাবিনে? তোর খাবার ঢাকা রয়েছে যে?

—খেয়ে এসেছি দুর্গার ওখানে।

—ও! বেশ বেশ! ওকে বাড়িতে এনে রাখলেই পারিস। মিছিমিছি আর ও পাড়ায় একলা ফেলে রাখা কেন? নাকি আরো কিছু ব্যাপার আছে!

দুর্বিনীত বলে যার এত কুখ্যাতি, সেই চিরঞ্জীবকে রীতিমত শালীন ও শান্ত মনে হ'ল। সে বলল, সেকথা শুনে আপনার আর কি লাভ হবে।

ইচ্ছে থাকলেও শ্রীধরকে আগের মত দাদা বলে ডাকতে পারল না চিরঞ্জীব। কিন্তু শ্রীধর শুধুই হাসছিলেন না। তার হাসির ধারে ধারে অঙ্গারের আভা ধিকি ধিকি জ্বলছে। আবার বললেন, এইবার আস্তে আস্তে রেসপেক্‌টেবল ভদ্রলোক হ'য়ে উঠবি। পয়সা আসছে হাতে, তাইতেই সব অপরাধ চাপা প'ড়ে যাবে। কোন্‌দিন দেখব, মন্ত্রীদের টিকিট নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ভোটে নেমে পড়েছিস্। তোফা।

চিরঞ্জীব একথারও কোনো জবাব দিল না। জিজ্ঞেস করল, খেয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ, ওটা কলকাতা থেকেই সেরে এসেছি।

পাশের ঘরটায় ঢোকবার আগে আর একবার থামল চিরঞ্জীব। মুখ না ফিরিয়েই বলল, কিন্তু কেন এসেছেন, তা তো বললেন না।

শ্রীধর বললেন, সে কৈফিয়ৎটা অবশ্য দেয়া দরকার। তোর কাছে আসব বলেই আসিনি। বিমলাপুরে কাল একটা কৃষকসভা আছে। আমার আসবার কথা ছিল সকাল সকাল। আসতে পারিনি। লাস্ট ট্রেনে এসে পড়েছি, গরুর গাড়ি নিয়ে যাদের থাকবার কথা ছিল, তাদেরও খুঁজে পেলাম না। কাল সকালে আসব মনে ক'রে তারা হয়তো চলেই গেছে। কাছাকাছি রাতটা কাটাবার মত এখানেই এসে পড়লাম। অবশ্য আরো জায়গা ছিল। তবে, তোর এত নাম ডাক, ভাবলাম, একটু দেখেই যাই।

চিরঞ্জীব তখন পাশের ঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য। দক্ষিণ চাপা ভ্যাপসা গরম অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সে যেন ওঝার মার খাওয়া আহত সাপের মত আড়ষ্ট কিন্তু ক্রুদ্ধ গর্জনে ফুঁসতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বিষ টগবগ করছে। মাথা তুলতে পারছে না।

শ্রীধর আর চিরঞ্জীব, দুজনেরই অলক্ষ্যে এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন চিরঞ্জীবের মা। চিরঞ্জীব আশার পর থেকেই দাঁড়িয়েছিলেন। আড়ি পেতে শুনছিলেন সমস্ত কথাই। শুনতে শুনতে বয়সের চেয়েও অবস্থার চাপে বৃদ্ধার কপালে কতগুলি রেখা কিলবিলিয়ে উঠছিল। দু' চোখে তার ভয় ও রাগের যুগপৎ ছায়া কাঁপতে লাগল। চলে যাবেন ব'লে পিছন ফিরে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। ওদের কথা শেষ না হ'লে যেতে পারছেন না।

চিরঞ্জীবের গলা আবার ভেসে এল অন্ধকার ঘর থেকে, দেখে যাবার আর কি আছে।

শ্রীধর অন্ধকার দরজাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখে যাবার আছে বৈ কি! তুই এখন নাকি ভিলেজ লাইট। কিন্তু একটা বিষয়ে বোঝাপড়া করার ছিল তোর সঙ্গে। ওখানে গেলি কেন? এখানে আয় না।

—বলুন না আপনি।

—মুখ না দেখলে বলি কেমন করে? লজ্জা যদি তোর সত্যি করে, তা'হলে আড়ালেই থাক। কিন্তু আছে বলে আমার মনে হয় না। থাকলে, দু' তিনটে গাঁয়ের গরীব চাষী মজুরগুলোকে তোর এ পাপ ব্যবসায় টেনে নামাতে পারতিস না।

চিরঞ্জীব এবার দরজায় এসে দাঁড়াল। এবার সে চোখ তুলে তাকালো শ্রীধরের দিকে। বলল, টেনে নামিয়েছি কি রকম?

শ্রীধর চিরঞ্জীবের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, এতক্ষণে তোর গায়ে লেগেছে দেখছি। ভেবেছিলুম ওই অক্রুর দে কর্তাদের রাজনীতি করে, মদের ব্যবসাও করে। গাঁয়ের গরীব

মানুষদের এ পথে টেনে আনতে পারলে ওর সবদিক দিয়েই লাভ। তাতে অক্রুরের সঙ্গে আমাদেরও বিরোধ। গরীব কিষানদের ধরে ধরে তো আর মারতে পারি না। বোঝাতে পারি। তবু পেটের দায় সামলাতে না পেরে তারা ওর শিকার হয়। আমার নিজেকে গিয়ে এস ডি ওর কোর্টে ওই লোকগুলোকে জামিন দিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। এম, এল, এ হয়ে আমাকে বেআইনী মদের স্মাগলারদের জামিনদার হতে হয়। লোকে বোঝে না, আমার কোন কৈফিয়ৎ নেই। কিন্তু ওদের ওই অবস্থায় আমি ফেলে আসতেও পারি না। তাতে যে যাই মনে করুক। কিন্তু তুই? তুই কি বলে ওই লোকগুলোকে তোর দলে ডেকে আনিস।

চিরঞ্জীবের ঠোঁট ততক্ষণে শ্লেষে বেঁকে উঠেছে। বলল, গাঁয়ের গরীব কিষেণদের ওপর আপনার দেখছি অগাধ বিশ্বাস। ওকুর দে কি করে না করে জানিনে। কিন্তু আপনার ওই গরীব কিষেণরাই যেচে এসে এসব কাজ করে। তাদের ডেকে আনতেও হয় না। টেনে নামাতেও হয় না এ পথে। আমাদের ইচ্ছে না থাকলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তারা পরামর্শ দেবে, ফিকির বার করবে, কোথায় কি করা যায়।

—মায়ের কাছে মাসীরবাড়ির গল্পো করিসনে চিরো। ওদের ঘরে টাকা গজগজ করছে কিনা, যে ওরা মনকে মন কয়লা আর গুড় কিনে নিয়ে এসে চোলাই করতে বসে যাবে। ওসব তোরা সাপ্লাই না করলে ওদের ক্ষমতা কি যে ওরা মালপত্র এনে চোলাই করবে? যাদের আধ পয়সার মুরোদ নেই, তাদের পাই পয়সাও কেউ ধার দেয় না। ওসব আমরা জানি।

—ভুল জানেন।

—ভুল জানি?

চিরঞ্জীব ফুঁসে উঠে বলল, হাঁ, ভুল জানেন। আমরা কাউকে কাজ করাবার জন্য খুঁজে মরছি না। ওরা নিজেরাই খুঁজে বার করে

আমাদের। না পেলে, নিজেরাই দল বেঁধে থালা ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে চাঁদা ক'রে পয়সা তুলে, জিনিসপত্র এনে চোলাই করে। এমন কি পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করতে পর্যন্ত ওরা পেছপা নয়। আপনি যখন ভাবছেন কৃষক বিপ্লব করবেন, ওরা তখন আপনাকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে।

কথাটা বলেই কেমন যেন থিতিয়ে গেল চিরঞ্জীব। ক্রুদ্ধ মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কিন্তু শ্রীধরের মুখে তখন আগুন জ্বলছে। বোধহয় সারা গায়েই হল্কা বইছে। বললেন, বাঃ এই তো, বুলি শিখে গেছিস। তাহলে ওই লোকগুলোকে তুই দলে না টেনে পারবিনা?

—আমার টানাটানির কি আছে? আমি অন্য দলেই ছিলুম। বরং এখন আপনার ওই কিষেণদের দলে ভিড়েছি। এসব কাজে আমার হাতেখড়ি যদি কেউ দিয়ে থাকে, ওরাই দিয়েছে।

—বাঃ! বাঃ!

বলতে বলতে শ্রীধর উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, তোকে জানোয়ার বলবো না মিথ্যাবাদী বলব, বুঝতে পারছি না।

—গালাগাল আপনি দিতে পারেন। যা সত্য, আমি তাই বললুম।

শ্রীধর অনেক পড়াশোনা করেছেন। তবু তিনি কৃষকেরই ছেলে। মার্জিত হয়ে চলা এবং বলাটাই সব সময় তার ধাতে নেই। তার কালো শক্ত শরীর জুড়ে একটি উদ্যত আঘাতের আক্রোশ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বললেন, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ছিলি, তাই লোকগুলোকে দেখছি তোর পুরোপুরি চেনা হয়ে গেছে। বেশতো, কাল চল্ বিমলাপুরের মিটিংএ। সেখানে দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলো বলে আসবি। দেখি একবার চিরো বাঁড়ুজ্জের সত্যবাদিতা।

—মিটিংএ দাঁড়িয়ে বলতে যাব কেন? ওখানেই কি সব সত্য মিথ্যা যাচাই হ'য়ে যায়? ও সবে আমার আর বিশ্বাস নেই।

কিসে তোর বিশ্বাস?

শ্রীধরের গলা চেপে এসেছে। কিন্তু চোখের দীপ্তিতে অঙ্গারের ঝিলিক। আরো দু' পা এগিয়ে এলেন তিনি চিরঞ্জীবের দিকে। ঈষৎ সামনে ঝোঁকা, মাঝারি লম্বা কালো চওড়া শ্রীধরকে ভয়ংকর মনে হল।

চিরঞ্জীব তার জীবনে বোধহয় এই প্রথম শ্লেষ-তীক্ষ্ণ চোখে শ্রীধরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। বলল, ওরা আপনাকে ভালবাসে, ওসব সভায় হয় তো আপনার কিছু কাজ হাসিল হয়। আসল সত্যমিথ্যে যাচাই হয় না।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত গর্জন ক'রে উঠলেন শ্রীধর, থাম! স্বর চেপে বললেন, রাসকেল! একটা নোংরা স্মাগ্‌লারের কাছে আমাকে রাজনীতি শিখতে হবে।

চিরঞ্জীব থামল না। এক পা'ও সরল না। সে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে শক্ত করে শ্রীধরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আমার কাছে রাজনীতি শিখবেন কেন? কিন্তু আমি থামবই বা কেন? আপনি কি মনে করেছেন, সেই দু'বছর আগের দিন আর আছে? অত আর সহজ নয়।

শ্রীধর কয়েক মুহূর্ত চিরঞ্জীবের দিকে স্থির চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিরঞ্জীবও চোখ নামাল না। শ্বাসরুদ্ধ করে শুধু বাইরে অপেক্ষমানা তার মা।

শ্রীধর ফিরে এলেন তক্তপোষের ওপর। এবার তারই মুখ না ফেরাবার পালা। নিজের ছায়াটার দিকে চোখ রেখে বললেন, কেন, গায়ে হাত তুলবি নাকি?

চিরঞ্জীবও তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে। বলল, দু' বছর আগে আপনিই গায়ে হাত তুলেছিলেন।

হ্যাঁ, গায়ে হাত তুলেছিলেন শ্রীধর। কিল চড় লাথি, যে-ভাবে খুশি, চিরঞ্জীবকে মেরেছিলেন। আর যারা কাছাকাছি ছিল, তারা এসে না ধরলে সে মারের পরিণতি কোথায় দাঁড়াত, বলা যায় না।

সেই প্রথম দিনের কথা। সেদিনও এই ঘরের মধ্যেই ঘটনা

ঘটেছিল। সংবাদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, চিরঞ্জীব চোরা-চোলাই মদের ব্যবসায় নেমেছে। শ্রীধরের নিজের হাতের সৃষ্ট বলা যায় চিরঞ্জীবকে। সেই ক্লাশ টেনে পড়বার সময় প্রথম তাকে চোখে পড়েছিল শ্রীধরের। বিমলাপুরে কৃষকদের ওপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। প্রতিবাদে বাঘের মত গর্জন করে উঠেছিল চিরঞ্জীব। কেউ তাকে শেখায়নি, কেউ তাকে বোঝায়নি। স্কুলের সমস্ত ছাত্র নিয়ে সে বিমলাপুরের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিল। গোটা বিমলাপুর তখন পুলিশের ঘেরাওয়ে বন্দী। পুলিশের সেই ব্যূহ ভেদ করতে এসেছিল সে তার বন্ধুদের নিয়ে।

পুলিশের তাণ্ডব যদিও অনেকগুলি গ্রাম জুড়েই চলছিল। কিন্তু বিমলাপুর ছিল কৃষক আন্দোলনের দুর্গ বিশেষ। তাই পুলিশ বিমলাপুরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। কৃষকরাও প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিল তাদের বিমলাপুরকে। কয়েকজন কৃষক মেয়ে পুরুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তবু জমিদার ও জোতদারদের কাছে হার মানেনি তারা। তারা লড়েছিল প্রাণপণে। মরেছিল অনায়াসে। যত আঘাত বিমলাপুরে, ততই সমাবেশ সেখানে। সারা ভারত যেমন একদিন চীৎকার করেছিল, চলো চলো দিল্লী চলো, তেমনি এই সারা জেলাটা সেদিন গর্জে উঠেছিল, চল চল বিমলাপুর চল। মুখোমুখী লড়াই হয়েছে। বন্দুকের সঙ্গে ঝাঁটা আর আঁশবঁটি, হেসো আর শাবল। অবরুদ্ধ বিমলাপুর তছনছ হয়েছে। তবু পুলিশের জয় হয় নি। গ্রাম শুদ্ধ মেয়ে পুরুষকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে তারা। কিন্তু 'ওদের' পায় নি। 'ওদের'—যাদের নির্দেশে সকলে প্রাণ তুচ্ছ করেছিল। গ্রাম্য মানুষগুলির আবহমানকালের ভয় মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত খসে পড়েছিল।

এক মাসের ওপর সমস্ত সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন বিমলাপুর। গরুর গাড়ির চাকাগুলিতে জং ধরেছিল। রাস্তায় পায়ের চিহ্ন পড়েনি মানুষ ও জানোয়ারের। অনেক ধান মাঠেই ঝরেছে। পায়রা আর

ইঁদুরেরই পৌষ মাস ছিল সেই বছরটা। গ্রাম ঘিরে শুধু গ্রেপ্তার আর জেরা। তবু বিমলাপুরের অভ্যন্তরে পুলিশ দিনের বেলায়ও নিশ্চিন্তে বিরাজ করতে পারেনি। তারা তাদের নিজেদের ছায়া দেখে চমকে উঠেছে। পৌষের শুকনো পাতায় গিরগিটির খস্‌খস্‌ চলাফেরায় থমকে গেছে। প্রায় জনহীন নিঃশব্দ বিমলাপুর। কিছু বুড়োবুড়ি শিশু আর অভুক্ত জানোয়ারগুলি ছিল। উৎকণ্ঠিত ত্রাসে গ্রামের পাখাগুলিও চলে গিয়েছিল বোধহয়।

তবু তার মাটির পরতে পরতে কী যেন চাপা ছিল। যেন, যে কোন মুহূর্তে ডিনামাইটের মত ফেটে পড়তে পারত।

পারত। পেরেছিল। কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে নয়। বিমলাপুরের বাইরে থেকে এসে ফেটে পড়েছিল। চিরঞ্জীবের ছাত্রবাহিনী একটি নতুন ডিনামাইট বাহিনীর মত এসে ফেটে পড়েছিল পুলিশব্যূহে। ভেদ করে ঢুকেছিল বিমলাপুরে। কাস্তে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাঠে মাঠে। এরকম একটি বিচিত্র বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না পুলিশ। আশে পাশের গ্রামের খবর শুনে গোটা মহকুমাটাই আবার নতুন ক'রে উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিল। চল, বিমলাপুর চল।

নীচুতলার গুপ্তাবাস ছেড়ে সেই প্রথম শ্রীধর চিরঞ্জীবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, চির আরাধ্য সেই ক্যাডার, তার চোখের সামনে জন্ম নিল।

আর চিরঞ্জীব মনে করেছিল, শ্রীধর দাসের দেখা পেলুম। স্নেহ ভালবাসা পেলুম। বিশ্বাস আর সম্মান পেলুম। আমার জীবন সার্থক হল। সব মিলিয়ে, একটি শিখার মত দপদপিয়ে উঠেছিল সে।

সেই বছরটা জয় হয়েছিল। তার জের লেগেছিল বছর দু'য়েক। কিন্তু জমিদার জোতদারদের প্রস্তুতি চলছিলই ভিতরে ভিতরে। তৃতীয় বছরেই তাদের আক্রমণের সামনে বিমলাপুরের দুর্গ অনেকখানি ধ্বংস হয়েছিল। সেই সময় বাঁকা বাগদীর মেয়ে দুর্গা হাজত খেটেছিল

মহকুমা জেল হাজতে। লাঞ্ছিত হয়েছিল পুলিশের হাতে। চিরঞ্জীব জেলে গিয়েছিল সেই বছর। ইণ্টারমিডিয়েট ফাইনালটা তার আগের বছর টাকার জন্য দিতে পারেনি। কলেজের মাইনে দূরের কথা, ট্রেণের মান্থলি কাটাও তার পক্ষে বহুদূর। বেঁচে থাকার সমস্যাটাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। বাবা মারা গিয়েছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরেই।

পুরনো নোনা ধরা দেয়ালের নতুন পলেস্তারায় দুটি ছায়া নিশ্চল হয়ে রয়েছে। দুজনেই ভাবছে সেই দিনগুলির কথা। কিন্তু চিরঞ্জীবের মা এখনো ফিরে যেতে পারেননি। তেমনই অন্ধকারেই বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথায় তার থান নেই। ছাই রং চুল বাতাসে উড়ছে। কিন্তু এখন আর সরু ছিদ্র দিয়ে ঘরের দিকে লক্ষ্য নেই। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তবু চলে যান না। যেন কোনো গুপ্ত তথ্য জানবার আশায় রয়েছেন। কিংবা যেন তার বিরুদ্ধে কোন গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয় শোনবার উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা।

পাখী সারা রাত্রিই ডাকে। জেগে থাকলেই তা থেকে থেকে শোনা যায়। ঝিঁ ঝিঁর ডাক যেন এ পৃথিবীর নিরন্তর প্রবাহের শব্দময় ধ্বনি। মধ্যরাত্রি পার হয়েছে। এখনকার বাতাস যেন গাঢ় ঘুমেরই আবেদনে বহমান। কিন্তু এখানে সবাই জাগে। ফুল পাতা নোনা ইঁটের গন্ধ চারিদিকে।

দু'বছর আগে সেদিনও রাত্রি ছিল। অন্ধকার ছিল। এমনি স্তব্ধতা ছিল। তবে রাত্রি এত গভীর ছিল না। শ্রীধর কৃষক সমিতির দুজনের সঙ্গে এসে দরজা ধাক্কা দিয়েছিলেন, চিরো, দরজা খোল্।

দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে পিছনের ঘরে মা থাকতেন। তিনি প্রথমে টেরও পাননি। টের পেলেও ওঠবার কিছু ছিল না। অনেকেই যাতায়াত করে চিরঞ্জীবের কাছে।

চিরঞ্জীব সবে শুয়েছিল। শ্রীধরের ডাক শুনে কেমন যেন থতিয়ে গয়েছিল সে। বাতি জ্বেলে দরজা খুলে দিয়েছিল। শ্রীধর ঘরের

চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই নাকি ইল্লিসিট লিকারের ব্যবসা ধরেছিস ?

এ ঘটনা জেল থেকে ফিরে আসার প্রায় চার বছর পরের কথা। শ্রীধরদা তখন সত্ত এম, এল, এ হয়েছেন। চিরঞ্জীব নাওয়া খাওয়া ভুলে ভোটের লড়াই করেছে। তার আর একটি জীবনের দরজা যে কখন কোন দিক দিয়ে খুলে গিয়েছিল, শ্রীধর টেরও পাননি। কেমন করে, কেন খুলেছে, সংবাদ রাখেন নি। যদিও এমন কাজের কার্য-কারণের সংবাদ রাখাটা জীবনের কোন মহৎ কর্ম নয় শ্রীধরদার পক্ষে।

চিরঞ্জীব দেখেছিল, শ্রীধরের ছু'চোখ জ্বলছে ভাটার মত। আজকের মতই বলিষ্ঠ হাত ছুটি নিষ্ঠুর শক্ত হয়ে উঠেছিল।

চিরঞ্জীব বলেছিল, হ্যাঁ ধরেছি।

—ধরেছিস্। বলছিস্ তুই, ও কাজ ধরেছিস্ ?

শ্রীধর দেখছিলেন, তার পরম বিশ্বাস তারই সামনে ধূলিসাৎ। একটা মিথ্যে কারসাজি করে সমস্ত নির্ভরতা মুখোমুখী বিশ্বাসঘাতকতার মত দাঁড়িয়েছে। চিরঞ্জীব আর দ্বিতীয়বার হ্যাঁ বলার অবসর পায় নি। শ্রীধর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা শ্রীধরকে জোর করে সরিয়ে এনেছিল। কিন্তু ততক্ষণে চিরঞ্জীবের নাক মুখ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে ঘরের কোণে। বাধা দেবার শক্তি তার ছিল না। প্রস্তুতও ছিল না অমন অতর্কিত দ্রুত আক্রমণের জন্য। মনে মনেও ছুর্বল ছিল সে।

বেআইনী চোলাই অনেকেই করে। কিন্তু শ্রীধর সবাইকে মারতে ছোটেননি। চিরঞ্জীবের প্রতি যেন তার জাতক্রোধ হয়েছিল। বারে বারে বলেছিলেন, ট্রেটার ! বিশ্বাসঘাতক !

তখন চিরঞ্জীবের মা' ছুটে এসে চীৎকার করতে যাচ্ছিলেন। শ্রীধর ধমকে বলেছিলেন, চেঁচাবেন না। অমন ছেলের চেয়ে ছেলে

না থাকা ভাল। আপনার একটা একদিকে গেছে। আর একটি আর একদিকে গেল।

আবার সঙ্গীদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার আগে বলেছিলেন, আজ থেকে তোর সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক শেষ। দরকার হলে পেছনে লোক লাগিয়ে আমরাই তোকে ধরিয়ে দেব। আগে বুঝতে পারি নি, তোরা তোর বোন তুই, তোরা এইরকমই। এসবই তোদের পেশা।

চলে গিয়েছিলেন শ্রীধর। মা এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন চিরঞ্জীবকে। চিরঞ্জীব ঝটকা দিয়ে মাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, সরে যাও।

—সরে যাব কি চিরো। ওরা যে তোকে—

কথা শেষ করতে পারেননি মা। চিরঞ্জীব চীৎকার করে বলেছিল, আঃ! বলছি সরে যাও এখান থেকে। চলে যাও। যাও।

মা দেখেছিলেন, চোখের কোল ফোলা, ঠোটের কষে, নাকে রক্ত চিরঞ্জীবের। কিন্তু তার দু'চোখে আগুন।

—চলে যাও বলছি এখান থেকে।

আর ভরসা পাননি থাকতে। চলে গিয়েছিলেন বাইরে। চিরঞ্জীব উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। নিভিয়ে দিয়েছিল বাতিটা। আঘাতের ব্যথা সে তেমন অনুভব করছিল না তখন। কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। শুধু শেষের কথাগুলি তার কানে বাজছিল, তুই, তোর বোন, এসবই তোদের পেশা।

সেই মুহূর্তে তার ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। একবার ভাবছিল, আমি এখুনি মহকুমা সহরে যাব। খুঁজে বার করব দিদিকে। ওকে কাটব, টুকরো টুকরো করব, তারপর ফেলে দেব গঙ্গার জলে। আবার ভাবছিল, না, শ্রীধরদা' কে ধরতে হবে গিয়ে। ওকে ছাড়ব না, দাঁতের বদলে দাঁত নেব ওর। রক্তের বদলে রক্ত। পরমুহূর্তেই বাবার মুখ মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, লোকটিকে জীবিত পেলে এখুনি নখে টিপে নিকেশ করতুম। তারপরেই মায়ের কথা মনে

পড়ছিল তার। ওই একটি মেয়ে মানুষ, দেখলে মনে হয় ভাজার মাছটি উল্টে খেতে জানে না। বড় ভাল মানুষ। কিন্তু পরতে পরতে ঢাকা নষ্টামো নোংরামো। কিছুই জানি নে, কিছুই বুঝিনে ভাব ক'রে যে সবই জেনে বুঝে চোখের সামনে অনেক অন্যায় ঘটতে দিয়েছে। অনেক পাপ ঘটতে দিয়েছে। শুধু মাত্র স্বার্থের খাতিরে, জেনে বুঝেও একটা সর্বনাশকে তিল তিল করে বাড়তে দিয়েছে। তারপর ঘটতে দিয়েছে শেষ সর্বনাশ। আমি ওই চোখ ছুটি উপড়ে নেব। ওই চোখ ছুটি, যে-চোখে অন্যায় এবং পাপ, স্নেহের ছদ্মবেশে মায়ের মত অসহায়তা চেপে থাকে। ওই গলাটা টিপে দেব। যে-গলার স্বরে ও কথায় ছদ্মবেশ।

কিন্তু অন্ধকার ঘরটায়, কোথাও এক পা' অগ্রসর হ'তে পারেনি চিরঞ্জীব। দরজার বাইরে মা আছে জেনেও, খিল খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। মুখের মধ্যে তার রক্ত না নোনা জলেই বুঝি ভরে উঠেছিল। থু থু ক'রে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঘরের মেঝেয়। দাঁতে দাঁত চেপে থরথর করে কাঁপছিল। দেয়াল ধরতে হয়েছিল তাকে। একটা মারখাওয়া গারদে আটকা মানুষের মত সে ফিসফিস করে বলেছিল, কী করব। আমি কী করব।

এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। গণতান্ত্রিক ভারতের নতুন গঠনতন্ত্র রচনা হয়ে গিয়েছে। সমাধা হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম নির্বাচন। জল জমেছে বাঁধে বাঁধে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাকি দেখিয়েছে প্রকৃতিকে। ইলেকট্রিক পাওয়ার জমছে, ফুলছে ফাঁপছে। বিজলীগাড়ি আর কল্পনায় নেই। বাস্তবের রূপ নিয়ে সে উপস্থিত হবে শীঘ্রই। পুবে পশ্চিমে কাটা হাত, উত্তরের মাথায় জটায় ঘুম ঘুম সংশয় ও দক্ষিণে সমুদ্রে ডোবা সূচগ্র পদযুগল ভারতবর্ষের ভূমিকা জুড়ে জীবনায়নের ছন্দ। উৎসবের নিনাদ তার নিটোল সূচীপত্রে। ভিতরের পাতায় পাতায় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

আর পশ্চিমবঙ্গের এক দূর গ্রামে, এক বাঙ্গালি যুবক মাথা কুটে জিজ্ঞেস করছে, আমি কী করব! আমি কী করব! এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। হয় তো এমনি একজন নয়, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে চিরঞ্জীবেরা মাথা কুটে জিজ্ঞেস করছে, আমি কী করব! আমি কী করব! নয়া ভারতের অহঙ্কার ছিল তাদের। বিশাল বেদী জুড়ে বিরাট যজ্ঞে তারা সামিল হবে ভেবেছিল। কিন্তু নয়া ভারত যে কোনদিকে মোড় ঘুরল, সেটা ওরা ঠাহর করতেই পারলে না। যেন বিপথে বিভ্রান্তরা অন্ধকারে হাতড়ে ফিরতে লাগল। কর্তৃপক্ষের সময় রইল না ওদের দিকে ফিরে তাকাবার। যাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারায় যজ্ঞটাকে নতুন মন্ত্রগানে ভিন্ন উৎসবে রূপান্তরিত করতে চাইল, চিরঞ্জীবেরা আসলে তাঁদেরই অনুগামী ছিল। কিন্তু তাঁদেরই একজনের হাতে প্রহার খেয়ে, রক্তাক্ত মুখে, অন্ধকারে বসে দূর গাঁয়ে কোনো এক কালের প্রগতিশীল যুবকটি, অদৃশ্য এক শক্তির কাছে আকুতি জানাচ্ছে, আমি কী করব! আমি কী করব!

জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ জীবন বসে থাকে না। প্রত্যহের জীবনধারণই সামগ্রিক যুগের একটি পরিণতি হয়ে বুঝি দেখা দেয়। প্রত্যহের বাঁচার সঙ্গে নয়াভারতের পথটা মিলল না। 'চোখ বোজো। চোখ বোজো হে ছেলেরা'। কোন এক জাদুকর এসে যেন বললে ওদের। 'চোখ বোজো, হাত পাতো, নয়া ভারতের প্রসাদ দিই তোমাদের। যা পাবে, তা চোখ মেলে পরে দেখতে পাবে।'

পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। কারুর সময় নেই। প্রতিদিনই বাঁচতে হবে। সবাই চোখ বুজে প্রসাদ নিল। চিরঞ্জীবেরা তাকিয়ে দেখল, কী পেয়েছে। বিচারের সময় নেই, প্রতিবাদেরও সময় নেই। ভেগে পড়, কেটে পড়। আরো অনেক, অনেক মানুষ আছে। সময় নেই, কারণ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে বাঁচতে হবে। দেহ দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে; রক্তের স্রোত জীইয়ে রেখে বাঁচতে হবে প্রতি পলে পলে।

চিরঞ্জীবেরা চোখ খুলে, হাত খুলে দেখল, কে কোথায় সরে গেছে।

প্রত্যহের তাগিদে তাঁরা ছিটকে গেছে রাষ্ট্রনায়কদের ছায়া থেকে। আর শ্রীধরদা'রা চলে গেছেন আর একদিকে। প্রত্যহের পা'য়ে পা'য়ে ওরা অন্য শরিকানায় গিয়ে উঠেছে। সেখানে ডাইনের পদাঘাত আর বাঁয়ের চপেটাঘাত ওদের সারা গায়ে মাথায় পড়ছে। এখন জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, আমি কী করব! আমি কী করব! যুগের পরিণতির আদর্শ দর্শনটা প্রতিদিনের মারে কোথায় হারিয়ে গেছে তখন।

চিরঞ্জীব যখন অমন রাগে ও দুঃখে জিজ্ঞেস করছিল, আমি কী করব, জানত না, আসলে অদৃশ্যে ওর সামনে শ্রীধরেরই মূর্তি ছিল। আর সেই মুহূর্তে ওর শিরফোলা ঝাপ্‌সা চোখে প্রত্যহের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছিল একটি যুবতী। সুন্দর বড় বড় নখে যার রক্ত লেপা। তীব্র-রেখ্-ঠোঁট রক্তাক্ত। কপালে এলিয়ে পড়া তার চুল। কপালে জ্বলজ্বলে রক্ত টিপ্, সীঁথিতে দগ্‌দগে ঘায়ের মতো সিঁদুর। হাতে তার মদের পাত্র। সে হাসছে খিল্‌খিল্ করে। উদ্ধত উত্তাল বুকে তার মরণের দোলা কাঁপছে থরথর ক'রে। সাপের মত পিছল সিল্‌ক্ শাড়ি তার ক্ষীণ কটিতটের অলস বন্ধন খুলে যেন ব্রহ্মার সেই বিশাল যজ্ঞবেদীর লেলিহান শিখা জ্বলে উঠতে চাইছে। মুখে মদ নিয়ে সে কুলকুচো ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সেই উচ্ছিষ্ট পানীয় পেয়ে, তার পায়ের নীচে কীটেরা প্রাণ পাচ্ছে উল্লসিত হচ্ছে!

চিরঞ্জীব ওর রক্তাক্ত মুখটা দু'হাতে লুকিয়ে চীৎকার দিয়ে উঠেছিল, দিদি। দিদি। পরমুহূর্তেই ওর মুখটা ভয়ংকর হ'য়ে উঠেছিল। না, কাউকে আঘাত করতে ছুটে যায়নি সে। শুধু নিজেকে জবাব দিয়েছিল, যা করছিলুম, তাই করব। আরো আটঘাট বেঁধে, নিপুণভাবে, আরো বহুদূর ছড়িয়ে।

প্রত্যহ, প্রত্যহ, প্রত্যহেরই জয়। চিরঞ্জীব বাতি জ্বালিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে মুছে, শান্তভাবে শুয়ে পড়েছিল।

সেই দৃঢ় নিষ্ঠুর ভয়ংকরতাই যেন আজ আবার ফুটে উঠল

চিরঞ্জীবের মুখে। শ্রীধরের দিকে চোখ তুলে সে বলল, বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করার কী দরকার। শুয়ে পড়ুন, আমিও শুতে যাই।

শ্রীধরের মুখে ক্রোধের ছাপ নেই। কিন্তু বিদ্বেষ তার চোখে মুখে, গলার স্বরে। বললেন, তা'হলে আমার কথার কি এই জবাব হ'ল?

—আপনার আবার কথা কী?

—বোঝা যাচ্ছে না? গাঁয়ের গরীব কিষেণ মজুরগুলোকে তোর ওই—

—আমার কিছু নয়। আপনি কৃষক নেতা, এসেম্বলীতে আপনি তাদেরই এম, এল, এ। আপনি আমাকে না বুঝিয়ে তাদেরই বোঝান গে। তবে একটা কথা বলে রাখি। রাতবিরেতে আবার যদি কোনদিন এসে পড়েন, তবে আমাদের বাড়িতে না হোক, কাছাকাছি অন্য কোথাও থেকে যাবেন। একলা বিমলাপুর যাবেন না। নিদেন দুচারজন লোক সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

বিদ্রূপে শাণিত হ'য়ে উঠলেন শ্রীধর। বললেন, কেন, মারবি নাকি?

চিরঞ্জীব বলল, আমি মারব না। আপনার ওই গরীব কিষেণ মজুররাই হয়তো আপনাকে ফাবড়া ছুঁড়ে মেরে ফেলবে। রাতে তারা তাদের নেতাকে চিনতে পারবে না। বিদেশী আন্‌কা লোক ভেবে হয় তো আপনাকেই খুন ক'রে, আপনার পকেট লুটবে। দিন কাল খুবই খারাপ।

শ্রীধরের শ্লেষ তাতে চাপা পড়ল না! বললেন, বটে! জানা ছিল না তো।

চিরঞ্জীব শান্তভাবেই জবাব দিল, কেন, খবরের কাগজে তো ছাপা হয় এ সব সংবাদ। মফঃস্বল সংবাদেই পাবেন। চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানিতে শহরের চেয়ে গাঁয়ের লোকেরা বিশেষ পিছিয়ে নেই। প্রায় রোজকার ঘটনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর করেই বা কি লোকগুলো। পেটের জ্বালা আছে তো।

—আর তোরাই তাদের নেতৃত্ব করছিস্।

—না। আমরাই তাদের কাছে শিখছি।

—এই মিথ্যেরও জবাব আছে চিরো। মনে রাখিস, যাদের ওপর দোষ দিচ্ছিস্ একদিন তাদের হাতেই তোদের মত লোকের মরণ আছে।

—তার অনেক দেরী।

শ্রীধরের কাছে .কথাটা কি দৈববাণীর মতো শোনালো? তার চোখে যেন একটি চকিত হতাশার ছায়া খেলে গেল। শ্রীধরের মতো সারা জীবন ধরে কষ্টভোগী লোক, আশাবাদী রাজনৈতিক কর্মীও যেন চোলাই মদের স্মাগলারের দৃঢ় কঠিন স্বরে মনের কোথায় ঘা' খান। পরমুহূর্তেই ঘৃণামিশ্রিত শ্লেষে বলে উঠলেন, সে-দিনক্ষণের পাঁজিও দেখে রেখেছিস নাকি?

চিরঞ্জীব আজ কোনো জবাব দিতেই ছাড়ল না। বলল, পাঁজি পুঁথি চিরদিন আপনারাই দেখে এসেছেন। গণৎকারের কাছে আপনাদের ভবিষ্যতের কথা আপনারাই বলেন। আমি যা দেখি তাই বলি।

শ্রীধর বললেন, কি জানি। এ সব কথাও হয়তো আজকাল বিহারী মিত্তিরের কাছে শিখছিস্।

বিহারীলাল মিত্র ছিল শ্রীধরের নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দী। পরাজয় হয়েছে তার।

চিরঞ্জীব বলল, তা কি ক'রে হবে? ওদেরই রাজ্য, ওদের হাতে আইন, চোলাইকরকে ওরা কখনও শেখাতে আসে?

—আজ আসে নি, কাল আসবে, চাপা থাকবে না কিছুই। ভোট আসুক, কিছু একটা আন্দোলন হোক্, চোর ডাকাত গুণ্ডা চোলাই-করেরা সামিল না হ'লে বিহারী মিত্তিরদের আর রইল কারা?

ব'লে শ্রীধর হাসলেন। একটু বুঝি থতিয়েই গেল চিরঞ্জীব। কথাটার মধ্যে সত্যের একটা এ্যাসিড্ জাতীয় তীব্র গন্ধ ছিল। চোলাইকর অক্রুর দে বিহারী মিত্তিরের সহায়ক।

শ্রীধরের হাসিটা তখনো থামেনি। ভিতরের চেপে রাখা রাগ নিশব্দ খ্যাপা হাসির ছদ্মবেশে যেন ফুঁসতে লাগল। বললেন, সেদিন শুনব হয় তো, তুই প্রগ্রেসিভ কিংবা লেফটিস্ট স্মাগ্লার।

বলতে বলতে শ্রীধরের মোটা গলার হাসিটা নিশুতি স্তব্ধতায় ফেটে পড়ল। ফেটে পড়ল চিরঞ্জীবেরই অশান্ত ক্ষুব্ধ বুকে। কারণ বিহারী মিত্তিরের সঙ্গে যে কোনদিন চিরঞ্জীব হাত মেলাতে পারবে না, এ কথা শ্রীধর 'বোধহয়' ভাল করেই জানেন। তবু খোঁচাচ্ছেন চিরঞ্জীবকে। এই বিহারী মিত্তির যখন চিরঞ্জীবের দিদির সঙ্গে শ্রীধরের নাম জড়িয়ে দুর্নাম রটিয়েছিল, তখন সে বিহারীকে খুন করতে চেয়েছিল। বলেছিল, ওকে খালধারের পাঁকে পুঁতে রেখে আসি। আপনি হুকুম দিন শ্রীধরদা।

শ্রীধর ধমকে বলেছিলেন, মাথা থেকে ওসব টেরোরিজমের পোকা-গুলো ঝেড়ে ফ্যাল্ দিকিনি। কথায় কথায় খালি দাঙা আর খুনোখুনি।

যদিও জানতেন, দাঙ্গা খুনোখুনি কখনোই চিরঞ্জীব করবে না। আসলে ওর ঘৃণা কোনো বাঁধ মানতে চাইত না। তা ছাড়া, লেফটিস্ট স্মাগলার ব'লে কোনো জীব যেমন থাকতে পারে না, তেমনি বিহারী মিত্তির আর অক্রূরদের দলের সঙ্গে কোনোদিনই চিরঞ্জীবদের মিল হবে না। রাগে অন্ধ হয়ে সে জবাব দিল, তা' দরকার হ'লে বিহারী মিত্তিরের সঙ্গেও হাত মেলাতে হবে। আপনার দরকার পড়লে, আপনিও আমাদের ডাকতে পারেন। বিহারী মিত্তিরের শত্রু, এ অঞ্চলের অনেক ডাকসাঁইটে বদমাসও তো আপনাকে ভোট দিয়েছে। নিজেরা দিয়েছে, দলের লোককে দিইয়েছে। তাতে কি আপনার উপকার কিছু কম হয়েছে।

—তারা চিরদিনই ওইরকম। তোর মত রাজনীতির ভান করেনি কেউ।

—আমিও আর রাজনীতি করিনে।

—পুরনো সুযোগটা ভোগ করছিস।

—না। কৃষকসমিতির দোহাই দিলে চোলাই মদ বিকোয় না।

—কিন্তু চিরঞ্জীব বাঁড়ুজ্জের একটা নামডাক ছিল, তার দলে লোক বেশি আসে।

—তা' ভোট দিয়ে, আর এ্যাসেম্বলীর বক্তৃতায় যখন পেট ভরে না, তখন আসবে বৈ কি।

এ বিতর্কের শেষ হবে না। শ্রীধর নিরস্ত হলেন। তার কথা চিরঞ্জীব আজ আর বুঝতে চাইবে না। যে-উদ্দেশে তিনি এত কথা তুলেছিলেন, গাঁয়ের সেই গরীব মানুষদের দূরে সরাবে না সে। গাঁয়ের শুধু গরীব মানুষই নয়, তিনি শুনেছেন প্রায় বাড়িতে বাড়িতে মদ চোলাইয়ের কাজ চলছে আজকাল। চিরঞ্জীবকে সামনে রেখে রাগে তিনি রুদ্র হ'য়ে ওঠেন। তবু শুধু বিস্ময় নয়, এক এক সময় ভয় পান শ্রীধর। সমস্ত গ্রামগুলি জুড়ে কি ভয়াবহ নৈতিক অবনতির লক্ষণ সব ফুটে উঠছে। এ যেন অনাবৃষ্টি হলেই মাঠ জুড়ে সব ধান খেতের মরণ। অভাব যত বাড়ছে, নৈতিক মান তত নামছে। চোখ বুজে থাকলেও এ সত্য গায়ে এসে খোঁচা দেয়। কিন্তু একি শুধুই অভাব? অভাব কি আর কোনোদিন ছিল না বাংলাদেশে? ছিল। কিন্তু এমন অস্থিরতা, এমন বিবেকহীন ধৈর্যহীন অন্ধ হয়ে ওঠা, গ্রামে গ্রামে আর কোনো যুগে 'বুঝি' দেখা যায় নি। শুধু চোলাই মদের স্মাগলারদের জামীন নয়, সময়ে সময়ে চুরি ডাকাতির কেসেও তাকে জামিনদার হ'তে হয়। কারণ সেইসব লোকেরা সত্যি শ্রীধরের আপনজন. কেউ কেউ কৃষক আন্দোলনের সহযোদ্ধা। আর সর্বক্ষেত্রেই তাদের নামে মিথ্যে কেস্ সাজানো হয় না। ঘটনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যি। প্রত্যহ নতুন নতুন দুর্ঘটনা। কারুর যেন ভাববার সময় নেই। সবাই যেন দিশেহারা হ'য়ে ছুটছে। ছুটে ছুটে বাঁচতে চাইছে। গায়ে যে আগুন লেগেছে, সেকথা মনে নেই। যত ছুটছে সবাই দিগ্‌বিদিকে, আগুন তত বাড়ছে, ছড়াচ্ছে, ফুঁসছে। অতি সাধারণ স্বাভাবিক

পারিবারিক ধ্যানধারণাগুলো পর্যন্ত দ্রুত ভাঙছে। নদী যেমন করে গতি বদলায়, স্রোত নয়া বাঁকে ফেরে, নতুন নতুন গ্রাম ভাঙে, গ্রাস করে, ঠিক তেমনি সব ভাঙছে।

শ্রীধর তার বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা যুক্তি দিয়ে সেই নতুন বাঁকে ফেরা চোরা নদীটিকে যেন পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারছেন না। শুধু এইটুকু জানেন, কর্তৃপক্ষের শাসনের পক্ষে এই অবনতিই সুবিধা-জনক। অন্তরে অন্তরে তারা এর সমর্থক। এ অবনতিকে তারা জীইয়ে রাখতে চায়। এই অবনতিই শ্রীধরদের পরাজয় ঘোষণা করবে।

কিন্তু গরীব মানুষগুলির, নিজেদের কি কোনো সত্বা নেই? নিজেদের কি কোনো ভাবনা অনুভূতি নেই। তিনি যে জানতেন, এ হাড় ভাঙে কিন্তু মচকায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, গরীবেরা বিপথে যাবে না, তারা লড়বে তাদের অবস্থার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ করবে। তারা কখনো বিশ্বাস হারাবে না!

কিন্তু এত অবিশ্বাস কোথা থেকে এল? কোন্ পথ দিয়ে আসছে? সেই চোরাপথের মুখটা কোথায়? অভাব? শুধু অভাব?

শ্রীধর শহরকে চেনেন না। গ্রাম তার অচেনা নয়। গ্রামের মধ্যবিত্ত জীবনের শিক্ষা সংস্কৃতি মিলিয়ে যে পারিবারিক সৌন্দর্যবোধ ছিল, সেগুলি কেন ভাঙছে? অভাব? শুধু অভাব? বিষেন-বাগের ইউনিবোর্ডের হাইস্কুলের হোস্টেলের ছেলেরা দল বেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করল কেন? তারা ক্লাশ নাইন টেনের ছেলে। চোদ্দ থেকে সতেরোর মধ্যে তাদের বয়স। তারা বোমা তৈরী করেছে, দেশী বন্দুক সংগ্রহ করেছে। হয় তো ক্লাশে বসে বসেই তারা প্ল্যান করেছে। তারপর ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। একজন দুজন নয়, তিরিশজনের দল। কেন? ওই ছোট ছোট ছেলেরা ডাকাতের দল করেছে কেন? এ কি শুধু অভাব?

দ্বিধার কাঁটায় আড়ষ্ট হয়ে থাকেন শ্রীধর। তবু নিরস্ত থাকবেন মনে করেও থাকতে পারেন না। চিরঞ্জীবের কথার জবাব না দিয়ে পারেন না। কারণ, তীক্ষ্ণ যুক্তি না থাক, ভবিষ্যতের একটি আশা হারাতে পারেন না। বললেন, ভোট আর এ্যাসেম্বলী পেট ভরাতে পারছে না ব'লে চোরের সাফাই গাইছিস। কিন্তু এদিন থাকবে না, বদলাবে। সেটা ভুলে যাস না।

—ভুলব কেন? আসুক সে দিন।

—এলেও, তোর কোন সুবিধেই হবে না। এতদিন মিটিংএ আমি তোদের কথা তুলিনি। কালকের বিমলাপুরের মিটিংএ তুলব। তোদের নাম ক'রে ক'রে বলব সভায়, 'এদের তাড়াও গ্রাম থেকে। এদের ধরিয়ে দাও পুলিশে।'

চিরঞ্জীবের রাত্রি জাগা চোখে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত হাসি চকচকিয়ে উঠল। বলল: নতুন শ্লোগান?

—হ্যাঁ, নতুন শ্লোগান।

—চেষ্টা ক'রে দেখুন।

শ্রীধর তার কিম্ভুত বিশাল ছায়াটা নিয়ে তক্তপোষের দিকে এগিয়ে গেলেন। বালিশের পাশ থেকে রিস্টওয়াচটা তুলে দেখলেন, রাত্রি আড়াইটা বেজে গেছে। তবু তিনি শুতে যেতে পারছেন না। লক্ষ্য করলেন, চিরঞ্জীব মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরে যাবার উদ্যোগ করছে। মুখ না ফিরিয়েই শ্রীধর ডাকলেন, চিরো।

চিরঞ্জীব নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ চোখে ফিরে তাকাল। চোখে মুখে তার উত্তেজনার আগুন। দু'বছর আগের মার খাওয়া সেই রাত্রির মুখটাই যেন। কঠিন নিষ্ঠুর সেই দৃঢ়তা। এক পা'ও পিছনে নয়, আরো শক্ত পায়ে সে এগুবে। কারণ মরণের বড়ো ভয় নেই তার।

কিন্তু শ্রীধরের গলায় রাগ বিদ্বেষ আর নেই। ব্যথা থাকলেও তার কালো শক্ত মুখে সে-ছাপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবু ডাকের মধ্যে যেন একটি পুরনো সুর ফুটে উঠল।

শ্রীধর চিরঞ্জীবের দিকে ফিরলেন। গলা অনেকখানি নরম হ'য়ে উঠল তার। বললেন, কমলার কোনো খবর জানিস নাকি?

উত্তেজনাটা কমল না চিরঞ্জীবের। কিন্তু চকিতে একবার চোখা-চোখি ক'রেই, দৃষ্টি নামাল সে। প্রায় অস্ফুট গলায় জবাব দিল, না।

শ্রীধরের চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। বললেন, কোনো খবরই নেই? শুনেছিলুম, সদরেই আছে।

চিরঞ্জীব বলল, আমিও তাই শুনেছি।

শ্রীধর আবার বললেন, তোর লোকেরাও কোনো খবর রাখে না?

চিরঞ্জীব মুখ না ফিরিয়েই বলল, হয়তো রাখে। আমাকে বলতে সাহস পায় না।

বাইরের অন্ধকার বারান্দায় চিরঞ্জীবের মা এবার পুরোপুরি দরজার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তার দুই চোখে অনেক কথা ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। রেখাবহুল ঠোঁট কেঁপে উঠল। ঘরের ভিতর আসবার জন্য বুঝি পা' বাড়াতেও যাচ্ছিলেন।

পরমুহূর্তেই সভয়ে পেছিয়ে এলেন যেন। থানের আঁচল চাপ-লেন মুখে। পা'য়ে পা'য়ে ফিরে গেলেন এবার নিজের ঘরে। আঁচলটা আরো জোরে চাপতে লাগলেন। কারণ একটা তীব্র শব্দ কমলার নাম ধরে তার বুকের ভিতর থেকে উঠে যেন এ রাত্রিকে বিদীর্ণ করতে চাইছিল। কারণ, কমলার খবর শুধু উনিই জানেন। উনিই রাখেন। কিন্তু ও-নাম তাকে আর উচ্চারণ করতে নেই।

ঘরের মধ্যে শ্রীধর আবার বললেন, ভাবব না মনে করি। তবু মন থেকে যায় না। এখনও অবাক লাগে, বিশ্বাস হয় না। কেমন করেই বা হবে? কিন্তু পৃথিবীতে দেখছি সবই ঘটতে পারে। আমরা ভাবতে পারি আর না পারি।

একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, যা, শুয়ে পড়্‌গে। আমি আর ঘণ্টাখানেক বাদেই বেরিয়ে পড়ব। কলকাতার মাল নিয়ে যে সব গরুর গাড়ি আসবে, তাদেরই একজনকে ধরে চলে যাব।

চিরঞ্জীব বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কিন্তু সে শুতে পারল না। দিদির কথা মনে পড়ছে তার। দিদির নাম কমলা। দিদির সব খবরই জানে সে। সে জানে, দিদি সদর শহরের, গঙ্গার ধারে সেই পাড়াতেই আছে। সেই পাড়াতে যারা থাকে, তাদের মতই আছে। সেই পাড়াতে এখন ওর খুব নাম। লোকে বলে, মক্ষীরাণী। কলকাতার লোক আসে তার কাছে। নিজেও কলকাতায় যায় সে রকম আমন্ত্রণ পেলে। সদর শহরের কাঁচা পয়সা এখন কমলার পায়ে স্তূপাকার।

পতিতপাবন বাঁড়ুজ্জের অন্দরমহল বাড়ির ইঁটে নোনা ধরেছিল অনেকদিন। বলু বাঁড়ুজ্জের আমলে সেটা কবে থেকে যে গোড়ার ভিৎ শুদ্ধ ক্ষয়ে গেছল, কেউ টের পায়নি। টের পাওয়া গেল সেদিন যেদিন সাতাশ বছরের অরক্ষণীয়া কমলা গৃহত্যাগ করল। আর একটি জায়গায় কোপ দিয়ে গেছল কমলা। সেটা হল এ সংসারের প্রতি চিরঞ্জীবের বিশ্বাসের মূল। সেই সময় চিরঞ্জীব কয়েক মাস লোক চক্ষে পালিয়ে বেড়িয়েছে।

কিন্তু দিদিকে চিরঞ্জীব ঘৃণা করতে সাহস করেনি। রাগ হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল। ঘৃণা করেছিল সে শুধু মা'কে। যে কথা বাইরের মানুষকে বলা যায় না, এমন কি আপন জনকেও বলা যায় না। সে কথা নিজের কাছে চাপতে পারে না কেউ। সে তার মায়ের লুব্ধ চোখে বারে বারে দেখতে পেয়েছে, দিদির মূল্যে এ সংসারের দায় মেটানোর বাসনা। চিরঞ্জীবের কথা বলার অধিকার সেখানে ছিল না। মায়ের আলাপের সূত্র ধরে গাঁয়ের যে সব সম্পন্ন লোকেরা এ বাড়িতে আড্ডা জমিয়েছিল, তাদের মুখের দিকে কোনোদিন ফিরে তাকাতেও ঘৃণা ছিল তার। সম্পর্কে তারা কেউ মায়ের দেওর, কেউ ভাসুর পো। চিরঞ্জীব তাদের কোনোদিন কাকা দাদা ব'লে ডাকেনি। তার গায়ের মধ্যে জ্বলছে রি রি ক'রে। ভিতরে ভিতরে একটি অপমানিত ক্রুদ্ধ শক্তি তার হাতের মুষ্টিতে দপ্

দপ্‌ করেছে। তার কানের মধ্যে তরল আগুনের স্রোত বয়েছে, যখন সে শুনতে পেয়েছে তার মায়ের গলা, কমলা, ও কমলা, অশ্বিনী ঠাকুরপোকে একটু পান দিয়ে যা।

তার আগেই মায়ের বলা থাকত, ফর্সা জামা কাপড় পরে, একটু সেজে গুজে যেন অশ্বিনী চাটুয্যের সামনে যায় কমলা। কারণ, আর কিছুই নয়, অশ্বিনীর চোখে যদি ভাল লাগে, তবে সে আরো দশটা লোককে বলতে পারবে, বিয়ের সম্বন্ধের জন্য। কিন্তু চিরঞ্জীব জানত, অশ্বিনী চাটুয্যে কোনদিনই দিদির বিয়ের সম্বন্ধ দেখবে না। আশা সে দেবে অনেক রকম। অভিভাবকত্বের ভান করবে রকমারি। কিন্তু বুকে-হাঁটা কেঁচো প্রবৃত্তি তার চোখে লালা হয়ে ঝরতে দেখেছে চিরঞ্জীব। অশ্বিনী চাটুয্যেদের যে-থাবা বরাবর বাগ্‌দিপাড়া কিংবা মুচীপাড়ায় হাত্‌ড়ে বেড়িয়েছে, সেই থাবার সাহস সর্বত্র অবাধ হয়ে উঠেছিল আগেই। দিদির সঙ্গে কথাবার্তা চাউনির হাবভাব মোটেই কাকার মত নয়। আর চিরঞ্জীবের বিশ্বাস, একথা তার মাও জানত। জেনে শুনেই পান দেবার ছলচাতুরি। সেজে গুজে কাছে যাবার নির্দেশ! নইলে, অশ্বিনী চাটুয্যের করুণার উদ্রেক করা যেত না বুঝি।

দিদি কেন যেত? কেন সাজত? ও কি বিশ্বাস করত, অশ্বিনী কাকা সত্যি ওর বিয়ে দিয়ে দেবে? সেকথা কোনদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারেনি চিরঞ্জীব। কারণ, জিজ্ঞেস করার রুচি এবং সাহস, কোনোটাই ছিল না। কিন্তু বুঝত, দিদিও বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না, তবু যেতে হত। অশ্বিনী চাটুয্যের পয়সার আগুন আর দানা এ বাড়ির হেঁসেলে ছিল। চিরঞ্জীবের পেটেও কি যায় নি?

কিন্তু মায়ের ভাষায় চিরঞ্জীব শুধু 'ছিধর চাষার, চাষা-সমিতির বিনে মাইনের ফোতো মোড়ল।' তার কিছু বলবার অধিকার ছিল না। কৃষক সমিতির কাজে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। কিন্তু বাড়ি এসে ওই আগুনই গুঁজতে হয়েছে পেটে। সে বিনা মাইনের

লোক ছিল, বিনা কাজের নয়। সমিতির কাছে পয়সা চাওয়ার কথা কখনো তার মনে হয়নি। পয়সা অবশ্য সমিতির ছিল না। ধান চাল ছিল কিছু। কৃষক সমিতির দরিদ্র সভ্যদের সেই ধান চাল নিজের হাতে ভাগ ক'রে দিত সে। নিজের জন্য আনা যায় কি না, একথা ভাবেনি কোনদিন। শ্রীধরও কোনোদিন কিছু বলেন নি এ বিষয়ে। শুধু চিরঞ্জীবের মত একটি কর্মীর জন্য তার গর্বের অন্ত ছিল না। আর এও নিশ্চয় ভেবে নিয়েছিলেন, কোনো কারণে কষ্ট হ'লে চিরঞ্জীব তাকে বলবে।

শহরে গিয়ে চাকরির সন্ধান করতে বলেছে মা। কিন্তু কৃষক সমিতি ছেড়ে যাওয়া যায় কেমন করে? আর শহরে কার কাছে গিয়ে সে চাকরির সন্ধান ক'রে বেড়াবে? তাই চিরঞ্জীব তখন সবদিক দিয়ে তার মা'য়ের চক্ষুশূল। আপন গৃহে পরবাসী বলা যায়।

তারপর শুধু আর অশ্বিনী চাটুয্যের একলার অধিকার থাকে নি, তাদের বাড়িতে, আরও কয়েকজনের আবির্ভাব হয়েছিল। তার মধ্যে মহকুমা আদালতে কেরানীর কাজ করত, রামনাথও ছিল। রামনাথ প্রায় সোনার পাথর বাটি। দেখতে সুপুরুষ, বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। নৈকষ্য কুলীন মুখুজ্জে। কিন্তু বিয়ে করেনি। দুর্নাম ছিল নানানরকম। গ্রামে আসা যাওয়া তার কমই ছিল। কিন্তু ভ্রমরকে বুঝি ফুলের সংবাদ কাউকে দিতে হয় না। সে নিজেই আসে। সে যখন চিরঞ্জীবদের বাড়িতে আসতে আরম্ভ করেছিল, অশ্বিনী চাটুয্যের বিষাক্ত জিভ তখনই লকলকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু অশ্বিনী চাটুয্যে পূর্ণিমার চাঁদ। রাত পোহালেই তার ক্ষয়। রামনাথ, প্রায় প্রথমার চাঁদ বলা যায়। যেখানে প্রতিদিনের আশা।

এখন চিরঞ্জীব বুঝতে পারে, দিদি সকলের সঙ্গে ছলনা করেছিল। রামনাথের সঙ্গে পারেনি। রামনাথকে সেও বিশ্বাস করেছিল। আশা করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল। হয় তো খুব সহজে

আশা করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এই গ্রামে, সাতাশ বছরের আইবুড়ো মেয়ের ভয়ংকর হতাশার কথা কে কবে ভেবেছে? তার ওপরে পেছনে যদি থাকে মায়ের প্ররোচনা।

এদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখেছিল চিরঞ্জীব, বাড়ি অন্ধকার। কিন্তু ঘর দুয়ার খোলা। বারান্দার এক কোণে মা। আর এক কোণে দিদি। মা স্তব্ধ। দিদি কাঁদছে ফুলে ফুলে! কেউ তার সঙ্গে একটি কথা বলেনি। এই মা মেয়েকে সে এমনভাবে কোনদিন বসে থাকতে দেখেনি। এই দুই বান্ধবীকে এত ফারাকে আর সেই ফারাকের মাঝখানে এমন দুর্লঙ্ঘ্য, সাপের মত হিংস্র, ভয়ংকর জটিলতা তার চোখে পড়েনি।

কেমন একটা ভয় শিসিয়ে উঠেছিল চিরঞ্জীবের বুকে। মনে হয়েছিল, তার আকৈশোর জীবনের ছন্দ অনেক আগেই কেটেছিল, টের পায়নি। সেইদিন মনে হয়েছিল, এইবার সত্যিকারের অন্ধকারের সামনে সে পড়ল। বদল হ'য়ে গেল তার পথ।

মায়ের সঙ্গে বথা বলার কিছুই ছিল না। সে কমলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, কী হয়েছেরে দিদি? কাঁদছিস কেন?

চুপচাপ। হয় তো কতদিনই কেঁদেছে দিদি অমন ক'রে। কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছে চিরঞ্জীব? কিন্তু একটু পরেই জবাব দিয়েছিল কমলা, চিরো, আজ কিন্তু কিছু রান্না হয়নি। কিছু যদি খেয়ে না এসে থাকিস বাইরে থেকে, তবে উপোস যাবি রাত্তিরটা।

মা বলে উঠেছিল, ফোঁপানো কান্নার সুরে, আর উপোস! এত বড় ছেলে, সে মেয়ের চেয়ে আমার বড় গলার কাঁটা। কাকে কি বলব!

মায়ের গলায় কেমন যেন তোষামোদের সুর মনে হয়েছিল। এবং সেটা চিরঞ্জীবকেই। তাতে আরো বেশী ঘৃণা হয়েছিল চিরঞ্জীবের।

কিন্তু আসল কথাটা তাকে বলেনি কেউ। সে যে ছোট, সেটা এ বাড়ির কেউ কখনো ভোলেনি। চিরঞ্জীবকেও কখনো ভুলতে দেয়নি। এ সংসারের কোনটা তখন সজ্ঞানে এড়িয়ে যায়নি চিরঞ্জীব। মা দিদির দায়িত্বের অজ্ঞতার দায়টাও তার একলার ছিল না। যদিও সে অবুঝ ছিল না। চারবিঘা ধান জমি শেষ সম্বল। সেটাও ভাগে ছাড়া চাষ করার উপায় ছিল না। তাতে যে কোনো সংসারেরই বছর চলে না, এ কথা বুঝতে বেশী বয়সের দরকার হয় না। তবু, চলে যায়, যাবেও, আজন্ম এই জানা কথাটা প্রায় ছন্দের মতই ছিল। সেটাই সে রাত্রে প্রথম কেটেছিল।

এখন ভাবলে অবাক লাগে। অথচ এই চিরঞ্জীব মণ মণ ধান ভাগ ক'রে দিত কৃষক সমিতির দুঃস্থ আর ভূমিহীন কৃষকদের। কার কি অবস্থা, সেই বিচারের ভার ছিল তার ওপরেই। কোনোদিন কেউ নালিশ করতে পারেনি তার বিচারের ওপর।

আসলে এই বুঝি হয়। ঘরে আর বাইরে, কৃষক আন্দোলন আর সংসার, দুটি আলাদা জীবন যেন। এদের যোগাযোগ ঘটাতে পারেনি সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ চিরঞ্জীব।

ছন্দে বেতাল বেজেছিল। সেই প্রথম দেখা ভবিষ্যৎ, যে চিরদিনই গাঢ় অন্ধকার সংশয় ও ভয় ও বিস্ময়ে আবৃত, তার সামনে যেন সহসা এসে দাঁড়িয়েছিল চিরঞ্জীব। কিন্তু দেরী হ'য়ে গিয়েছিল অনেক। ভবিষ্যৎটা তখন নরকের সদর দেউড়ি পার হ'য়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা বাজছিল নরকের!

শব্দটা কাঁপিয়ে দিয়েছিল চিরঞ্জীবকে, সেই রাত্রেই কমলার বমির শব্দে। কমলা ওয়াক তুলছিল। আর সেই শব্দের সঙ্গে তাল রেখে মা বলছিল, মরে যা, তার চেয়ে তুই মর্ কমলা। ওরে ঘুসকি, ছেনাল, রক্তে তোর বড় জ্বালা। তুই মর, মর।

দিদির কোনো কথা শোনা যায়নি। দেখে এবং জেনেই শুধু অভিজ্ঞতা হয় না। মানুষের আর একটা বোধহয় মন থাকে। সে

যেন কেমন ক'রে অনেক কিছু জানতে পারে। চিরঞ্জীব বুঝতে পেরেছিল, দিদি অন্তঃস্বত্তা।

সেই রাত্রে ঘুম হয়নি চিরঞ্জীবের। শ্রীধরের কাছে যেতে ইচ্ছে করেছিল তার। বলতে ইচ্ছে করেছিল সব কথা। কিন্তু পারেনি। আর সেই তার প্রথম মনে হয়েছিল, শ্রীধরদাও দিদির দিকে তাকিয়ে যেন কেমন দুর্বল হ'য়ে যেতেন। দিদির কথা পারতপক্ষে বলতেন না। যেন দিদির নামটা শ্রীধরদার নিতে নেই। কিন্তু দিদিকে একেবারে দুরাশা বলেই জানতেন তিনি। কারণ, শ্রীধরদারা সদ্‌গোপ। এর নাম বাংলা দেশের গ্রাম। কোনোরকম এদিক ওদিক হ'লে, এদেশে কৃষক আন্দোলন করা সম্ভব নয়। ভোট পাওয়া আরো দুরূহ। একে জাতের বিচার, তায় প্রেম। কর্মীকে পাত্‌তাড়ি গুটোতে হবে।

শ্রীধরদা যেন ভয়েই নীরব থাকতেন। কোনো কথা জিজ্ঞেস করতেন না। সমিতির বন্ধুরাই কে কখন কি মনে ক'রে বসবে।

পরে আর শ্রীধরকেও কিছু বলার অবকাশ পাওয়া যায়নি। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে প্রথম তার মায়ের কান্না শুনেছিল, ওরে চিরো, কম্‌লি কোথায় চলে গেছে।

গ্রামে রাষ্ট্র হ'তে দেরী হয়নি। তখন চিরঞ্জীবও কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়েছিল। শ্রীরামপুর চুঁচুড়া, চন্দননগরের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। দিদিকে খুঁজতে কিংবা ঠিক চাকরি খুঁজতেও নয়। সে কৃষক সমিতি করবে না। মা'র কাছে যাবে না। সে অন্য কিছু করবে। অন্য কোথাও থাকবে। এই ছিল তখন আপাত চিন্তা। সেটা কোনো সুষ্ঠুভাবে নয়। একটা অস্থির অবোধ ক্রুদ্ধ যন্ত্রণা ও ভাবনায় অচৈতন্য ঘোরের মত। কলেজে পড়া অনেক চেনা ছেলে ছিল ওই সব সহরগুলিতে। কিন্তু বেশীদিন ঠাঁই কারুর কাছেই পাওয়া যায়নি। খেয়ে এবং না খেয়ে ঘুরেছে ভবঘুরের মত।

ইতিমধ্যে আর শুধু রামনাথের রক্ষিতা নয়, কমলা যে পুরোপুরি

দেহোপজীবিনীর জীবন যাপন করছে, সে সংবাদও পেয়েছিল। শুধু জানা যায়নি, তার গর্ভের সন্তানটির কী পরিণতি হয়েছে।

তারপর দেখা হয়েছিল জটার সঙ্গে। যে-জটা এখন তারই দলভুক্ত হয়ে কাজ করে। চন্দননগরে, লক্ষ্মীগঞ্জের কাছে দেখা হয়েছিল জটার সঙ্গে। তাকে খাইয়েছিল আর একটা কাজ করতে দিয়েছিল। কাজটা এমন কিছু নয়। একটা সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে, গঙ্গায় নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে খেয়া নৌকায় পার হ'য়ে যেতে হবে ওপারে। গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। পরের খেয়ায় জটা পার হয়ে সাইকেলটা নিয়ে নেবে।

কারণ? সেটা পরে জানা গিয়েছিল। নির্বিঘ্নেই পার হ'য়ে গিয়েছিল চিরঞ্জীব! পরের খেয়ায় জটা এসেছিল। জটার সঙ্গে গিয়েছিল চিরঞ্জীব ওপারের চটকল শহরে। শহরেও বস্তি অরণ্যে যেখানে মাতাল হয়ে জুয়ার অন্ধকার গুহা থেকে কোনোদিন একলা বেরিয়ে আসার সাধ্য ছিল না চিরঞ্জীবের। সাইকেলের টায়ার খুলে, মদ ভরতি টিউব দুটো বার করেছিল। ফিরে আসার সময় কিছু প্রাপ্তিও হয়েছিল চিরঞ্জীবের।

সেই শুরু। ব্যাপারটা যে একেবারেই জানা ছিল না, তা নয়। কিন্তু অমন প্রত্যক্ষভাবে জানা ছিল না! বাঁকা বাগ্‌দি থেকে শুরু ক'রে, অনেককেই সে একাজে লিপ্ত ব'লে জানত। ভাববার দরকার হয়নি কোনোদিন। সেইদিন থেকে ভেবেছিল। গ্রামে ফিরে এসে, দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে কেন যেন তার দু'চোখ জ্বলে উঠেছিল অঙ্গারের মত। শক্ত হ'য়ে উঠেছিল চোয়াল।

অবিশ্বাস আর নৈরাশ্য তাকে ঘিরে ডাকিনীর মন্ত্র ছুঁড়ছিল। তারপর এসে ধরে ছিল দুই হাত। গ্রাস করেছিল সমস্ত চেতনা। শ্রীধরদাদের কথা কি একবারও মনে হয় নি? হয়েছিল। মনে হয়েছিল, সংসারে ওরকম দু'চারটে লোক থাকে। যেমন সাধুসন্ন্যাসী ধর্ম নিয়ে মজে থাকে, সেই রকম এরাও একটা কিছু নিয়ে থাকে।

কিন্তু নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস এমন জিনিস, সে চিরঞ্জীবকে আর দশটা সাধারণ মানুষের মত খেটে খাবার পথে নিয়ে যায়নি। কয়েকমাসের মধ্যে হুগলি জেলার ইল্লিসিট লিকার ম্যানুফ্যাকচারার এ্যাণ্ড্ স্মাগলার ব'লে কুখ্যাত হ'য়ে উঠেছিল। সবাই বলেছিল, এ সেই বাঁকা বাগ্‌দির আত্মা।

দূরে মালগাড়ির শব্দ শোনা গেল। চিরঞ্জীব উঠল। এখনো তার চোখে সেই আগুন। মুখটা যেন শক্ত, নিষ্ঠুর। পা দিয়ে খোঁচা দিল সে ঘুমন্ত গুলিকে। গুলি লাফ দিয়ে উঠল।

চিরঞ্জীব রুক্ষ চাপা স্বরে বলল, স্টেশনে চলে যা। মাল যাবার সময় হ'ল।

গুলি যেন ঘুমোয়নি, এত তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু চিরঞ্জীবের রুক্ষতায় একটু অবাক হ'ল সে। বাইরে তখনো বেশ অন্ধকার। হাওয়া আরো বেড়েছে। গোটা তিনেক 'খোকা কোথা' পাখী ডাকছে কোথায়। মাঝে মাঝে শোনা যায় কাকের ডাক। সেটা যেন খানিকটা জিজ্ঞাসা, 'রাত পোহালো ?'

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শ্রীধরের। বালিশের তলায় হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা বার করলেন। কিন্তু অন্ধকার। দরজা খোলা দেখে ব'লে উঠলেন, 'চিরঞ্জীব বেরিয়ে গেলি নাকি !'

বেরোয়নি। বেরোবার জন্য প্রস্তুত। জামা খোলা আর শোয়া হয়নি এ পর্যন্ত চিরঞ্জীবের। সে এ ঘরে এসে, সাইকেলে হাত দিয়ে বলল, হ্যাঁ বেরুচ্ছি। আপনি পরে বেরুতে পারেন। গরুর গাড়িগুলো এখন আসছে। ওদের ফিরতে ফিরতে ভোর হ'য়ে যাবে।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

চিরঞ্জীব এক মুহূর্ত চুপ। বলল, বাইরে। একটু দরকার আছে।

অন্ধকারের মধ্যে শ্রীধর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ফিরবি কখন ?

—ঠিক নেই।

—আচ্ছা, তুই যা, আমি বেরুচ্ছি। কিন্তু দরজা যে খোলা থাকবে।

—খোলাই থাকে।

॥ চার ॥

চিরঞ্জীব সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। একবার টর্চের আলো ঝলকে উঠল তার হাতে। পরমুহূর্তেই সাইকেলে উঠে, অন্ধকারে অদৃশ্য হল সে। খালধারের পথ দিয়ে এসে নামল সে একেবারে স্টেশনের অদূরে। একটি ঝাড়ালো, ঝুরি নামা বটের আড়ালে। গাছতলা থেকে স্টেশনের সামনের প্রশস্ত জায়গাটা দেখা যায়। সেখানে কাঁচা তরিতরকারি নিয়ে গরুর গাড়িগুলি ভিড় করেছে। হাতে হাতে ঘুরছে লণ্ঠন। গাড়ি খালি ক'রে ঝুড়িগুলি সব প্ল্যাটফরমে নিয়ে তুলছে। রাত্রি বারোটার পর থেকেই প্রায় প্ল্যাটফরমে মাল জমতে থাকে। সাড়ে চারটের প্রথম গাড়িতে কলকাতায় যাবার জন্যে।

চিরঞ্জীব দেখল, গাড়ির সিগন্যাল দিয়েছে। গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেলে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু—

হাতের মুঠি শক্ত হ'য়ে উঠল তার। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। সে ছিল গাছের পিছন দিকে। সহসা গাছের সামনের দিকে একটি মানুষের চকিত ছায়া যেন দেখতে পেল সে। নড়ে উঠল, কিন্তু সরল না। যেন টের পায়নি পিছনের মানুষটাকে।

সাইকেলটা নিঃশব্দে গাছে হেলান দিয়ে রেখে, রুদ্ধশ্বাসে একবার উঁকি দেবার চেষ্টা করল চিরঞ্জীব। ঠিক দেখা গেল না। টর্চ জ্বালার উপায় নেই। আশেপাশে কোথাও কাশেম অথবা ভোলা কেষ্টরা কেউ নিশ্চয় আছে। টের পেলে, সন্দেহ করতে পারে। ভাবতে পারে নিশ্চয় তাহলে কিছু যাচ্ছে কলকাতায়। অন্যথায় চিরঞ্জীব এখানে কেন? কিংবা কাশেম ভোলা কেষ্টদেরই কেউ এখানে ওৎ পেতে আছে।

সে হঠাৎ ছায়ার সামনে প'ড়ে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কে ?

জবাবে আপাত নির্বিকার কিন্তু উৎকণ্ঠিত গলা শোনা গেল, সর, কাশেমকে দেখা যাচ্ছে।

চিরঞ্জীব থতিয়ে গেল। দুর্গা দাঁড়িয়ে আছে। সে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু কাশেমকে দেখতে পেল না। কেবল, স্টেশনের টিমটিমে ভুতুড়ে আলো অন্ধকারে, চাবুকের মত ঝলকে উঠল টর্চের আলো। সেটাই প্রমাণ করল কাশেমের অস্তিত্ব। তা' হ'লে ভোলা কেষ্টও আছে। গতকাল ওকুরদের কয়েক ঝাঁকা ব্লাডার ভরতি মদ কাশেমই ধরেছে। আশা ছিল চিরঞ্জীবের, আজ আর কাশেম ভোর রাত্রে হানা দেবে না স্টেশনে। ভাববে, কাল যখন ধরা পড়েছে, আজ আর কেউ ঝাঁকায় মাল পাঠাতে সাহস করবেনা। এই সাধারণ ভাবনারই বশবর্তী হ'য়ে চিরঞ্জীব আজ দু'জনের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু কাশেম এসেছে বোঝা যাচ্ছে। তার টর্চের আলো ঝাঁকাগুলির বুকে ছোবলাচ্ছে সাপের মত। আর ওই ঝাঁকাগুলির কোনো দুটির মধ্যেই নিশ্চয় চিরঞ্জীবের জিনিস রয়েছে। সে-ঝাঁকাটিকেই সন্দেহ হচ্ছে, তারই গায়ে ছুঁচলো লোহার শিক আমূল বিঁধিয়ে দিচ্ছে। ব্লাডাব থাকলে ফেটে যাবে। বোতল থাকলে আঘাতেই টের পাওয়া যাবে।

যদিও এখনো গরুর গাড়ি থেকে ঝাঁকা তোলা হচ্ছে প্ল্যাটফরমে। এবং সবগুলিকে দেখা সম্ভব হয়ে উঠবে না কাশেমের পক্ষে। তবু শক্ত আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল চিরঞ্জীব। সে বুঝতে পারল, দুর্গা তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রাগ ক'রে।

মনের উত্তেজনা চাপবার জন্যেই চিরঞ্জীব জিজ্ঞেস করল, তুই এসময়ে এখানে এসেছিস কী করতে ?

দুর্গা মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি এসেছ কী করতে ?

—তোকে তো আমি আসতে বলিনি।

—তুমি না বললে আমি আসব না, এমন কী কথা।

প্ল্যাটফরম থেকে একজনের উঁচু গলা শোনা গেল, আরে মিয়া শিক তো গোঁজাগুজি করছ। মালগুলোন যে খারাপ হচ্ছে, সেটা বোঝ? থাঁটি থাঁটি যিখেনে আছে, সিখেনে গে' থোঁচাও দি'নি, যাও।

দুর্গা আপন মনেই চুপি চুপি বলতে লাগল, বেশী বাড়াবাড়ি কোনদিন ভালো নয়। কাল বিকেলে সদরে জিনিস গেছে বিচালীর গাড়িতে। এখন যাচ্ছে তরকারির ঝাঁকায়। তা' পরে যাবে আবার চন্দননগর মোটর গাড়িতে। একদিনেই একেবারে কারবার মাৎ। এ কখনো ধরা না প'ড়ে যায়?

এসব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে চিরঞ্জীবের। একবার যখন পথে নেমে পড়া গেছে, ফেরার কোনো উপায় নেই, তখন এসব কথা ব'লে লাভ কী? সে বলল, তুই যা না কেন, বাড়ি যা।

—আমি বাড়ি গেলেই তো আর আব্‌গারির লোকেরা কানা হ'য়ে যাবে না।

—তবে চুপ ক'রে থাক্‌।

দূরে ট্রেনের আলো দেখা গেল। নিকটবর্তী হতে লাগল ক্রমেই। মাথায় ঝাঁকা তুলতে লাগল সবাই। দুজনেই শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ি এসে দাঁড়াতে নির্বিঘ্নেই উঠে গেল সমস্ত ঝাঁকা।

গাড়িটা চলে যাবার পরেও, দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে একটা নিশ্বাস ফেলে চিরঞ্জীব বলল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

—না।

—তবে আমি চলি, আর দেরী করব না।

ব'লে সে দুর্গার দিকে তাকাল। দুর্গাও তাকিয়েছিল। চিরঞ্জীবের বুকে ও চোখে যে-আগুন সারাটা রাত্রি ধ'রে জ্বলেছে, সে আগুন যেন এই মুহূর্তে একবার নিভে এল। শান্ত বিষণ্ণতা দেখা গেল যেন। একটি দূর গভীর অতলতা তার চোখে। বলল, সারা রাত ঘুমোসনি বুঝি?

দুর্গা বলল, ব্যবস্থা যা করেছ, তাতে কি আর ঘুম হয়?

চিরঞ্জীব বুঝল, একই দুশ্চিন্তায় তারা দুজনেই এখানে এসেছে। যদিও এই গাছতলাতেই দুর্গা আসবে ভাবতে পারেনি।

—যা তা' হ'লে, দাঁড়িয়ে থাকিস নে।

ব'লে চিরঞ্জীব দুর্গার কাঁধে হাত দিয়ে, ঠেলা দিল। আর দুর্গার চোখের দিকে না তাকিয়ে, সাইকেল সরিয়ে নিল।

বাতাসে দুর্গার খোলা চুল উড়ছে। মন্থর পায়ে মাথা নীচু করে সে আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে অগ্রসর হল। তারপর যে-মুহূর্তে চিরঞ্জীব সাইকেলে উঠল, সে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। একটু একটু ক'রে ভোর হ'য়ে আসা অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল চিরঞ্জীব।

অবিশ্রান্ত সাইকেল চালিয়ে চিরঞ্জীব যখন চন্দননগরে এসে পৌঁছুল, তখন আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। দোকানপাট খুলতে আরম্ভ করেছে। পাখীর চেয়ে কাকের জটলাই যেন শহরে বেশী। সে এসে উঠল একটা ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চলে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে একটু পুবদিকের ভিতরে। যেখানে কিছু মৎস্যজীবী, কিছু বাঙ্গালি চটকল শ্রমিকের বাস। একটি বাড়ির দাওয়ায় একজন অপেক্ষা করছিল চিরঞ্জীবের জন্যই। লোকটিকে দেখলেই বোঝা যায়, খানিকটা শহুরে ভবঘুরে। চোখে ধূর্ততা নেই, কিন্তু ঈষৎ রক্তাভ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ফোলা ফোলা মুখ দেখলে মনে হয়, মদ খায়।

চিরঞ্জীবকে দেখে মোটা গলায় বলল, এস।

চিরঞ্জীব বলল, সব ঠিক আছে তো বুধাইদা?

—ঠিক তো করবে তোমার জটাবাবু।

—জটা নেই এখানে?

—কাল রাত ন'টায় একবার এসেছেল। ব'লে গেছল, পাঁচটায় আসবে। তা' তুমি এসে পড়লে, তার পাত্তা নেই।

ঠোঁট উল্টে বলল বুধাই, বোধহয় ঘুম ভাঙেনি।

চিরঞ্জীবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বলল, ঘুম ভাঙেনি মানে কি? তার তো তোমার এখানে শোবার কথা ছিল। কোথায় ও?

—ভুঁইমালী পাড়ার চপলার বাড়িতে রয়েছে বোধহয়।

—আর গাড়ি?

—বলেছেল তো দক্ষিণের খালের এপারে। মানে তেলিনী-পাড়ার ইদিকে, ইন্দিরের বাড়ির কাছে রাখবে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে, চিরঞ্জীব জিজ্ঞেস করল, চপলার বাড়ি কোনটা বল তো?

গলিতে ঢুকে বাঁ দিকের একতলা পাকা বাড়িটা।

চিরঞ্জীবের দুই চোখে ক্রুর চাউনি। সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—কোথা চললে চিরঞ্জীব?

—বস, আসছি।

চিরঞ্জীব সাইকেল চালিয়ে, কাছেই ভুঁইমালীপাড়ায় এসে উঠল। ভুঁইমালীরা কেউ কোনোকালে এপাড়ায় ছিল কি না কে জানে। এখনো থাকে কি না, জানা নেই। ভুঁইমালীপাড়া বলতে বেশ্যা-পল্লীই বোঝে লোকে। যদিও ভুঁই বাদ গেছে। লোকে মালী-পাড়াই বলে।

বাড়িটা চিনতে ভুল হল না চিরঞ্জীবের। একতলা পুরনো বাড়িটায় ইতিপূর্বেও দু'একবার ঢুকতে দেখেছে সে জটাকে। কিন্তু সেটা কাজের অছিলায়। কারণ, চিরঞ্জীবের বরাবর বারণ ছিল, এসব আস্তানায় একদম আসা চলবে না। শহরের এইসব আস্তানাগুলিই সবচেয়ে খারাপ। দল নষ্ট হবে, ভাঙবে তাড়াতাড়ি, ধরা পড়বে বারে বারে। কারণ পুলিশের প্রথম নজর এদিকেই পড়বে। আর এদিকে কেউ একবার ঝুঁকলে, তার কাজে মন বসবে না। দলবল সব মাথায় উঠে যাবে।

যদিও এ চিন্তাটা প্রায় সোনার পাথরবাটির মতই। চোরা

চোলাইয়ের কারবারীরা মদ খাবে না, দেহোপজীবিনীদের দরজা মাড়াবে না, এ প্রায় পশ্চিমে সূর্যোদয়ের মত। বিশেষ জটার মত লোক, যে এ শহরেই পেয়েছে হাতে খড়ি। তবু চিরঞ্জীব তার দলকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল নির্বিঘ্নে কাজ চালাবার জন্যে। তা' ছাড়া, তার সংস্কার, তার দিদির জীবন, তাকে এসব দিক থেকে দূরে রেখেছিল। জটারও সেই রকম শপথ ছিল তার কাছে। আর চিরঞ্জীব বিশ্বাসও করেছিল জটাকে। কারণ মাঝখানে বীণা ছিল। জটার কথা থেকে বুঝেছিল, বীণাকে সে যেন ভালবাসে। মুখে গম্ভীর থাকলেও, কেন যেন ভাল লেগেছিল চিরঞ্জীবের। মনে মনে খুসী হয়েছিল সে।

কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল, বীণার চালচলন তার ভাল লাগছিল না। আর বীণার চালচলনের জন্য যে দায়ী, সেই জটার প্রতি ভিতরে ভিতরে বিক্ষোভ জমেছিল তার। সন্দেহ হচ্ছিল, টাকার লোভে জটা অন্য দলেও ভিড়েছে। সেরকম সংবাদও পাওয়া গেছে।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ দেখে, শিকল ধরে নাড়া দিল চিরঞ্জীব। স্বয়ং প্রৌঢ়া চপলাই দরজা খুলে দিল। চোখে বুঝি ছানি, দেহে অসুস্থতা। বলল, কে?

চিরঞ্জীব উঠোনে ঢুকে বলল, জটা আছে কোন ঘরে?

চপলা একটু রুষ্ট হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

—বল না কোন ঘরে আছে। বিশেষ দরকার তাকে।

চপলা হয় তো চেনে চিরঞ্জীবকে। তবু বারেক সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে, বারান্দায় উঠে, একটা ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকল, জটিরাম, ও জটিরাম, দেখ তোমাকে কে ডাকছে বাপু এই সাতসকালে।

দরজা খুলে, উঠোনে চিরঞ্জীবকে দেখে যেন থতিয়ে গেল জটা। চোখ তার লাল। দেখলেই অনুমান করা যায়, রাতভর মদ খেয়েছে সে। এখনো তার খোয়ারি পুরোপুরি কাটেনি। লুঙ্গির মত ক'রে, অত্যন্ত শিথিলভাবে কাপড় পরা। বলল, তুমি?

যদিও জটা বয়সে প্রায় সমান, তবু চিরঞ্জীবের প্রতি কোথায় যেন একটু ভয় ও সমীহ আছে তার।

চিরঞ্জীব সাইকেলটা বারান্দায় হেলান দিয়ে রেখে, একেবারে ঘরের দরজায় উঠে এল। ঘরের ভিতর বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল কে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। পর মুহূর্তেই অবাক হ'য়ে দেখল, একজন নয়, তু'জন মেয়ে ঘরে রয়েছে। এবং একজন তার মধ্যে বীণা!

চিরঞ্জীব জটার দিকে ফিরে বলল, এত দেরী কেন তোর?

বারান্দার ওপরেই জলের বাল্‌তি ছিল। জটা তাড়াতাড়ি চোখে জল ছিটিয়ে, ঘরে জামা ছাড়তে গেল। চিরঞ্জীবও ঘরের মধ্যে ঢুকল।

জটা বলল, মাইরি, বড় দেরী হ'য়ে গেছে। চল্‌ চিরো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই।

বীণা আর অন্য মেয়েটি একেবারে অগোছালো হয়ে ঘুমোচ্ছিল। বীণার গায়ে তবু জামা ছিল একটি। অন্য মেয়েটির শুধু শাড়ি। তাও আলুথালু। কিন্তু বীণাকে কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছিল। চোখের কোল বসা শীর্ণ মুখ। বয়স আঠারো উনিশের বেশী নয়। একটু রোগা, একহারা বরাবরই। কিন্তু হাস্যোচ্ছলা ছিল। গ্রামের কাছেই, রেফিউজী ক্যাম্প থেকে একে যখন প্রথম সংগ্রহ করেছিল জটা, ভয় পেয়েছিল চিরঞ্জীব। কিন্তু জটা বুঝিয়েছিল, মেয়েটা এমনিতে ভদ্র ঘরের। সাজলে গুজলে, ভদ্রলোকের মেয়ে ব'লে মনে হবে। অনেক কাজ হবে মেয়েটাকে দিয়ে। শুধু চন্দননগর চুঁচুড়াতেই নয়। কলকাতাতেও অনেক মেয়ে এসব কাজ করে। এদের কাজ শুধু, ট্যাক্সিতে, রিক্‌শায় এক জায়গা থেকে এক জায়গায় মাল পৌঁছে দেওয়া।

সেদিক থেকে বীণার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল। ততদিনই কাজ ভালভাবে চলেছিল, যতদিন এ শহরে অচেনা ছিল বীণা।

কিন্তু জটা তা' থাকতে দেয় নি। আর এ শহরে, জটাকে অনুসরণ ক'রে অনেকেই বীণার পিছনে লেগেছিল। পুলিশ তো আগেই তার পরিচয় পেয়েছিল।

বীণাকে কিছুদিন দেখেনি চিরঞ্জীব। কারণ দরকার হয় না। আজ মনে হ'ল, যেন বহুদিন দেখেনি। মনে হ'ল মেয়েটা যেন অসুস্থ। কিন্তু বীণাকে নিয়ে এভাবে বেশ্যালয়ে ঘর নিয়ে বাস করেছে জটা, এতটা জানত না। আর সবচেয়ে অবাক লাগছে অন্য মেয়েটিকে দেখে। কালো মোটা মেয়েটা কেন একই ঘরে, একই বিছানায়। যে-বিছানায় জটাও নিশ্চয় শুয়েছিল। আর মেয়েটির সারা চেহারার মধ্যে কেমন ক'রে যেন মালীপাড়ার একটি তীব্র সুস্পষ্ট ছাপ আপনা থেকেই ফুটে উঠেছে। দেখলেই চেনা যায়।

জটার অশ্বস্তি হচ্ছিল চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে। বলল, চিরো, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

চিরঞ্জীব বলল, হোক্। যখন হোক্, গাড়ি নিয়ে আমি যাব। তার আগে তোর সঙ্গে একটা ফয়সালা হ'য়ে যাক্।

জটার কপালে কয়েকটি রেখা পড়ল। অবজ্ঞায় সে ফিরে তাকাল অন্যদিকে। বলল, ফয়সালাটা কাজের শেষে করলে হ'ত না? তা' ছাড়া ফয়সালার আছেই বা কি?

চিরঞ্জীবের দুই চোখে আরক্ত ঘৃণা। বলল, বীণাকে কতদিন বাড়ি যেতে দিসনি?

জটা বলল, ও'তে তোর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কাজের ক্ষতি হচ্ছে কি না, সেইটে খতিয়ে দেখে নে।

প্রথম প্রথম এই জটাই খুব মানত চিরঞ্জীবকে। বলেছিল, সত্যি চিরো, ওঁচা মালদের সঙ্গে কাজ ক'রে ক'রে ঘেন্না ধরে গেছল। এতদিনে একটা মনের মত লোক পেলাম। তুই আমার আসল মনিব।

চিরঞ্জীব বলেছিল, মনিব টনিব নয় জটা। ওকুরদের মত দল ক'রে লাভ নেই। আমরা খালি পয়সা চাই, ব্যস্। ছুনিয়ায় অনেক বড় বড় কথা শুনলুম। সব বেটাই চুরি করে, ধরা পড়ে রাধা। চোলাই রসের নদী ক'রে ফেলব। দেখব, কোথায় কত টাকা আছে।

জটা বলেছিল, তাই তো বলছি। ওকুর শালারা মনে করে, আমরা ওদের ঘরের চাকর। ধরা পড়লে, শালারা আমাদের কুকুরের মত গ্যাখে। দশবার চোখ রাঙাবে, খিস্তি করবে মা বাপ তুলে। তারপরে জামিন দেবে। যেন ইচ্ছে ক'রে ধরা দিই আমরা। ইজ্জৎ নিয়ে কাজ করব তোর সঙ্গে।

সেই জটা আজ চপলা বাড়িউলীর ঘরে দাঁড়িয়ে এইরকম উদ্ধত কথা বলছে। কথাবার্তার ভাব ভঙ্গি কিছুদিন থেকেই এরকম হয়েছে। তবে মুখোমুখী যতটা নয়, আড়ালে তার চেয়ে বেশী। চিরঞ্জীবের দলটা যে আসলে তারই মুঠোয়, দলপতি যে আসলে সে-ই, একথা সে আজকাল সবখানে বলে বেড়ায়। বলে, 'যেদিন আমি সরব, সেদিন চিরো বাঁড়ুজ্জের কারবার লাটে উঠে যাবে।'

কিন্তু যেহেতু, আজকের, এই পরিবেশে, এরকম মুখোমুখী কোনোদিন দাঁড়াতে হয়নি সেই জন্যে চিরঞ্জীব সেসব কথা নিয়ে বিবাদ বাঁধায়নি। আজ চিরঞ্জীবের চোখ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। সারারাত্রি ধরে যে-আগুনে সে পুড়েছে, সেই আগুন লেলিহান হ'য়ে উঠল তার বুকে। সে ঘুরে জটার মুখোমুখী দাঁড়াল। সামনাসামনি, গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে, জটার গা'য়ে গরম নিশ্বাসের হল্‌কা ছুঁড়ে বলল, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে। বীণাকে কতদিন বাড়ি যেতে দিসনি ?

জটা এক পা পিছিয়ে এসে, গলা রাশভারী করার চেষ্টা ক'রে বলল, আমি কি বেঁধে রেখেছি নাকি ? ও নিজেই ইচ্ছে ক'রে বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

চিরঞ্জীব বলল, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশ্যাবাড়িতে থাকিস কেন তুই ? আর জায়গা নেই ?

জটা নিরুত্তর। চিরঞ্জীবের মনে প'ড়ে গেল দুর্গার কথা। আবার বলল সে, তুই কি ওকে এ বাড়িতে রেখে ভাড়া খাটাতে চাস নাকি ? ওকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতে চাস্ ?

এমন সময়ে সুদীর্ঘ হাই তোলার শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকাল। সেই কালো মোটা মেয়েটি জেগে উঠে বসেছে। ঢুলুঢুলু শ্লেষ ভরা দৃষ্টি তার চিরঞ্জীবের ওপর।

চিরঞ্জীব একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে, জটাকে আবার জিজ্ঞেস করল, আর এ এ-ঘরে কেন ?

কালো মেয়েটিই জড়িয়ে-জড়িয়ে কিন্তু বিদ্রূপ ঢেলে বলল, অ ! জটাবাবুর মনিব বুঝি ? তাই এত কৈফিয়ৎ তলব ?

জটা আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার কোনো মনিব-টনিব নেই। যা করি, তা নিজেই করি, কাউকে কৈফিয়ৎ দিই নি।

মেয়েটিই আবার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, ওকথা আবার কেউ জিজ্ঞেস করে, এ কেন এ-ঘরে ?

মেয়েমানুষকে কেন দরকার হয়, তাও জানা নেই নাকিরে বাবা ?

চিরঞ্জীব সহসা ঘর কাঁপিয়ে গর্জন ক'রে উঠল, জবাব দিবি ?

সমস্ত ঘরটা যেন চমকে উঠে, একেবারে স্থির হ'য়ে গেল। কালো মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বসে পড়ল। বীণা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চিরঞ্জীবকে দেখে একবার খালি অস্ফুটে বলল, চিরোদা ?

কিন্তু জটার শ্লেষ-ক্রুদ্ধ-স্থির চোখে যেন ছানা কেটে গেল। যদিও সে তার থতিয়ে যাওয়া ভাবটা গোপন করবার চেষ্টা করল। নির্বিকার ভাবেই যেন বলল, জবাব কি দেব ? এভাবে কথা বলছিস কেন ? শুনলিই তো।

অর্থাৎ ও মেয়েটা কেন এ ঘরে। চিরঞ্জীব তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, তবে বীণা এখানে কেন? দু'জনেই বুঝি তোর কাছে এক?

এইবার চপলা হামলে পড়ল দরজার কাছে, এ বাড়িতে আবার দু-রকম মেয়েমানুষ কে দেখেছে? সকলেই এক। ইকি যন্ত্রন্না বাপু সাত সকালে।

বীণা তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলল, এসব কথা যাক চিরোদা।

—না থাকবে না।

চিরঞ্জীব বীণার দিকে রুক্ষ চোখে তাকিয়ে আবার বলল, তুমি কেন এখানে থাক?

বীণা মুখ নীচু ক'রে খানিকটা পূর্ব বঙ্গায় টানে বলল, আর আমার কোনোখানে যাবার জায়গা নাই চিরোদা।

দুর্গার কথাগুলি আবার মনে পড়ল চিরঞ্জীবের। যে-সন্দেহ করেছিল দুর্গা, তা ঘটেই বসে আছে। সে বুঝল, চপলা বাড়িউলীর স্থায়ী শরিকান লাভ করেছে বীণা। পরিবর্তে চপলার টাকা নিশ্চয় কিছু এসেছে জটার পকেটে। ভালোবাসা? ঠিকই বলেছিল দুর্গা, অমন ভালবাসার মুখে মারি ঝাঁটা।

চিরঞ্জীবের ক্রোধের মাত্রার ওপরে বিস্ময় ঢেউ দিয়ে উঠল। জটাকে জিজ্ঞেস করল, তবে যে তুই বলতিস, বীণাকে তুই বিয়ে করবি, সংসার পাতবি?

জটা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, বিয়ে না করলে কি আর সংসার করা যায় না? না, ভালবাসা যায় না? তুই আর দুর্গাও তো আছিস।

'আছিস' শব্দটা যেন গরম লোহার শিকের মত বিঁধল চিরঞ্জীবের কানে। তার চোখে মুখে, সারা শরীরে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল বিদ্যুতের শিখা। তার চাপা গলায় একবার খালি শোনা গেল, দুর্গার কথা বলছিস তুই।

পর মুহূর্তেই জটার গালে ঠাস্ ক'রে একটা থাপ্পড় কষাল সে

—বেশ্যার দালাল কোথাকার! ভালবাসার নাম করে মেয়ে বিক্রী ধরেছিস তুই?

চপলা হাউমাউ ক'রে উঠল। কালো মেয়েটা দৌড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, গুণ্ডা পড়েছে বাড়িতে। মাসী পুলিসে খবর দাও।

জটার চোখে ক্রুদ্ধ সাপের দৃষ্টি। সে দৌড়ে ঘরের এক কোণে তাকের ওপরে হাত বাড়াল। বীণাও চিৎকার ক'রে ছুটে গেল সেদিকে, খবরদার জটাদা ওটা বার ক'র না।

চিরঞ্জীব ব'লে উঠল, দাও বার করতে দাও ওকে, কী বার করতে চায়। আমি আছি, পালাব না।

জটার হাতে একটা ছুরি চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল। ছুরিটা একদিন চিরঞ্জীবই কিনে দিয়েছিল জটাকে। কলকাতায় ছুরিটা দেখে পছন্দ হয়েছিল জটার। বলেছিল, খুনটুন নয় চিরো, এমনিতে কখন কি দরকার পড়ে। শুধু দেখিয়েই অনেক সময় কাজ উদ্ধার হ'য়ে যাবে।

কিন্তু চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে জটা দূরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, বড় হাত চালাতে শিখেছিস না? লীডার?

চিরঞ্জীব বলল, হাত চালানো এখনো শেষ হয়নি। আরো চালাব। তোর কি করার আছে, আগে কর দেখি।

বীণা বলে উঠল, কিছু দেখতে হবে না চিরোদা। আপনি চলে যান। ওকে আপনার দল থেকে তাড়িয়ে দিন।

চিরঞ্জীব বলল, সে তো দেবই।

জটা বলে উঠল, তার আগে আমিই ছাড়ব। মদ চোলাইয়ের চোরা কারবার, তার আবার শালা যুধিষ্ঠিরগিরি। কারবারের আর লোক নেই?

চিরঞ্জীব বলল, আছে বৈকি। কার্তিক ঘোষ আছে তোর মনিব এখানে। ওকুরদের পা চাটা কুকুর ছিলি। এবার কার্তিক ঘোষ।

ওসব জায়গা ছাড়া তোর চলবে কেমন ক'রে ? ওরা ছাড়া বেশী দরে মেয়ে কেনবেই বা কে তোর কাছে ?

বুধাই এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়। চিরঞ্জীবকে বলল, সব চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে চিরঞ্জীব। চ'লে চল এখন। ওদিকে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

চিরঞ্জীব জটার দিকেই চোখ রেখে আবার বলল, যুধিষ্ঠির নই। কিছু মদ চোলাইয়ের ব্যবসা করি ব'লে, তোর ইচ্ছেমত মেয়ে নিয়ে কারবার করতে দেব না।

কথাটা ব'লেও শান্তি হ'ল না চিরঞ্জীবের। তার বুকের মধ্যে ফুঁসছে, পুড়ছে। তবু মনে হচ্ছে, জটাকে বুক ফুলিয়ে কথা বলার অধিকার যেন তার পুরোপুরি নেই। সে বীণার দিকে ফিরে বলল, তুমি বাড়ি যেতে চাও বীণা ?

বীণা মাথা নীচু ক'রে ঘাড় নেড়ে জানাল, আর আমি কোনোদিন এখান থেকে যেতে পারব না চিরোদা। বুধাই বলে উঠল, ওর এখন যাবার উপায় নেই। সব তুমি জান না। চল, তোমাকে আমি বলব। তবে জটাকে একটা কথা ব'লে দিয়ে যাও। যেন দলের সঙ্গে শত্রুতা না করে।

চিরঞ্জীব বলল, সেকথা আমি ওকে বলব না বুধাইদা। ওর যদি সাহস থাকে, ও যেন শত্রুতা করে।

ব'লে চিরঞ্জীব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বুধাই জটার দিকে ফিরে বলল, নে, ছুরি টুরি নামা। তোকে তো অনেকদিন বলেছি, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে জটিরাম। এ তবু অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। ওকে তো তুই বেশী জানিস। কী ক'রে ও ছোঁড়া এ কারবারে ঢুকল, তাই এক এক সময় অবাক লাগে ভেবে।

বলে সেও চিরঞ্জীবকে অনুসরণ করল। বাইরে এসে চিরঞ্জীব বলল, বুধাইদা তুমি সাইকেলের সামনে বস, চালিয়ে নিয়ে যাই।

—চল। পাছায় একটু লাগবে, কী করা যাবে তার।

রোদ তখন ঝিলিক দিয়েছে একটু পূব আকাশে। মালীপাড়ায় যদিও লোক চলাচল শুরু হয়নি, বড় রাস্তায় হয়েছে। বুধাইকে সামনে বসিয়ে দ্রুতবেগে সাইকেল নিয়ে চালিয়ে চলল চিরঞ্জীব। একটি কথাও বলল না।

বুধাইকে লোকে জানে ট্যাক্সিওয়ালা ব'লে। এ শহরে যদিও মীটার ট্যাক্সি নেই, তবু গাড়ি আছে অনেকগুলি। কোনোকালে হয় তো সে স্বাধীন ব্যবসা করত। যখন তার গাড়ি ছিল। সেই থেকে সে ট্যাক্সিওয়ালা। কিন্তু গাড়ি তার বিক্রি হ'য়ে গিয়াছে অনেকদিন। লোকটা অস্থিরমতি কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কোথাও সে স্থির হ'য়ে চাকরি করতে পারেনি। কিছুদিন পরে পরেই সে চাকরি বদলায়। এখন তার উপর সকলের অবিশ্বাস এসে গিয়েছে। কাজের লোকেরা তার ওপর আস্থা রাখতে পারে না। কারণ হিসেবে জবাব তার একটিই আছে, 'খালি গাড়ি চালাতে আমার ইচ্ছে করে না।' কি তার ইচ্ছে করে? তা সে জানে না। কিন্তু লোকটা কুড়ে নয়। অসুবিধেয় প'ড়ে কেউ গাড়ি চালাতে ব'ললে সাময়িকভাবে যায়। রাতবিরেতে, ঝড়বৃষ্টিতেও সে পেছ্‌পা' নয়। তার সুবিধে হল এই যে, তার পরিবার পরিজন কেউ নেই। যে-বাড়িতে আজ চিরঞ্জীব তার সঙ্গে দেখা করল, সেটা তার নিজের বাড়ি নয়। তবে কোনো এক কালে নাকি তাদেরই বাড়ি ছিল ওটা। বিক্রি হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ির মালিক এখন বিধবা লক্ষ্মী। এ পাড়ারই মেয়ে। এখন বয়স বোধহয় বুধাইয়ের মত বছর চল্লিশ। বুধাইকে দাদা বলে। গুটি ছয়েক ছেলেমেয়ে আছে। দুর্নামও আছে। থাকতেই পারে, কারণ বুধাই মাসের বিশদিন ও বাড়িতেই থাকে। কিন্তু তা' নিয়ে কলরব কিছু নেই এমন। যদিও বুধাই বলে, সংসারের লোকের যে মা-বোন জ্ঞান এত কম, তা জানতুম না।

মাঝে মাঝে সে চিরঞ্জীবদের কাজের জন্যও গাড়ি চালায়। তারও

একটা কৈফিয়ৎ আছে তার। বলে, এটা শুধু গাড়ি চালানো নয়, আরো কিছু, কি রকম জান? প্রথম যখন গাড়ি চালাতে শিখেছিলুম, তখন যেমন রক্ত দাপাত গাড়ি চালাতে, এ কাজটা করতে সেরকম লাগে। বেশ লাগে। তারপরে কোন্‌দিন এ-ও মনে হবে, ধুর্ শালা, মেজাজ আসছে না। তখন আর এ কাজ করব না।

বোঝা যায়, একটা উত্তেজনা চায় সে। সেটা হেঁকে ডেকে চেঁচিয়ে দৌড়ে নয়। বুকের মধ্যে, রক্তের মধ্যে, অন্তস্রোতে। মদ খেয়ে এখন সেটা আর তার হয় না। মেয়েমানুষের পিছনে ঘোরার কথা শোনা যায় না তার সম্পর্কে।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখা গেল ইন্দির গাড়ির সামনে বসে আছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে একটু ভিতরে, ইন্দিরের মোটর মেরামতের কারখানা এটা। লোক দেখে সে লাফ দিয়ে উঠল। বোঝা গেল, ভয় পেয়েছে, প্রথমেই বলল, সে উল্লুক কোথায়? জটা? এই লিকার ভরতি গাড়ি এখানে রেখে গেছে। আর আমাকে বলে গেল রাত আড়াইটের সময় এসে লোক নিয়ে যাবে?

চিরঞ্জীব বলল, ও মিথ্যে কথা বলেছে। সকাল ছ'টায় বেরুবার কথা আমাদের।

ইন্দির বলল, আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখা কেন তবে? ছ'টা পর্যন্ত বললেই হত, গাড়ি আমি অন্য জায়গায় রেখে আসতুম। আমি আর এসব কারবারে নেই। তোমরা এবার থেকে অন্য জায়গায় গাড়ির চেষ্টা ক'রো, এইবারই শেষ। ওই জটা আমাকে অনেকবার ভুগিয়েছে। আর নয়।

বুধাই তাকে বোঝাল। জটাকে তাড়িয়ে দেবার কথাও বলল। চিরঞ্জীব বলল, এইবারটা মাপ করে দিন ইন্দিরদা! এবার থেকে কথাবার্তা আমি বলব আপনার সঙ্গে।

ইন্দিরের রাগ পড়লেও, অভিযোগ গেল না। বলল, হ্যাঁ, তাই ক'রো ভাই। তোমার ওই জটা মদ খেয়ে এসে আমাকে হুকুম

করবে, ও সব আমি পারব না। ভ্যালা কারবার করেছি। মেয়েমানুষ নিয়ে বেড়াতে যাবে, তাও এসে ফোকটে গাড়ি চাপতে চায়। এ কি রকম কথা ?

বুধাইয়ের সঙ্গে একবার চিরঞ্জীবের চোখাচোখি হয়। বুধাই বলল ইন্দিরকে, গাড়িতে তেল আছে তো ?

—আছে।

—তবে নাও চিরঞ্জীব, উঠ। আর দেরী নয়।

চিরঞ্জীব সাইকেলটা ইন্দিরের লোহালক্কর ভরা মেরামতী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। পকেট থেকে কুড়িটি টাকা বের ক'রে দিল ইন্দিরের হাতে। টাকাটা নিয়ে ইন্দিরও একটু অবাক হয়ে তাকাল চিরঞ্জীবের দিকে। তাকে সে এতটা চুপচাপ থম্‌থমে দেখেনি কখনো। যদিও, চিরঞ্জীবের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ তার কমই হয়।

গাড়িতে এসে উঠল চিরঞ্জীব। স্টার্ট দিল বুধাই। বলল, যাক্, ইন্দিরের নীলকান্ত এক ধাক্কাতেই এস্টার্ট নিয়েছে। যাত্রা তবে শুভই হবে।

রং-চটা নীল রং এর গাড়িটাকে ওই নামেই ডাকে বুধাই।

শ্রীরামপুর পার হয়ে যাবার পর, বুধাই আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। বলল, একেবারে যে কথা বন্ধ ক'রে দিলে।

চিরঞ্জীব বলল,' ভাল লাগছে না।

—কেন ? জটাকে মেরেছ ব'লে ?

—না। জানিনে কেন ভাল লাগছে না। কোথাও শান্তি নেই বুধাইদা।

—কথাটা নতুন নয়।

—তা' জানি। নতুন কথা কে বলে জানিনে। সবাই একঘেয়ে পুরনো কথাই বলে। তবু ওই পুরনো কথাটা সবাই বলছে। শান্তি মানে কি বুধাইদা, বলতে পার ?

—না ভাই, বলতে পারি না। শান্তি আমি কোথাও দেখিনি।

—তুমি কি দেখেছ সারা জীবনে ?

—আমি ?

এক হাতে হুইল ধরে, আর এক হাতে বিড়ি দেশলাই বার করল বুধাই, একটা বিড়ি আর দেশলাইটা চিরঞ্জীবের হাতে দিল। নিজে একটা ঠোঁটে নিল। চিরঞ্জীব নিজেরটা ধরাল আগে বাতাস ঠেকিয়ে। কাঠিটা নিভে যেতে নিজের জ্বলন্ত বিড়িটা দিল বুধাইকে। বুধাই বিড়ি ধরিয়ে, খানিকক্ষণ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

কোন্নগর পেরিয়ে গাড়ি কোৎরংএর সীমানায় পড়েছে। রাস্তাটা একটু ফাঁকা আছে এখনো। যদিও রোদ উঠে এসেছে অনেকখানি। গঙ্গার ধারে ধারে ইঁটের ভাটা। ভিন্ দেশী কুলিকামিনরা কাজ করছে সেখানে। আর বোধহয় মাস দুয়েক। তারপরেই বর্ষা, ইঁট পোড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে।

বুধাই বিড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে বলল, আমি দেখলুম, লোকেরা শালা মরতে চায় না।

—মানে ?

—মানে, ছ্যাঁচো কোটো মারো লাথি, লজ্জা নেইকো বেড়াল জাতির। সেইরকম। যেমন ক'রে হোক্, বাঁচবেই। একি কথা মাইরি, ভেবে পাইনা আমি।

চিরঞ্জীবের বুকের মধ্যে কেমন যেন ধক্ ধক্ করতে লাগল। কারণ, কিছুক্ষণ আগে নিজেকে নিজে সে বলছিল, কী যে জীবনের মায়া, বুঝি না। বেঁচে থাকার কেন বা এত ইচ্ছে। সে বলল,

কিন্তু বুধাইদা, সবাই বেঁচে থাকতে চায়।

—হ্যাঁ। ছাল ওঠা নেড়ি কুত্তাটাও।

—মানুষ তো কুকুর নয়।

—কুকুরের মত মানুষ তো আছে। ছলছলে চোখ, ধুক্‌ছে, পাতা চাটছে। নয় তো ফাঁক পেলে চুরি ক'রে খাচ্ছে। কেন? তার

চেয়ে জোয়ান লড়িয়ে কুত্তা ভাল। তেজ থাকা ভাল। তা নয়, জান্‌লায় জান্‌লায় ম্যাও ম্যাও, অমনি লাথি ঝাঁটা, ফাঁক পেলেই চুরি! কেন রে মাম্‌দো, কেন, এমন ক'রে বাঁচতেই হবে কেন?

গাড়ি উত্তরপাড়ায় পড়ল। একটা বাঁকের মুখে গাড়ি দাঁড় করাল বুধাই। বলল, যাও, পিছনের সীটে গিয়ে বস। পায়ের উপর পা' তুলে সিগারেট খাও। চোখ বুজে থেক।

চিরঞ্জীব নেমে গিয়ে পিছনে বসল। সে জানে, মাইল খানেকের মধ্যেই আবগারি তল্লাসীর জায়গা আছে। রাস্তার মাঝখানে, শাদা রং পিপে বসিয়ে, পথ দিয়েছে সরু ক'রে, বেঁকিয়ে। চিরঞ্জীব জোরে নিশ্বাস টেনে গন্ধ নেবার চেষ্টা করল। কোনো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

আরো খানিকটা এগিয়ে, আবার গাড়ি দাঁড় করাল বুধাই।

—কী হল?

—দাঁড়াও, আর দু' একটা গাড়ি আসুক। এক সঙ্গে যাব। দুটো গাড়ির মাঝখানে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল। সে যাক্‌গে। যে কথাটা বলছিলুম। কেন বল তো, এত সাধ কেন বাঁচার? ধুকে পচে হেজে পিষে না বাঁচলেই নয়?

চিরঞ্জীব চোখ বুজে এলিয়ে থেকে বলল, আমি এ কথার জবাব দিতে পারিনে বুধাইদা। তবে, আমার মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছে হয়।

—কী রকম?

—খুনোখুনী মারামারি করতে ইচ্ছে করে।

—খুনোখুনি মারামারি?

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ভাবি, একটা ডাকাতের দল করলে কেমন হয়। আগুন লাগিয়ে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—

—শালা, একেবারে সোনার লঙ্কা ছারখার ক'রে দেওয়া, তাই না? বাধা দিয়ে বলে উঠল বুধাই। তারপর দুজনেই হেসে উঠল।

চিরঞ্জীব বলল, ঠাট্টা নয়।

—জানি, ঠাট্টা নয়। কিন্তু আগুন লাগানো কি চাট্টিখানি কথা। তুটো চারটে বাড়ি জ্বালানোর ব্যাপার তো নয়, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, তুটো চারটে বাড়ি নয়। তুটো চারটে সিন্দুকের টাকা নয়। যাবৎ পুড়িয়ে দেওয়া।

বুধাই বলল, ওই রাগেই বুঝি শেষে এই কারবার ধরেছ?

চিরঞ্জীবের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, তা' জানিনে। দেখলুম, সবাই বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু মরণের ভয়ে সব কেঁচো। আমিও। ওই তোমার কথাটাই এল শেষ পর্যন্ত। এই কাজটা আমার জেদ, কম্‌পিটিসান বলতে পার। লাগাও দৌড়, কে কত লাগাবে। দেখি জিততে পারি কি না।

—কাদের সঙ্গে বাজী ধরেছ?

—যারা চোখ আধবোজা ক'রে উপদেশ দিচ্ছে। যারা আমার আশেপাশে সব রকম অন্যায় করছে, তবু কাঁচকলা দেখিয়ে আরামে আছে। তাদের সকলের সঙ্গেই বাজী। লাগাও দৌড়। বুঝতে পারিনি, আরো আগে নামা উচিৎ ছিল। তা' হ'লে—

গলায় যেন কিছু ঠেকে গেল চিরঞ্জীবের। স্তব্ধ হয়ে গেল। দিদি কমলার কথা মনে পড়ল নাকি তার? তার চোখে ধিকিধিকি আগুন। তবু একটা যন্ত্রণার ছায়া তার চোখের আগুনের ওপারে। সহসা চাপা তীব্র গলায় বলে উঠল, কেন দাঁড়িয়ে আছ বুধাইদা? চালিয়ে যাও। হোক যা খুশি, মার ঠোকর ওই রাস্তার ওপর আবগারি পুলিশের পিপের বেড়ায়। সেপাইটার খুলি উড়ুক। আসুক ওরা আমাদের মারতে।

বুধাই মোটা গম্ভীর শান্ত গলায় বলল, পিছন ফিরে দেখ তো, যে গাড়িটা আসছে, ওটা প্রাইভেট কার নাকি?

উত্তেজিত অবস্থাতেই পিছন ফিরে দেখল চিরঞ্জীব। বলল, হ্যাঁ।

গাড়ি স্টার্ট দিল বুধাই। বলল, আর ডানদিকে তাকিয়ে দেখ তো ওই চায়ের দোকানের দিকে। শ্রীরামপুরের শম্ভু টিকটিকি না?

আবগারির স্পাই শম্ভু। তাকিয়ে দেখে বলল চিরঞ্জীব, তাই তো দেখছি।

—ও ব্যাটা এখানে এসেছে কেন?

চিরঞ্জীব কিছু বলল না। বুধাই গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল আস্তে আস্তে। পিছন থেকে প্রকাণ্ড হাড্সন্ হর্ণ দিল। বুধাই স্পীড বাড়াল। আর একটা বাঁক নিতেই সামনে দেখা গেল, একসাইজ বেরিয়ার। বুধাই স্পীড কমাল। পিছনের গাড়িটা আবার হর্ণ দিল। বুধাই পাশ দিল না।

সামনে পিপে দিয়ে রাস্তাটাকে সরু ও সর্পিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। যাতে গাড়ি আপনি থেমে যায়। পিপের ঘেরাওয়ের মধ্যে রাস্তা। একজন সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। বুধাই গাড়ি ঢুকিয়ে দিল পিপের ঘেরাওয়ে। সেপাই হাত তুলে দাঁড় করাল তাকে। মুখ গাড়ির ভিতরে এনে উঁকি দিল। চোখ বোলালো আনাচে কানাচে। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল সেপাইয়ের। নাকের পাটা ফোলাল। চিরঞ্জীবের চোখ-বোজা মুখের দিকে একবার তাকাল।

পিছন থেকে হাড্সনের হর্ণ উঠল বেজে। সেইদিকে একবার তাকাল সেপাইটি। হাত তুলে তাকে পিপের ঘেরাওয়ে গাড়ি ঢোকাতে বলল। বুধাইকে বাঁ হাতে চলে যাবার নির্দেশ দিল। আর পিছনের হাড্সনকে একবারো দেখল না। থামতে না থামতেই, চলে যাবার নির্দেশ দিল।

বালি পার হ'য়ে বলল বুধাই, আগাম সংবাদ না থাকলে কোনো গণ্ডগোল নেই। শম্ভুটাকে দেখে ভেবেছিলুম, মরণের খোঁয়াড়েই ঢুকলুম বোধহয়। হ্যাঁ, চিরঞ্জীব, বল কি বলছিলে তখন বল।

চিরঞ্জীবের আগের সে উত্তেজনা আর নেই। মাঝখানে বেরিয়ারের ঢেউটা এসে, চাপা পড়ে গিয়েছে। এখন খানিকটা লজ্জাই করছে। বলল, কিছু বলছিনে বুধাইদা। কিছু ভাল লাগছে না।

বুধাই শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হেসে উঠে বলল, সেই একটা কি

গান আছে না ? 'ভাল লাগলে দিও, নইলে নিও, ও যে কেড়ে নেবার জিনিস নয়।'

চিরঞ্জীব বলল, আছে একটা গান। যাদের মন আছে, তাদের জন্য।

বুধাই বলল, মন যাদের নেই, তাদের আর ভাল মন্দ লাগার কী আছে ?

—আমার মন আছে বলছ বুধাইদা ?

—না থাকলে অত বড় থাপ্পড়টা কষালে কেন জটাকে। একটু বেশী আছে বলেই তো আমার মনে হয়।

—নাঃ বুধাইদা। আমি কি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ?

—সেই ভেবেই তো আমার অবাক লাগে।

চোখে চোখে তাকিয়ে দুজনেই হেসে উঠল। চিরঞ্জীব বলল, ঠাট্টা করছ বুধাইদা ?

—নোটেই নয়। দাও, তোমার সিগারেট একটা দাও।

সিগারেট দিল চিরঞ্জীব। রাস্তায় ক্রমেই গাড়ির ভিড় বাড়ছে। হাওড়ার পুল দেখা দিল।

বুধাই বলল, একটা কথা বিশ্বাস করবে চিরঞ্জীব !

—বল।

—আমারো আগুন জ্বালাতে ইচ্ছে করে। আমি আর এভাবে এই গাড়ির ইঞ্জিনের গোলাম হ'য়ে থাকতে পারি না, মাইরি ! মনে হচ্ছে, এখুনি ইঞ্জিন থামিয়ে দিই দৌড়।

তারপর দুজনেই চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ। গাড়ি এসে পৌঁছুল, আপার চিৎপুর দিয়ে, বাগবাজারের কাছাকাছি গঙ্গার ধারে একটি সরু গলিতে। গলির মধ্যেই, গেট পেরিয়ে খোলা জায়গাওয়ালা একটি পুরনো বাড়ি। কোনো এক কালে হয়তো এই খোলা জায়গায় বাগান ছিল। কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ সাজানো গোছানো বাড়িটি ভোগ করতেন। এখন শুধু ধুলো। গোবর ছড়ানো। বেওয়ারিশ

কুকুরের আশ্রয়। আর বাড়িটায় বাস করে রকমারি লোক। বোঝা যায় না, সকলেরই পরিবার পরিজন আছে কিনা। তবে দোতলায় মেয়েদের দেখা যায়। ছেলেপিলের কান্নাও শোনা যায়। মেয়েদের জামা গা'য়ে থাকে না, কিন্তু দেহ সৌষ্ঠব চোখে পড়ে। সাজে না, কিন্তু মোটা মোটা সোনার গহনা দেখা যায় গায়ে। অথচ পর্দানশীন একেবারেই নয়। লোক দেখলে, উঁকি মেরে হা ক'রে ছাখে। যেন লোক দেখেনি কোনোদিন।

নীচে একটা বড় হলঘর আছে। পুরনো ধুলো পড়া সেকেলে চেয়ার টেবিল আছে খান কয়েক। খান দুই তিনেক তক্তপোষ। ওগুলিতে চাঁটাই পাতাই থাকে। লোকজন সব সময় কয়েকজন থাকেই। হয় তাস খেলে, না হয় গল্পগুজব করে। অন্তত চিরঞ্জীব যতবার এসেছে, তাই দেখেছে।

যদিও সে এসেছে খুব কম। পারতপক্ষে সে আসেই না। বোধহয়, এবার নিয়ে বার চারেক। বুধাই জটা আর বীণা এখানে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। তবে চিরঞ্জীবের খুব খাতির এখানে। তাকে যেন এরা কেমন একটা ভিন্ন নজরে ছাখে। সেটা কোনো মহাপুরুষ দেখার ভঙ্গীতে নয়। যেমন ছ্যাঁচড়ারা ছাখে কোনো নাম করা চোরকে। অন্তত চিরঞ্জীবের সেইরকমই মনে হয়।

গেট পেরিয়ে খালি জায়গাটায় এসে গাড়ি দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল একটি মেয়ে। মেয়ে নয়, বোধহয় বউ। কী ভাগ্যি! বউটির গায়ে জামা, এমন কি ঘোমটাও টানা আছে। ঘোমটার পাশ দিয়ে এলো চুল ছড়ানো। আর একই সঙ্গে নীচের হল ঘর থেকে দুটি লোক প্রায় ছুটে এলো বাইরে। বলল, জটার গাড়ি এসেছে।

কিন্তু এসে তারা হতাশ হল। একজন বলল, ধুর শালা, আসল মালেরা কেউ নেই রে।

বুধাই গাড়ি থেকে নামতে নামতে জবাব দিল, এর চেয়ে আর

আসল মাল পাবেন কোথায় মশাই? খোদ কর্তাই তো আজ এসেছে।

দুজনেই ফিরে তাকাল চিরঞ্জীবের দিকে। দুজনেই চিরঞ্জীবের অপরিচিত। একজনের গিলে করা পাঞ্জাবী আর পায়জামা। আর একজনের ধুতি আর সার্ট। দুজনের চেহারার মধ্যেই একটি জিনিস লক্ষণীয়। তাদের জ্বরো চোখে কেমন যেন ভ্রূটানা উদ্ধত চাউনি। চোখের কোল বসা। ঠোঁটের কোণে, শ্লেষের হাসি।

একজন বলল বুধাইকে, আপনাদের মনিব বুঝি?

জবাবে বুধাই বলল, পরেশবাবু আছেন তো?

বলতে বলতেই লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে লম্বা চওড়া বিশাল দেহ পরেশ দত্ত বেরিয়ে এল। চিরঞ্জীবকে দেখে বলল, আচ্ছা, খোদ কর্তা দেখছি। ভালই হয়েছে, অনেক কথা আছে ভায়া। ভেবেছিলুম গাড়ি আরো সকাল সকাল আসবে। জটার কী হল?

চিরঞ্জীব বলল, ও আর আসবে না।

ইতিমধ্যে পরেশের ইশারায়, তার দুই অনুচরই বেরিয়ে গেল।

পরেশ বলল, জটা আর আসবে না কেন?

—সে অনেক ব্যাপার। বলব। গাড়িটা খালাস করে ফেলুন আগে।

পরেশ দত্ত লোকটির সর্বাঙ্গ ঘিরে, তার চোখে মুখে কথার ভাবে ও ভঙ্গিতে, একটি বিশেষ ধরনের দলপতির ছাপ। ঝুলে পড়া পেট, বুড়ো ষণ্ডের মত কপালের কয়েকটি ভাঁজ, রক্তাভ চোখ তাকে একটি মহিমা দিয়েছে। বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাকে বলাই তো আছে, আমার কম্পাউণ্ডে এনে তুলতে পারলেই হল। কতটা আছে?

চিরঞ্জীব বলল, দশটা আছে পাঁচ নম্বরি। চারটে দশ নম্বরি। অর্থাৎ পাঁচ আর দশ নম্বরের রবার ব্লাডার ভরতি আছে।

পরেশ দত্ত চেঁচিয়ে ডাকল, গুঁইরাম! এই গুঁইরাম! কালো মোটা লোমশ একটি লোক বেরিয়ে এলো।—কি বলছ?

—গাড়ি থেকে মাল্ খালাস ক'রে নে। এস ভায়া।

ঘরে গিয়ে বসল চিরঞ্জীব। বুধাই দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। চিরঞ্জীব দেখল, চারজন মনযোগ সহকারে সকাল বেলাতেই ফ্লাশ্ খেলছে। তাকিয়ে দেখল চিরঞ্জীবকে। একজন আর একজনকে যেন কী বলল ফিস্‌ফিস্ ক'রে। তারপরে আর একজনকে। পরে চারজনেই ফিরে ফিরে দেখল চিরঞ্জীবকে।

একজন বলে উঠল, দাদা তো শুনলাম, হুগলির চ্যামপিয়ান হ'য়ে গেছেন। কারবার আপনারই জোর। কিন্তু কোর্টে কেস্ প্রায় নেই বললেই নাকি চলে।

চিরঞ্জীব সিগারেট ধরিয়ে বলল, তাই নাকি ?

—শুনি তো তাই। তবে মোশাই, ছুঁড়ি একখানি যা বাগিয়েছেন। আবগারির বাবার সাধ্যি কি ওকে ধরে। বীণাকে আনেননি আজ ?

পরেশ বলল, নাও হয়েছে, যা করছ তাই কর দিকিনি। এদিকে কাজ আছে আমাদের।

চিরঞ্জীবের দিকে ফিরে বলল, নালিশ আছে ভাই তোমার ওপরে।

চিরঞ্জীব বলল, কী রকম ?

পরেশ বলল, টাটকা কড়া জিনিসের জন্য তোমাদের কাছে ছুটোছুটি। কিন্তু মালটা ভাল আসছে না। আর বড্ডো কারবাইড ফারমেন্টেশন হ'চ্ছে।

যুগপৎ বিস্ময় ও সন্দেহে চিরঞ্জীবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বলল, কি ক'রে বুঝলেন।

—ও ভাই জহুরীরাই জহর চেনে। যারা ধরবার, তারা ঠিক ধরে ফেলছে। কম্‌পিটিশনের মার্কেট। এ্যাদ্দিন যারা আমার জিনিস খাচ্ছে, তারা দেশী বিলিতি মদ দোকান থেকে কোনোদিন কিনে খায় না। টাকা তাদের আছে। আমার খদ্দের বড় বড় ব্যবসায়ী, উকীল, ডাক্তার, এ অঞ্চলের সব বড় বড় নেশুড়েরা। তারাই

বলেছে, 'পরেশ তোমার জিনিস খেয়ে এবার দেখছি, গ্যাস হ'য়ে পেট ফেটেই মরে যাব।' কারবাইডের গন্ধও চাপা থাকছে না। জটাকে বললে বলে, 'ওসব আমি কিছু জানি নে। আমাকে যেমনটি দেয়, আমি তেমনটি এখানে পৌঁছে দিয়ে যাই। ভাল না লাগে তো আমাদের মাল বন্ধ ক'রে দিন।'

চিরঞ্জীব গম্ভীর হ'য়ে বসে রইল চুপচাপ। পরেশ বলল, কি হল, চুপচাপ যে? চিরঞ্জীব বলল, ভাবছি। এ কারবারে দেখছি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু, আমরা তো কোনোদিন কারবাইড দিয়ে চোলাই করি নে। আর জল মেশানোর কারবারও আমাদের নেই। জিনিস পাঠাই একরকম, শুনছি আর এক রকম। আমি জানি একাজ কে করেছে।

পরেশ বলল, আমিও জানি এ কার কাজ। তোমার ওই জটা সাকরেদটি সুবিধের নয়। তার সম্পর্কেও অনেক কথা আছে। আমার এখানে দশরকম লোক আসে। সারা দিন রাত্রিই এখানে খেলা হয়। আমার এখানে নিয়ম হচ্ছে, খেল, খাও। যত খুশি। কিন্তু মেয়েমানুষের কারবার চলবে না। ওই একটি জাত। যেখানে যাবে গণ্ডগোল পাকাবে। ওসব চাও তো পাড়ায় চলে যাও, এখানে নয়! কেউ কোনোদিন আনেও নি। জটার সঙ্গে বীণা আসত। বুঝতাম সকলেরই চোখ ওদিকে। তবে দিনের বেলার ব্যাপার। বিশেষ কিছু ঘটত না। যারা খেলে জিততো, তারা সবাই বীণাকে দু' এক টাকা দিত। একটু হয়তো হাতটা ধরত। কাছে বসাতো। ওকে কেউ বলতো 'টেক্কা', কেউ 'ইস্কাবনের বিবি।' যার কাছে ও বসত, তা'রই নাকি জিত্। আর শত হ'লেও মফস্বলের মেয়ে তো। বেশ্যাদের ছেনালীটা শেখেনি। তা' আমার কি বলার আছে, বল? রোজকার ব্যাপার তো নয়। আর দু' চারটে টাকা যদি মেয়েটা ওই ক'রে পেয়ে যায়, আমার আপত্তি কী? বীণাকে দেখলে কারুর কারুর হাতও দরাজ হ'য়ে উঠত। খাবার

দাবার আনিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড ক'রে ফেলত। একটু আধটু হল্লা যে তাতে না হ'ত, তা' নয়। আমার খদ্দেরদের মুখ চেয়ে আমি চুপ ক'রে যেতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ঘুরতে লাগল। একদিন সন্ধ্যে বেলা বীণাকে নিয়ে জটা এসে উপস্থিত। মাল নিয়ে কাজে আসেনি। এমনি। জটা বললে, 'খেলব।' আমি বললুম, 'চন্দননগরে খেলার জায়গা পেলে না?' বললে, 'একদিন আপনার এখানেও খেলে যাই।' বললুম, 'কিন্তু ও মেয়েটাকে নিয়ে এসেছ কেন এখানে রাত ক'রে?' বললে, 'কিছুতেই ছাড়লে না। তবে ওসব কিছু ভাববেন না। ও মেয়ে কারুর সঙ্গে ঢলাতে যাবে না। ও হচ্ছে আমার।' মনে মনে ভাবলুম, 'আমার তো বাবা এ জুয়ার আড্ডায় তাকে এনেছ কেন? মাল পাচারের জন্য ওকে দরকার। ওই করেই ছেড়ে দাও। আবার পরেশ দত্তর এখানে কেন?

চিরঞ্জীব কথাগুলি না শুনে পারছিল না। সে এতদূর আশা করেনি। বুধাই এসে বসেছে কাছে। পরেশ দত্ত তার মোটা ভাঙা গলায়, চাপা স্বরে অবিশ্রান্ত জটা-বীণা কাহিনী বলে চলেছে। তার মুখের মাংসে বড় একটা ভাব খেলে না। কথার সঙ্গে সঙ্গে শুধু চোখে সমস্ত ভাব ফুটে ওঠে।

চিরঞ্জীব বলল, তারপর?

পরেশ দত্ত বলল, তারপর, গণ্ডগোল সেই রাত্রেই। বীণাকে কোলের ওপর বসিয়ে একজন খেলা আরম্ভ করল? আর বীণা দেখলুম এর মধ্যেই ট্রেনিং পেয়েছে ভাল। তাকে এতদিন আদর ক'রে যে-দু' এক টাকা ক'রে সবাই দিত, সেটা আরো বেশী ক'রে আদায় করার ফন্দী। আমার চোখকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। আড়াল থেকে জটার সঙ্গে বীণার চোখাচোখি করা দেখেই বুঝলুম। সবটাই ও ছোঁড়ার কারসাজি। তারপর হল্লা আরম্ভ হ'য়ে গেল। হবেই, ও শালা, জোঁকের মুখের বাটি। একবার চেপে বসলে,

পুরো রক্ত না শুষে সে ছাড়ে না। কোলে বসানোই আর থাকল না। এ একটা চুমো খায়, ও চেপে ধরে। টানাটানির মাঝখানে বীণা দিব্যি টাকা হাতাচ্ছে। ওদিকে ভয়ও আছে। কিন্তু সাহস দিচ্ছে জটা। কয়েকজন ভদ্রলোক খেলা ছেড়ে উঠে গেল। যাবার আগে আমাকে বলে গেল, 'দাদা সব জায়গাই দেখছি সমান। আমাদের নসীব খারাপ। জটাকে ডেকে বললুম, 'তোমার লাষ্ট ট্রেনের সময় হ'য়ে গেছে, কাটো এবার। ও ছুঁড়িকে নিয়ে আর কোনোদিন আসবে না।' চলে গেল, কিন্তু ও শালা বিষ্ঠা খাওয়া কুকুর। মেয়েটাকে দিয়ে টাকা রোজগারের স্বাদ পেয়েছে, আর কখনো ছাড়ে? তার ওপরে অমন ফোকটের টাকা। শুধু হাত ধ'রে কোলে বসেই যদি এক একদিনে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা রোজগার হ'য়ে যায়। আর জটা এটাও বুঝেছিল, আমার খদ্দেররা চায়। তাই আমাকে আর রেয়াৎ করতে চাইলে না। প্রায়ই আসতে আরম্ভ করলে। তবে ভাই, এটা আমি বলব, ও ছুঁড়ি জটা অন্ত প্রাণ। ওর নিজের কোনো ছলাকলা ছিল না। যা শেখাত জটা, তাই করত। জটা, ওকে মরতে বললে মরতেও পারত।

বুধাই ব'লে উঠল, আর তাই মরেছে মেয়েটা। একেবারে মরেছে।

পরেশ বলল, মানে?

—মানে মরা যাকে বলে। জটা ওকে মরতে বলেছে, তাই শেষ মরা মরেছে।

পরেশ বলল, দাঁড়াও, তোমাদের কথাটা পরে শুনব। আমি ব'লে নিই, কারণ, চিরঞ্জীব ভায়াকে আমার সব বলা দরকার। তারপর দেখলুম, বেগতিক। আশেপাশে লোক জানাজানি হচ্ছে। যাদের মাসকাবারি ঘুষ দিয়ে আমার কারবার, তারাও ঘাবড়ে গেল। ভাই জীবনে তিনবার জুয়া খেলেছি। সোয়া লক্ষ টাকা নষ্ট করেছি। সম্পত্তি আমাদের কিছু ছিল। আর খেলিনি, খেলাই শুধু এখন।

তিন পুরুষ আগের এই বাড়িটি ছাড়া আর কিছু নেই। লোকে জানে, পরেশ দত্ত নাম করা গুণ্ডা। তবে হম্বিতম্বিই করেছি। কারুর গা'য়ে হাত তুলিনি। কিন্তু জটাকে একদিন অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে মারতে হল। বেধড়ক মারলুম। জটা বললে, 'পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন পরেশবাবু।' ছেড়ে দিয়ে বললুম, 'আর যেন কোনোদিন তোমাকে বাগবাজারে না দেখতে পাই। বীণা গাড়ি নিয়ে আসবে, জিনিস দিয়ে চলে যাবে। তারপর চিরঞ্জীবকে যা জানাবার তা আমি জানাব। যাও, চলে যাও।' তোমাদের কিছু বলেনি জটা!

চিরঞ্জীব বলল, এ সব বললে, ফয়সালা তো অনেক আগেই হ'য়ে যেত। তা' হ'লে আজ ওকে অত সহজে ছাড়তুম না। হয়তো মারতে মারতে ওর একটা অঙ্গহানি ক'রে ছাড়তুম।

পরেশ দত্ত বলল, তুমিও মেরেছ ওকে?

বুধাই বলল, আজ ভোরেই হয়েছ। একেবারে ঘুম থেকে তুলে। আর ওই যে বললুম. ছুঁড়ি একেবারেই মরেছে। এখন পুরোপুরি ব্যবসা আরম্ভ করেছে। তবে, মেয়েটা মাস কয়েক পোয়াতি হয়েছে। জটা ঘেঁচিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। সেই কথাই তখন তোমাকে বলছিলুম চিরঞ্জীব, বীণা আর কোনোদিনই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না।

পরেশ দত্ত বলল, আরো আমার সন্দেহ হচ্ছিল, জটা শুধু তোমাদের মাল পাচার করত না। কার্তিক ঘোষের মালও তোমাদের ব'লে চালিয়ে দিত।

চিরঞ্জীব বলল, তা' বুঝতে পারছি। এবারেও কিছু গণ্ডগোল ক'রে রেখেছে কিনা জানি না। এর পরের বার দেখবেন তো। তবে কিছুদিন আর এভাবে আসবে না। বড় বড় বিচুলীর লরীতে মাল আসবে। আপনাকে লোক দিয়ে আনিয়ে নিতে হবে। ঠিকানাটা কাছেই। খালধারে যে-বিচুলী কাটার কলটা আছে মধুসূদন

তেওয়ারির, সেখানে আসবে। সঙ্গে আসবে গুলি। গুলিকে চেনেন তো?

—চিনি।

—আর আগের মত নৌকোয় ক'রেও কিছু কিছু পাঠাব। খবর পাবেন। আর একটা কথা।

—বল।

—টাকা অনেক বাকী ফেলেছেন।

—অনেক নয়, বোধহয় গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ আছে।

চিরঞ্জীব ভ্রূ কুঁচকে বলল, তা কেন? প্রায় দেড়শো টাকা বাকী আছে।

পরেশ দত্ত লাফ দিয়ে উঠল।—হোয়াট? দেড়শো? নিয়ে এস তোমার জটাকে, হিসেব সমঝে দিচ্ছি। আমার কাছে ওসব গড়বড় পাবে না।

চিরঞ্জীব আর বুধাই চোখাচোখি করল। বুধাই বলল, ও-টাকার আশা ছাড়। মনে কর, আবগারিতে মাল ধরা পড়ে গেছে। বাকীটাই উশুল হোক।

চিরঞ্জীবের চোখ জ্বলছিল। সে চুপ ক'রে রইল সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে। পরেশ তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, ভাবনা ছাড় ভায়া। একটু চা'টা হবে তো?

চিরঞ্জীবের কোনো উৎসাহ নেই। পরেশ দত্তর আদরটা তার ভাল লাগল না। বলল, হোক। কিন্তু বাকী টাকাটা আর আজকের টাকাটা এক সঙ্গে দেবেন।'

—নিশ্চয়ই। খোদ কর্তা এসেছে আজ, বাকী রাখা চলে? গুঁইরাম!

গুঁইরাম কাছেই ছিল। বলল, বল।

—জিনিস উঠে গেছে?

—হ্যাঁ।

—সব ঠিক আছে ?

—হ্যাঁ। ব্লাডার সব ধুয়ে তুলে দিয়েছি।

—*আচ্ছা, একটু চা টা নিয়ে আয়।*

তারপর চিরঞ্জীবের দিকে ফিরে বলল, তারপর শুনলুম, শুধু তোমাকে শায়েস্তা করার জন্যে নাকি তোমাদের ওখানে এক বাঘা আবগারি অফিসার এসেছে ?

চিরঞ্জীব বলল, আমাকে শায়েস্তা করার জন্যে কি না জানিনে। তবে নতুন লোক এসেছে। তাও প্রায় এক বচ্ছর হ'য়ে এল। শুনলুম, আগেকার মত এ অফিসার কোনো চুক্তিতে আসতে রাজী নয়।

পরেশ বলল, তা' না এসে পারে ? ঠ্যালার নাম বাবাজী। অনেক অফিসার দেখলুম বাবা। তোমাদের সঙ্গে আঁতাত না ক'রে, তাদের কখনো চলে ?

চিরঞ্জীব বলল, না, এ ভদ্রলোক নাকি ভীষণ কড়া আদর্শবাদী।

পরেশ দত্ত সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসল। বলল, একে পুলিশ, তায় আদর্শবাদী। সে আবার কি চীজ, জানিনে তো।

বুধাই বলল, বোধহয় গরুর নাম ধেনু সেই রকম আর কি !

চিরঞ্জীব না হেসে পারল না। কিন্তু কলকাতা থেকে ফেরার পথে যখন বুধাই আবার জিজ্ঞেস করল। চুপচাপ কেন ?

সেই একই জবাব দিল চিরঞ্জীব, ভাল লাগছে না।

বুধাই বলল, বেশী ব'লো না। আমি গাড়ি চালাতে পারব না।

চিরঞ্জীব বলল, আচ্ছা বুধাইদা', জটা তা' হ'লে বীণাকে ভালবাসেনি।

বুধাই তেমনি শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হেসে বলল, নিজের গরুকে সবাই ভালবাসে। তা' ব'লে তার দুধ বেচে না ?

বিরক্ত হল চিরঞ্জীব। বলল, গরুর কথা বলছিনে আমি। মেয়েমানুষের কথা বলছি। বুধাই বলল, গরুর মত মেয়েমানুষও আছে যে সংসারে, কি করব বল ? তা' ছাড়া—

একটা লরীর পাশ কাটিয়ে বলল বুধাই ; তোমাকে তো বলেছি, যেমন ক'রে হোক, সব বাঁচবার তালে আছে। নিজের কাছে কেউ কিছু নয়। যেমন ক'রে হোক ভালবাসা ভালবাসাই সই, তাই বেচে মেরে দিচ্ছে। কিন্তু—

একটা গরুর পাশ কাটিয়ে বলল, তুমি এসব ভেবে মরছ কেন? যা ভাবছিলে, ঠিকই ভাবছিলে। লঙ্কা পোড়াতে হবে, বুঝলে? এই সাজানো সোনার লঙ্কা পোড়াতে হবে।

সোনার লঙ্কা পোড়াতে হবে। কোথায় লঙ্কা, কেমন ক'রে আগুন লাগানো যায়, কে জানে। কয়েক বছর আগে, প্রথম যেদিন বেআইনি চোলাইয়ের মনস্থ ক'রে গ্রামে ঢুকেছিল, সেদিনও তার মনে হ'য়েছিল, একটা তছনছ করতে হবে। ভয়ংকর ভাবে সব ভেঙেচুরে আগুন জ্বালাতে হবে। পুড়িয়ে দিতে হবে সব কিছু। সত্য মিথ্যা, সৎ অসৎ, মায়া মমতা, সব সেই আগুনেই পোড়াতে হবে।

কিন্তু তার নিজের অতীতটাই বুঝি শুধু পুড়েছে। আর কোথাও কিছু পোড়েনি।

চন্দননগরে ফিরে, বুধাইকে নিয়ে একটা হোটেলে খেতে বসে বলল চিরঞ্জীব, বুধাইদা, কোথায় কেন আগুন লাগাতে যাব বলদিকিনি? ও একটা রোগ বোধহয়। বেশ তো আছি, আমার অভাব কিসের?

বুধাই তার মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি ভাতের মধ্যে ঢুকিয়ে বলল, ওই, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।

—কী রকম?

—ও আগুন তোমাকে ছাড়বে না।

—কী ক'রে বুঝলে।

—নিজেকে দিয়ে! তোমাকে দেখে।

চুপ ক'রে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল চিরঞ্জীব। বুধাই বলল, নাও, খেয়ে নাও। যন্তরে তেল দাও, বাঁচতে হবে তো। ব'লে হাসল।

ইন্দিরের কারখানা থেকে সাইকেল নিয়ে ফেরার পথে, বুধাই আর ইন্দির দুজনকেই ব'লে দিল চিরঞ্জীব, আমাদের সব লোককে জানিয়ে দিতে হবে জটার কথা। ওর সঙ্গে যেন কেউ যোগাযোগ না রাখে।

তারপর মনে মনে ভাবল, কত আগে দুর্গা ওই জটাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিল। এবার দুর্গা কথা শোনাবে।

॥ পাঁচ ॥

বিকাল বেলা বলাই সান্যাল পায়চারী করছিল আবগারি বাড়ির কাছে। তার নিজেরও বাড়ি বটে। যে-রাস্তাটার এক পাশে পুকুরের ধার ঘেঁষে ঘন চিতে গাছের বেড়া। আর একদিকে বাঁশঝাড়। রাস্তাটা দক্ষিণে কানা, আবগারির পুরনো দোতলা বাড়িতেই শেষ। উত্তরে এসে বাঁয়ে বেঁকে স্টেশনে গিয়েছে। পশ্চিমে বাঁক নিয়ে গিয়েছে গ্রামের অভ্যন্তরে।

ইনস্পেক্টরের ইউনিফর্ম ছিল না বলাইয়ের। খাকী প্যান্টের সঙ্গে সাদা সার্ট। তে-রাস্তার মোড় পর্যন্ত তার গতি। সে চিন্তিত নয়। বিষণ্ণ। ব্যস্ত নয়, কেমন যেন উদাস ও গম্ভীর। লক্ষ্য করল না, ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে মলিনা তাকে দেখছে। মলিনার পিছনে, নারকেল গাছের সারি। গাছের মাথায় ছুঁয়েছে বিশাল কালো একখণ্ড মেঘ। মলিনা যেন উজ্জয়িনীর প্রাসাদ শিখরে বিরহিণী যক্ষিণী।

বলাই মলিনার কথাই ভাবছিল। কিছুক্ষণ আগেই তাদের কথা কাটাকাটি হয়েছে। মলিনার যেন ধ্যানের নায়ক নায়িকা চিরঞ্জীব আর দুর্গা। হয় তো বলাই যতখানি ভাবচে, ততখানি নয়। তবু চিরঞ্জীব আর দুর্গার প্রতি তার যেন সবল সমর্থন। যেন কী এক

বিচিত্র আকর্ষণ তার। আর এই কথাটা যতই ভাবে, ততই মনে হয়, মলিনার নিজের জীবনের কোথায় একটি অপূর্ণতা আছে। একটি ব্যথা ধরা শূন্যতা। সেটা যে শুধু নিঃসন্তান নারী জীবনের শূন্যতা, তা নয়। কিংবা জীবনের এই অসার্থক দিকটা জড়িয়েই সেটা যেন ভালবাসার শূন্যতা। যে-শূন্যতার দায় বুঝি বলাই ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারে না। যদিও মলিনা নিঃসংশয়ে, নিঃশেষে ভাল-বেসেছে বলাইকে। তবু সেই চিরকালের ব্যথাটা বুঝি একটু বেশী করেই বাজে তার। স্বামীর মধ্যে মনের মানুষের পূর্ণ রূপ সে খুঁজে ফিরেছে। কে তা পায়। কজনা পায়, কে জানে। বলাই নিজে জানে, মলিনার পথে কত বাধা সেখানে। বলাইয়ের চিন্তা, বলাইয়ের জীবিকা, কোনোটাই মলিনার মনের মত নয়। ভাবাযোগপূর্ণ যে-রোমান্টিক জীবনের স্বপ্ন দেখেছে সে তার ছেলেবেলা থেকে, সে স্বপ্নটা বোধহয় কখনোই বাস্তব রূপ পেল না। বলাইকে যদি ভাল না বাসত, তা হ'লে ফাঁকি দিয়ে হেসে দিন কাটাতে পারত। কি নেই ব'লেই তুচ্ছ প্রেমের কথায়ও বড় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে মলিনা। চিরঞ্জীব আর দুর্গার কথায় তার দীর্ঘশ্বাসও যেন প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। যাদের জীবনে প্রেম দূরের কথা, কোনো নৈতিক সমর্থনও খুঁজে পায় না বলাই।

বিষণ্ণ উদাস বলাই পায়চারী করতে করতে এসব কথা ভাবছিল। আর ঠিক সেই সময়েই চিরঞ্জীব পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল স্টেশনের দিকে। এরকম কয়েকবারই হয়তো দেখা হয়েছে দুজনের। চেনেও দুজনে পরস্পরকে। কেউ কখনো কথা বলে নি। কারণ চিরঞ্জীব কোনো-দিন অক্রুরদের মত আভূমি নত হ'য়ে, নমস্কার করে আবগারি দারো-গাকে তোষামোদ করেনি।

আজ সহসা বলাই ডেকে বসল চিরঞ্জীবকে, শুনুন।

চিরঞ্জীব চলতে চলতেই, ভ্রু কুঁচকে মুখ ফেরাল। বলাই বলল, আপনাকেই ডাকছি, একটু শুনুন।

আলসের ধার থেকে সরে পালাতে গিয়েও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল মলিনা। চিরঞ্জীবকে সে মাত্র একদিন দেখেছিল। তবু চিনতে পারল। তার বুকের মধ্যে ধক্‌ ধক্‌ করতে লাগল উত্তেজনায়। কী করতে চায় বলাই?

চিরঞ্জীব থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

একটু সন্দিগ্ধ কিন্তু অপ্রতিভ হল না চিরঞ্জীব। বলাইয়ের চোখের দিকে তাকাল সে। বাঘ না 'বলে বোধ হয় উপায় ছিলনা তাকে। একহারা বলিষ্ঠ, চওড়া কাঁধ, উসকো খুসকো চুল আর তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ, সব মিলিয়ে কেমন একটা কঠিন ঋজুতা বলাই বলল, আসুন না, অফিসে একটু কথা বলা যাক। আপত্তি আছে?

রীতিমত ভদ্র আমন্ত্রণ। এক মুহূর্ত ভাবল চিরঞ্জীব। বলাই হেসে বলল, নির্ভয়ে আসতে পারেন।

চিরঞ্জীব বলল, জানিনে কি কথা বলতে চান। বলুন।

পথে যে দু' একজনের অনাগোনা না ছিল, তা নয়। তারা থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো! অফিস ঘরে কেউই ছিল না। কাসেম বসেছিল দেউড়ির বাঁধান রকে, সেও অবাক হয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে চুপ ক'রে রইল। কেবল আপাদমস্তক দেখল একবার চিরঞ্জীবের।

বলাই অফিসে ঢুকে বলল, বোধহয় ভুল করিনি, আপনি চিরঞ্জীব ব্যানার্জি তো?

—হ্যাঁ।

—বসুন।

চিরঞ্জীব বসল। বলাই কোনো ভূমিকা না করেই প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে হয় তো বিশ্বাস করা কঠিনই হ'ত। কিন্তু কেন এ পথে এলেন বলুন তো?

চিরঞ্জীব এক মুহূর্ত বোধহয় হকচকিয়ে গেল। প্রায় ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনাল কথাগুলি। পরমুহূর্তেই তার ঠোঁটের কোণ,

ছুটি বেঁকে উঠল। বলল, আপনার জেনে কোনো লাভ নেই স্যার।

—কেন ?

—জেনেই বা কী করবেন ? এরকম কত ব্যাপার ঘটছে জেনেই বা কে কী করছে ?

বলাই বলল, তা ঠিক। অক্রুরদের মত লোক হলে আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না। আপনাকে বলেই জিজ্ঞেস করছি। আপনাদের মত ছেলেরা এ লাইনে এলে আর বাকী থাকল কী ?

চিরঞ্জীব হেসে বলল, সবাই কি লাইন ঠিক রেখেছে এ দেশে ? কেউ কি রেখেছে বলতে পারেন ? আমার তো ধারণা, যাদের যে-লাইনে যাবার কথা ছিল, সবাই তার উল্টো পথ ধরেছে। নিজে থেকে ধরেনি, কপালে জুটে যায় বোধহয়।

বলাইয়ের মনে হল, কথাটা তার ওপরেও হয় তো প্রযোজ্য। শৈশবে কৈশোরে যৌবনের শুরুতে সেও তো কত স্বপ্ন দেখেছিল। কত স্বপ্ন। স্বপ্নগুলি হয় তো মধ্যবিত্ত মনের বাঁধাধরা ছকের মধ্যেই ছিল। কিন্তু আবগারি বিভাগটা একবারো সেই ছকের মধ্যে দেখতে পায়নি। প্রথম যেদিন চাকরিতে যোগ দিয়েছিল, সেদিন টেরও পায়নি, তার পথ গিয়েছে বদল হ'য়ে। চাকরি জীবনের নতুনত্বের স্বাদ বরং খানিকটা এ্যাডভেঞ্চারিস্ট ক'রে তুলেছিল। সে মনে প্রাণে একজন আবগারি অফিসার হ'তে চেয়েছিল। কিন্তু মলিনার স্পর্শে এসে সে জানল, এ জীবিকা তার কাম্য ছিল না। অথচ আজ আর কোনো উপায় নেই। সুরেশবাবুর কথা ভাবতেও ভয় করে তার। একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক আবগারি অফিসারের পরিণতি সে দেখেছে। আরো দেখেছে। কিন্তু সেসব এখন আর ভাবতে চায় না বলাই।

কিন্তু চিরঞ্জীবের কথার মধ্যেও অযৌক্তিকতা ছিল। যদিও, চিরঞ্জীবের সামনে বসে এ ভাবে কথা বলতে এখনো মন দ্বিধাবোধ করছে। সঙ্কোচ হচ্ছে। একটা পরাজয়ের সূক্ষ্ম খোঁচা যেন লাগছে

কোথায়। তবু সে বলল, সকলের লাইন ওলটপালট হয়নি। আপনাদের অক্রুরদে'র এটাই তো স্বাভাবিক লাইন। নয় কি? তাদের নিয়ে কথা বলতে চাইনে। তাদের যদি লাইন কিছু থেকে থাকে, তবে এইটাই। লাইন আসলে কিছুই ছিল না ওলটপালটের প্রশ্নও নেই। যাদের পথের কথা ভাবা ছিল, তবু ওলটপালট হ'ল, তাদের বিষয়ই বলতে ইচ্ছে করে। মেনে নেব আপনার কথা। দিনরাত্রি জীবন ও জীবিকার এই প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়া দেখছি। কিন্তু এ পথে কেন চিরঞ্জীববাবু?

চিরঞ্জীবের ঠোঁটের কোণে হাসিটা হাসি নয়। বাঁকা ছুরির ঝিলিক। বলল, তিলে তিলে মরণের ভাল পথগুলোও দেখেছি স্যার। যার পেট ভরল না, তবু ঘরের ইজ্জৎ গেল, তার মরণের দুঃখের কথা খবরের কাগজে পড়তে আমার ঘেন্না করে। মাপ করবেন স্যার, আমি চলি।

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। বলাই দেখল, চিরঞ্জীবের দু' চোখে অঙ্গারের জ্বলুনি। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দপদপে তার সারাটা মুখ-ই। যেন ধোঁয়ানো আগুন সহসা দমকা বাতাস লেগে, গন্‌গনিয়ে উঠেছে।

বলাই তাড়াতাড়ি বলল, আর একটু বসুন, আর একটু। চোলাইকরদের ডেকে বসানো আমার রীতি নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। একটু বসুন। আমি আপনার সব কথা জানতে চাই। আপত্তি না থাকলে, একটু বলুন।

চিরঞ্জীব না বলেই বলল, বলার মত কিছু নেই আমার সান্যালবাবু। কিছু চাপা নেই, কিছু খোলাও নেই। এ কোনো বেকায়দার চালের খেলা নয়। আমার ঘরের ঘুঁটি আপনি যেদিকে চালবেন, সব গিয়ে এক জায়গায় উঠবে। ম'র হতেই হবে। যার পেট ভরা খিদে রইল, ইজ্জৎও গেল, সে হল বারোয়ারীতলায় পুজোর ঢাকের মত। যে আসে, সবাই একবার ক'রে চাটি মেরে যায়।

তাকে সবাই উপদেশ দেয়। তবু ঢাক তো। খোল থাকবে, চামড়াটা ফেঁসে যাবেই। আপনিও স্যার দুটো চাটি মেরে বোল্ তুলতে চান, তুলুন। ঢাক ঢাকই থাকবে।

বলাই খানিকটা স্তব্ধবিস্ময়ে থ' হ'য়ে রইল যেন। শুধু ঝোঁকের বশে নয়, চিরঞ্জীবের যুক্তিও আছে। যতটা স্থূল সে মনে করেছিল, ততটা স্থূল নয়। বলাই বলল, যার যেখানে কষ্ট, সে-ই সেটা বোঝে সবচেয়ে বেশী। আপনাকে আমার বোঝানার কিছু নেই। কিন্তু একথা কি আপনাকে আর কেউ মনে করিয়ে দেয় না, আপনি ছিলেন এ অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের একজন নেতা!'

—নেতা নয় স্যার, কর্মী।

যেন ভুল সংশোধন ক'রে বলল চিরঞ্জীব, আর আমিই সেটা সবচেয়ে ভাল জানি, ও রাস্তা আমার জন্য ছিল না। যারা না খেয়ে মরেছে, যাদের জন্য কৃষক সমিতির নিশান নামিয়ে শ্রদ্ধা দেখিয়েছি, তাদের জ্বালা তাইতেই জুড়িয়েছে, আমি বিশ্বাস করিনে।

বলতে বলতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল চিরঞ্জীবের! হঠাৎ মনে হ'ল, এসব কথা কেন সে আবগারি ইনস্পেক্টরের সঙ্গে আলোচনা করছে। ক্রশ বেল্টকে সে বরাবর বিদ্বেষের চোখে দেখে এসেছে। এদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তার মজ্জায় মজ্জায়। যে-কথা সে শ্রীধরদা কিংবা আর দশজনের সঙ্গে আলাপ করতে পারে, সেকথা বলাইয়ের সঙ্গে আলাপে তার শুধু অনিচ্ছা নয়। রাগ হচ্ছে তার! তাই সে তাড়াতাড়ি বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আপনি দারোগাগিরি করছেন না, রাজনীতি করছেন।

একটু খোঁচা লাগল বলাইয়ের। কিন্তু সে হজম করল সেটা। লক্ষ কথার রাশ টেনে সে বলল, যে-নীতিই বলুন, এসব আপনাকে বলেই বলছি। অল্প বয়স আপনার। আপনার কুখ্যাতির তুলনায় অনেক ছেলেমানুষ আপনি। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন—

—আমার চেয়ে অনেক বেশী লেখাপড়া জানা, অনেক বড়লোককে আমি অনেক খারাপ কাজ করতে দেখেছি। হয় তো সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলুম। কিন্তু ওটা কিছু নয়।

—আপনি যে লাইনে এসেছেন, সে লাইনে অনেক কিছু। তারপরে আপনাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনটা কি কিছু নয়? হুগলি জেলার ইতিহাসে আপনাদের বংশের নাম দেখা যায়। আর আপনি —

বলাই দেখল চিরঞ্জীব দরজা পার হ'য়ে সিঁড়িতে পা' দিয়েছে চলে যাবার জন্যে। বলাই ছুটে গিয়ে বলল, চলে যাচ্ছেন যে?

চিরঞ্জীবের মুখখানি যেন পুড়ে গিয়েছে, বুকের আগুনেরই ধাক্কা বুঝি তার চোখের তারা দুটি ঝাপসা ক'রে তুলেছে প্রায়।

সে যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, আপনি কি আমাকে ঠাট্টা করছেন ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের কথা বলে? ফ্যামিলি? আমাদের ফ্যামিলি? ওর আবার জেলার ইতিহাসে নাম?

বলতে বলতে গলা রুদ্ধ হ'য়ে এল চিরঞ্জীবের। প্রায় চুপি চুপি ভাঙ্গা গলায় সে বলল, জানেন না, আমাদের ট্র্যাডিশন আজকে মহকুমা শহরের বারোয়ারী বাজারে বিকোয়? তাতে এদেশের কোথায় কতটুকু এসে গেছে? আপনি আমার সঙ্গে মিছে এভাবে কথা বলছেন। আমি মদ চোলাই করি, স্মাগল করি, আপনি আমার সঙ্গে সেইভাবেই ট্রীট্ করুন। আমি যাচ্ছি।

—দাঁড়ান।

বলাই সামনে এসে দাঁড়াল চিরঞ্জীবের। অফিস ঘরের উঠানটা ফাঁকা। উঠোনের উল্টোদিকে সাবর্ডিনেট স্টাফদের ঘর। ঘর বন্ধ। এস আই অখিলবাবুর নেতৃত্বে একদল আজ দুপুরেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে। কাসেম সবই শুনছিল দেউড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে। এবার সে বলাই ও চিরঞ্জীব, দুজনকেই দেখতে পেল।

বলাইয়ের মুখেও উত্তেজনার ছাপ। সে বলল, দাঁড়ান। সে

ভাবে যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, ভালই হত। পারছিনে ব'লে, নিজেরই দোষ দিচ্ছি। হয় তো না জেনে আপনার কোনো বিশেষ স্থানে আমি ঘা দিয়েছি। কিন্তু আপনি এ পথ ছেড়ে দিন চিরঞ্জীববাবু। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি।

চিরঞ্জীব তীব্র চাপা গলায় হেসে উঠল। বলাই বলল, হাসবেন না। আপনি অনেক শত্রু বৃদ্ধি করেছেন। আপনি, হাটে বাজারে, আপনার নামে, কৃষক-সমিতির নতুন পোস্টার দেখেছেন?

দর্পিত ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জন ক'রে উঠল চিরঞ্জীব, দেখেছি। পোস্টার দেবে, তাও আমি জানতুম। মুরোদ বড় মান স্যার। দেখা যাক, শ্রীধরদাস বিপ্লবী আমার কী করতে পারে?

মিথ্যে নয়, কৃষকসমিতির থেকে চিরঞ্জীবের নাম ক'রে পোস্টার দিয়েছে কৃষকসমিতি। বিমলাপুরের মিটিং-এ এই শ্রীধরদা বিষোদ্গারণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে। বলেছিলেন, শুধু কৃষকসমিতি থেকে বিতাড়ন নয়। ওকে গ্রাম থেকে, এ অঞ্চল থেকে তাড়াতে হবে। বাস করা অসম্ভব ক'রে তুলতে হবে এইসব শ্রেণীর লোকেদের। এদের সঙ্গে কথা বন্ধ করতে হবে। সামাজিক সম্পর্ক ছাড়তে হবে। কৃষক সমিতির যে সব বন্ধুরা এদের পাল্লায় পড়েছেন, সরে আসুন। এ আমাদের ইজ্জতের আর মানের কথা। গ্রামের লোকেরা ওকে ত্যাগ করুক, ধরিয়ে দিক। সুযোগ পেলেই ধরিয়ে দিতে হবে। চিরঞ্জীব বিশ্বাসঘাতক, ও আমাদের সব রকম ক্ষতিসাধন করতে পারে। আমাদের যারা শত্রু, এই সব অসামাজিক নোংরা লোকেরা তাদেরই বন্ধু। এরা আর এক দিক থেকে জমিদার জোতদার মহাজন সরকারেরই দোসর। এরাই সরল নিরীহ কৃষকদের আজ বিপথে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। আজকে আমাদের সামগ্রিকভাবে লড়তে হবে।

কৃষকদের চরিত্রবলের ওপর জোর দিয়েছেন শ্রীধর। একবারও চিন্তা করেননি, তিনি সত্যিই একজন বে-আইনী চোলাইকরের বিরুদ্ধে

শুধু কথা বলেননি। তিনি চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে, বেশী নিষ্ঠুর হয়েছিলেন। সেটা রাগে ও যন্ত্রণায়। চিরঞ্জীবের ঔদ্ধত্য তাকে রুদ্র ক'রে তুলেছে। একটা পুরনো হতাশা তাকে আবার নতুন ক'রে নির্মম করেছে। তিনি একথা বলতেও দ্বিধা করেননি, আঘাত করুন। গ্রামে ঢোকা বন্ধ ক'রে দিন। যেখানে পাবেন, ধরে শায়েস্তা করুন।

বিমলাপুরের সেই মিটিংএ যদিও কৃষি ঋণ ও টেস্ট রিলিফ ও আগামী বছরের ধানের দরের ওপরেই প্রধানত বলার ছিল শ্রীধরের, তবু এ বিষয়ে অনেকখানি বলেছিলেন। কেউ কেউ অবাক হয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় ইতিপূর্বে এ সব বিষয় এভাবে কেউ বলেননি। কৃষকেরা বিশেষ কথা বলতে পারেনি। একটা অস্বস্তিকর বিস্ময়ে অধিকাংশরাই চোখাচোখি করেছিল।

তবু, তারপরেই আঁকাবাঁকা লাল অক্ষরে বাজারে স্টেশনে পোস্টার পড়েছিল, 'চোরা চোলাইকর চিরঞ্জীবকে বয়কট কর।' 'চোলাইকরদের শায়েস্তা কর। উহারা কৃষকের শত্রু।'

বিমলাপুরের যে সব লোকেরা চিরঞ্জীবের দলে ছিল, তারা সত্যি সত্যি দল ছেড়ে গিয়েছে অনেক। কথা বন্ধ করেছে অনেকে তার সঙ্গে। যদিও ওই ব্যাপারের পর, সাত দিনের মধ্যেই, তিনজন স্মাগলারকে জামীনে খালাস ক'রে আনতে হয়েছিল শ্রীধরকে। আর তারা কেউই চিরঞ্জীবের দলের লোক ছিল না। তারা নিজেরাই চোলাই ক'রে স্মাগল করতে গিয়েছিল।

কিন্তু চিরঞ্জীবের দল একটুও ভাঙেনি, একথা বলা যাবে না। তাতে, চাকে ঢিল খাওয়া ভীমরুলের ক্রোধ বেড়েছে বৈ কমেনি। দুর্গা নতুন নতুন মেয়েদের নিয়ে দল তৈরী করেছে। যার সবটুকু চিরঞ্জীবও জানে না।

বলাই বলল, শ্রীধরবাবু একজন জনপ্রিয় এম. এল. এ। তিনি আপনাকে ভালবাসতেন। আজ তিনিই আপনাকে ধরিয়ে দিতে

চাইছেন। তাঁর দলের সমস্ত লোক আপনাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। এবার আর আপনি রেহাই পাবেন না চিরঞ্জীববাবু।

চিরঞ্জীব উঠোনে নেমে বলল, চ্যালেঞ্জ? দেখা যাক।

—দাঁড়ান।

এবার হুকুমের সুর ফুটল বলাইয়ের গলায়। সামনে এসে বলল, আমি আবার বলছি, এ পথ আপনি ছাড়ুন।

চিরঞ্জীব বলল, এত লোক থাকতে আপনি আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন?

—কেন জানতে চান? বললে হয় তো আপনি একটা ঝানু স্মাগলারের মত আমার উইকনেস ব'লে মনে করবেন সেটা। কিন্তু গোটা জেলার মধ্যে আপনি হচ্ছেন সব চেয়ে রিমার্কেবল্ নটোরিয়াস্ আর সব চেয়ে বেশী পপুলার চোলাইকর আর চালানদার।

—এর মধ্যে পপুলারিটির কী আছে?

—সেটা বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য, তারা ক্রিমিন্যাল হিরোইজমেও আনন্দ পায়, উত্তেজনা বোধ করে। আর সীক্রেট রিপোর্ট জানতে চান আপনি? তাও বলছি, আপনাকে এ পর্যন্ত একবারও না ধরতে পারাটা আমার ডিজ্‌ক্রেডিট্ ব'লে প্রমাণ হ'তে চলেছে।

চিরঞ্জীব ঠোঁট উল্টে বলল, তা হতে পারে। সুরেশবাবুর মুখে শুনেছিলুম, আপনি তরাইয়ের বাঘ।

বলাই বলল, বোধহয় সেইটেই অসুবিধে। এই সহজ সমতলে আমি অনভ্যস্ত। এখানে যে গ্রামের ভদ্র অভদ্র সকল ব্যক্তি এসব সমর্থন করে, তা আগে জানতাম না। কিন্তু এবার গ্রামের লোকেরা আপনাকে ধরিয়ে দেবে।

—দেখা যাক তবে সেটা।

—হ্যাঁ, তাই দেখবেন।

বলাইয়ের চোখও তখন ধক্‌ধক্ ক'রে জ্বলছে। দুজোড়া চোখের আগুনে মেঘমেদুর সন্ধ্যায় যেন আগুন লেগে গেল। বলাই আবার

বলল, ভেবেছিলাম আপনার মধ্যে এখনো কিছু মনুষ্যত্ব আছে। সেইখানেই আমার দাবী ছিল।

চিরঞ্জীবের ঠোঁটের কোণে ছুরির বাঁকটা আরো শাণিত হল বললাম, মনুষ্যত্ব সুখী লোকদেরই একচেটিয়া থাকুক।

—কিন্তু চিরঞ্জীব মোটেই দুঃখী লোক নয়। একটি পাকা বদমাইস। একটা বাগ্‌দি মেয়েকে রক্ষিতা রেখে, মদ চোলাইয়ের ব্যবসা যে করে, তার বড় বড় কথা সাজে না।

'বাগ্‌দি মেয়েকে রক্ষিতা কথাটা শুনে চিরঞ্জীব চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল একবার কিছু বলবার জন্যে। চোয়াল শক্ত হ'য়ে উঠল। পরমুহূর্তেই পিছন ফিরল সে।

—দাঁড়ান। কী বলতে চাইছিলেন।

পথরোধ করে দাঁড়াল বলাই। কী এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে যেন কাসেমও চিরঞ্জীবের পিছনে এসে দাঁড়াল। তার চোখেও বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধের আগুন। হুকুম পেলে যেন, পোষা হিংস্র কুকুরের মত ছিঁড়ে ফেলবে চিরঞ্জীবকে।

চিরঞ্জীব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, বলতে চাইছিলুম, বড় কর্ত্তাদের কাছে নিজের ডিজক্রেডিট বাঁচাবার জন্যে এই সব কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তবে ডেকে এনে এ সব কথা বলার দরকার ছিল না। এবার আমি একটা কথা বলব?

ব'লে চিরঞ্জীব যেন রহস্য ক'রে হাসল।

—শুনি?

—সুরেশবাবুর সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি ছিল। আমাদের কোনো লোককে, স্মাগলের সময় পঁচিশ হাত দূরে দেখতে পেলে, তাকে ছেড়ে দেবেন। পেছন তাড়া করবেন না। আপনি কি এরকম চুক্তিতে রাজী আছেন আমাদের সঙ্গে?

কথা শেষ হবার আগেই বলাই চীৎকার ক'রে গর্জে উঠল, কাসেম, একটা বেত নিয়ে এস তো।

কাসেম ছুটে একটা লিক্‌লিকে সাপের মত পিঙ্গল বেত নিয়ে এল। বলাই বেতটা নিয়ে, চোখে চোখে তাকিয়ে, আঘাত করতে পারল না। কেবল চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমার ওই মুখ আমি চাব্‌কে থেতো করে দেব। নোংরা কোথাকার। গেট আউট, গেট আউট। দেখি তোমাকে আমি বামাল ধরতে পারি কি না।

ব'লে দুপা পিছিয়ে এসে বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বলাই। অফিসে ঢুকে গেল তাড়াতাড়ি। কাসেম ফিরে তাকাবার আগেই, চোখের নিমিষে অদৃশ্য হল চিরঞ্জীব।

তিন রাস্তার মোড়ে এসে থম্‌কে দাঁড়াল একবার চিরঞ্জীব। সে ভুলে গিয়েছে, কোথায় যাচ্ছিল। এখন কোথায় যাবে। তার দপদপে চোখের তারা অস্থির। যেন এই মাত্র সে বহুদূর থেকে দৌড়ে এসেছে, এমনি আরক্ত ঘর্মাক্ত তার মুখ। কেবল নির্জন খালধারের ছবিটাই এখন ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। যদিও আকাশে মেঘ আছে। বাতাসও ভেজা ভেজা। বেলা চলে গিয়েছে একেবারেই। অন্ধকার নামো নামো। তবু পশ্চিমে ঘুরে জঙ্গলে পা বাড়ালো সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শুনতে পেল এদিকে এস। ওদিকে কোথায়?

চিরঞ্জীব দেখল, আঁসসেওড়া আর কালকাসুন্দের ঘন ঝোঁপে দুর্গা। জঙ্গল মাড়িয়ে কাছে ছুটে এল সে। ত্রাসে ও উৎকণ্ঠায় যেন রুদ্ধশ্বাস দুর্গা। বলল, কী হয়েছেল? আবগারি দারোগা তোমাকে ডেকে নে' গেছল কেন? তুমি তো ঝাড়া হাত পা' ছিলে, তবে?

চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছে করছিল চিরঞ্জীবের। তবু সে কোনোরকমে বলল, কিছু নয়, এমনি কথা বলার জন্যে।

কিন্তু সে দুর্গার দিকে তাকিয়ে দেখল না। ঝোঁপ জঙ্গল মাড়িয়েই সে দ্রুত চলতে লাগল। খেয়াল করল না, খালধারের পথ ছেড়ে, দুর্গাদের বাড়ির দিকেই চলেছে।

দুর্গার কোনো কথা বলতে সাহস হল না। কিন্তু তার সারা মুখে একটি ব্যথাও হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। সে মুখ নামিয়েই বলল, আবগারি আপিসেই যাব ভাবছিলুম। কিন্তু—

কথা থামিয়ে চোখ তুলে একবার চিরঞ্জীবকে দেখল। চকিতের জন্য একটু সলজ্জ হাসির ছোঁয়া লাগল তার ঠোঁটে ও চোখে। পর মুহূর্তেই আঁচল দিয়ে সোনার হারটা ঢাকল। নতুন সোনার হার দুর্গার গলায়। তাই দুর্গা সরাসরি আবগারি অফিসে যেতে পারেনি।

আজ দুর্গার কোথাও যাবার দিন ছিল না। আজ বাইরের দুয়ার সে বন্ধ করেছিল। ভিতর দুয়ার মুক্ত ক'রে আজ সে চোখে কাজল পরেছিল। মুখে মেখেছিল হিমানী। পা'য়ে দিয়েছিল আল্‌তা। পরিয়ে দিয়েছিল যমুনা মাসীর মেয়ে যোগো। বড় বড় চুলের গোছা নিয়ে দুর্গা তো কোনোদিন কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশিনী নয়। সবাই বলে, রাক্ষুসে চুল। মা কালী গো। যোগো সেই চুলে নিখুঁত ক'রে বেঁধে দিয়েছিল খোঁপা। ঠিক পান পাতার মত। যোগো বলেছিল, 'হরতনের টেক্কা হয়ে গেল ভাই দুগ্‌গা। দাঁড়া, পাতাশুদ্ধ গন্ধরাজ ফুল গুঁজে দিই। ইস্‌কাবনের টেক্কা হ'য়ে যাবে।'

আজ দুর্গা শাদা জমিনে নীল ফুল তোলা টকটকে লালপাড় ছাপা শাড়ি পরেছিল। মেজেণ্টো রংএর জামা দিয়েছিল গা'য়ে। কুঁচিয়ে শাড়ি পরার রেওয়াজ নেই কোনোকালে। কিন্তু হাল্‌কা রংএর শায়া পরেছিল। পিতলের দুটি দুল ছিল অনেকদিনের। মাটি ঘষে, চকচকে ক'রে, পরেছিল কানে।

আজকের এ দুর্গা বাইরের নয়, ভিতরের। এ দুর্গাকে চিনবে কেন বাইরের লোকে। চিনলেও বড় লজ্জা। এমন বেশে এ সংসারের দুয়ার খুলে কি সদরে যাওয়া যায়? এ লুকনো, এ চুপিচুপি, এ তার এবং আর একজনের মাঝখানে, এক দুর্লঙ্ঘ্য সীমা পার হবার সাহসের বসনভূষণ প্রসাধন। এ তার দেহের-মাটির রক্ত-রসের সিঞ্চনে, আকাশের বুকে নিঃশব্দে ফোটার আবেগ। এ বাইরে বেমানান।

কিন্তু বেড়ায় গোঁজা আরশীর সামনে দাঁড়াবার সময় পায়নি। খবর এসেছিল, আবগারি দারোগার সঙ্গে চিরঞ্জীব অফিসের মধ্যে ঢুকেছে। খবর রটে গিয়েছিল, এতদিনে ধরা পড়ল তবে চিরো বাঁড়ুজ্জে।

ভিতর দুয়ারের নিঃশব্দ চুপিচুপি অভিসারের বেশবাস খোলবার সময়ও পায়নি দুর্গা।' যে-কে-সেই চিতানীটাই বাঁশঝাড় জঙ্গল মাড়িয়ে ছুটে এসেছিল ঊর্দ্ধশ্বাসে। কিন্তু থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল দূরের এই আঁসসেওড়া কালকাসুন্দের জঙ্গলে। এই বেশে সে যেতে পারেনি অফিসে। চিতাবাঘিনীটারও লজ্জা ক'রে উঠেছিল। হায়, সে লজ্জা কিনা আবার দুর্গার লোকলজ্জা। কিন্তু অফিসের সামনে ভিড় নেই, এ কেমন ধরপাকড়। তারপর সে জঙ্গল ঘেঁষে ঘেঁষে, আরো কাছে গিয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল জানালা দিয়ে অফিসের ভিতর। দারোগার সঙ্গে ছোট্‌ঠাকুর কথা বলছে। কেন? কী কথা? দারোগার সঙ্গে মিটমাট, ঘুষ দেওয়া নেওয়া চুক্তির কথা? এতদিনে নতুন দারোগার মন টলল? তবে না শোনা গিয়েছিল, যুধিষ্টির মানুষ। বাঘ নাকি এসেছে?

একটু নিশ্চিন্ত হ'য়েই দুর্গা সরে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু চিরঞ্জীবকে দেখে আর নিশ্চিন্ততা রইল না তার। চিরঞ্জীবের এমনি চুপচাপ দপদপে চোখে অপলক চাউনি দেখলেই সে বুঝতে পারে, খারাপ কিছু ঘটেছে।

দুর্গাদের বাড়ির সামনে এসে দেখা গেল, রীতিমত জটলা বসে গিয়েছে। যমুনা, মাতি মুচিনী গুলি এরা তো ছিলই। গজেন সতীশও এসেছে। আর ছিলো শ্মশানের বেদো ডোম। মাতি মুচিনী আর বেদো ডোমের মধ্যেই বিতর্ক চলছিল। বাকীরা শ্রোতা ঠিক বলা যাবে না। মাঝে মধ্যে দু' একটা কথা শুনছিল। কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে।

মাতি বুড়ি বলছিল, যাগ্‌, চিরো ঠাউর তা'লে ধরা প'ড়ে গেল শেষতক।

বেদো ভেংচে উঠেছিল, তোমাকে ব'লে গেছে কানে কানে আপগারি দারোগা, না?

—আবগারি দারোগা কেন, সবাই বলতে নেগেছে।

যদিও মাতি বুড়ি চিরঞ্জীবের দলের হ'য়েই কাজ করে, তবু তার একটা রাগ রয়ে গিয়েছে। দুর্গা যে তাকে মেরেছিল, একথাটা সে কোনোদিন ভোলেনি। মাতি মুচিনীর বয়স হয়েছে। যৌবনে সে খাঁটি স্বৈরিণী ছিল। তাই দুর্গার জীবনটা তার কাছে ভীষণ অহঙ্কার ব'লে মনে হয়। মনে মনে সে খুশি হয়, যদি চিরঞ্জীব সত্যি সত্যি ধরা প'ড়ে থাকে। এ গাঁয়ে সে অনেক রং অনেক ঢং করেছে তার বয়সকালে। তাই চিরঞ্জীব আর দুর্গা, এই জুটিকে তার বড় ঘৃণা। এরা যেন অন্যরকম। ঠিক তাদের কালের পুনরাবৃত্তি হয় নি। তাই এখানে নাক গলাতে পারেনি মাতি। তাই বড় ঘৃণা। সংসারের এমনি নিয়ম। সবাই নিজের মত ভাবে এবং চলে আর জ্বলে অবুঝ হ'য়ে। কারণ, তার বিশ্বাস, প্রেম পিরীতি তারাও করেছে, কিন্তু দুর্গার মত অত ভাগ্য নাকি তাদের ছিল না। মনে মনে সে নখে টিপে মারে দুর্গা আর চিরঞ্জীবকে।

বেদো তাই রেগে বলেছিল, তবে আর কী! চিরো ঠাউর ধরা পড়েছে, এবার কাপড়খানি খুলে ফেলে নেত্য করতে আরম্ভ কর।

মাতি বলছিল, ও বাবা ধম্মের কল। একেবারে যে কেউ পেত্যয় যেত না, চিরো ঠাউরও একদিন ধরা পড়বে।

—ধরা পড়বে কেমন ক'রে শুনি? সে কি মাল নে' গেছে যে ধরা পড়বে?

—তবে কি আর এমনি এমনি আবগারি থানায় হাওয়া খেতে গেছে?

বেদো মনে জোর পায়নি। কিন্তু রাগ হচ্ছিল। বলছিল, মাগী বড় বেইমান দেখছি যে? বলে যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

—কেনরে, কেন? কাজ ক'রে দিই, পয়সা নিই। মিনি মাগনা নাকি? একজন যাবে আর একজন আসবে। ওকুরদে' আছে, সনাতনবাবুর দল আছে। কাজ নাই নাকি? বেইমান বলছিস যে বড়?

লাগ্ দানাদান্ লেগে যেত হয় তো। কিন্তু স্বয়ং চিরঞ্জীবকেই দুর্গার আগে আগে আসতে দেখে মাতি একেবারে কাঠ্। এই জন্যে সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে, দুর্গা আর চিরো ঠাকুর শুধু মানুষ নয়। ওরা আরো কিছু অশরীরী অদৃশ্য অপদেবতার সঙ্গে নিশ্চয় ওদের মন্ত্রতন্ত্র যোগাযোগ কিছু আছে। সে তাড়াতাড়ি হাঁটা ধরে বলল, না যাই, ঘর দোর খোলা প'ড়ে আছে।

বেদো বলল, কেন যাবে কেন, আর এট্টু বক্তিমে দে' যাও।

মাতি বাঁকা বাঁকা পা'য় বকের মত লাফিয়ে চলল। মুখ ফিরিয়ে অস্ফুটে গালাগাল দিল, যমে নিক তোকে, মড়া ডোম।

বেদো সেকথা শুনতে পেল না। সে একটু গলা তুলে হেসে বলল, তবে যাবে কোথা? আসতে হবে এ বেদো ডোমের কাছে। তোমার শেষ দরজা আমি আগলে বসে আছি।

যেন দৈববাণী করে হেসে উঠল সে। মাতি বুড়ির বুকের মধ্যে তার স্তিমিত রক্তধারা চলকে উঠল। গুর্‌গুর্ ক'রে উঠল। তার আতঙ্কিত চোখের সামনে ভেসে উঠল খাউ খাউ আগুন। সেই আগুনের মধ্যে যে দেহটিকে বেদো বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে, সেটা আর কারুর নয়। মাতি মুচিনীর নিজের।

এই ঘোর লাগা সন্ধ্যায় মাতির বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, হেই গো ঈশ্বর। হেই গো ভগমান।...

মাতির বয়স নেই, যৌবন হারিয়েছে অনেককাল। তার বুড়ি হাড়ে জীবনধারণ দায়। তার ধন নেই, রত্ন নেই। তার সন্তান নেই সন্ততি নেই। তবু মরণে বড় ভয়। শেষের দিনের কপাট সে বন্ধ ক'রে রাখতে চায়। তাই অলৌকিকত্বে তার বিশ্বাস। বুড়ি ভাবে,

চিরো ঠাকুর আসলে দেবতা। নইলে বেদো ডোম তার আজ্ঞাবাহ হ'তনা।

চিরঞ্জীব বাড়িতে ঢু'কে, উঠোনে লোকজন দেখে অবাক হল। তার প্রথম দৃষ্টি পড়ল গজেন সতীশের দিকে। জিজ্ঞেস করল, তোমরা এসময়ে এখানে কেন?

সতীশ বলল, এসেছিলুম এক সোমবাদ্ নে। এসে শুনলুম আর এক সোম্বাদ।

গজেন বলল, তাই তো।

কিন্তু দুজনেই চিরঞ্জীবের চোখের দিকে যেন তাকাতে পারছে না। সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করেছিল।

চিরঞ্জীব বলল, কী, বিমলাপুরে জাওয়া ভেঙে দিয়েছে আমাদের, সে খবর দিতে এসেছে?

সতীশ অবাক হ'য়ে বলল, হ্যাঁ। জানলে কেমন ক'রে?

—তোমাদের মুখ দেখেই বুঝেছি।

ব'লে দাওয়ার ওপরে বসল চিরঞ্জীব। দুর্গাকে বলল, বাতি জ্বালা।

জাওয়া হল চোলাইয়ের সম্পূর্ণ সরঞ্জাম। যে-পাত্রে মাল মশলা দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে উনুনে বসানো হয়; তার সবটা মিলিয়ে একটা নাম 'জাওয়া বসানো'।

গজেন বলল, কিন্তুক্, এ তো বড় মস্‌কিলের বিষয় দাঁড়িয়ে গেল বলতে হবে। এই নিয়ে চার খেপ্ আমাদের জাওয়া ভাঙলে, আর সকলেরটা ঠিক র'য়ে গেল। বিমলাপুরে দেখছি আমাদের আর কাজ কারবার করতে দেবে না। সেই কবে গত মাসে উড়ানখোলার জঙ্গলে গে' জাওয়া বসালুম। কিষক সমিতির লোকেরা বললে, 'এখেনে ওসব হবে না।' বললুম, 'ঠিক আছে, বসিয়ে ফেলেছি, এবারটা ছেড়ে দাও। আর বসাবনা।' কিন্তুক্ ঠিক খবর চলে গেল। কাসেম দলবল নে একেবারে উড়ানখোলার জঙ্গলে। অত

বড় পিপেয় ক'রে জাওয়া বসিয়েছিলুম। সবসুদ্ধ ঢেলে, উপুড় ক'রে ফেলে, পিপে নে' চলে গেল। এবারে বসিয়েছিলুম কানার ধারে চরার জঙ্গলে। ছোট দারোগা দলবল নে' গে হাজির। উনুন ভেঙে, জাওয়া ভেঙে একাকার। আড়াল থেকে দেখলুম সবই। কথা হচ্ছে, জাওয়া তো আর আমরা একলা বসাচ্ছিনা। সকলেই পার পেয়ে যাচ্ছে, আর ধরা পড়ল পর পর আমাদেরই, এ কেমন কথা ?

কথাগুলি যার উদ্দেশে, সেই চিরঞ্জীব স্থির অপলক চোখে বাইরের সন্থ নামা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। হাতের সিগারেট জ্বলে যেতে লাগল বৃথা।

সতীশ বলল, যদি বুঝতাম যে বিমলাপুরে যারা সমিতি করে, তারা সব হাত গুটিয়ে লিয়েছে, তবু না হয় হ'ত। কিন্তুন্ এ কেমন ধারা ? সমিতিতে তো আমরাও আছি। এখন চিরো বাঁড়ুজ্জের দলে থাকলেই যদি এরকম হয়, ত' হলে তো মুস্‌কিল্। আর শালা সনাতন ঘোষ, ওকুরদে'রা কাম সেরে যাবে ? ছিধর বাবুর কথা যদিন্ মানতে হয়, তবে সকলের পেছুতে লাগ। একজনের কেন ?

বেদো ব'লে উঠল, পাল্টা ব্যবস্থা কর তোমরা। তোমরাও ওদের বেলায় খবর দে' দাও।

চিরঞ্জীব ব'লে উঠল, তা' হ'লেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। আমরা নিজেদের মধ্যে লড়ে মরি, পুলিশ হাত তুলে নাচুক। ওসব হবে না। আজ রাত্রে আমি বিমলাপুর যাব, কথা বলব কয়েকজনের সঙ্গে। মিটমাট করে ভাল, নইলে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। তবে—

কয়েক মুহূর্ত ঠোঁট টিপে চুপ ক'রে থেকে বলল সে, আমাদের শত্রু এখন ঘরে বাইরে। দারোগা আজ আমাকে ডেকে শাসিয়েছে, যেমন ক'রে হোক, সে আমাদের ধরবে। কৃষক-সমিতির লোকেরা আর কদিন পেছনে লাগবে। চোলাই তো আর বন্ধ করতে পারবে না। পারেওনি। সবাইকে যদি ডেকে ডেকে চোলাই বন্ধ করতে শুরু করে—

বলতে বলতে তিক্ত হেসে উঠল চিরঞ্জীব। বলল, সামনে ভোটের লড়াই। অত সহজ নয় সব। তবে শুধু আমাদের পিছনে বেশীদিন লেগে থাকলে, আমরাও ছেড়ে কথা কইব না। আজই আমি বিমলাপুরে যাব। কথা কইব, তারপর আমরাও পাল্টা লোকের নাম ক'রে ক'রে পোস্টার দেব, কারা কারা চোলাই করছে। আমাদের চারটে জাওয়া ভেঙেছে বলছিলে না?

সতীশ বলল, হ্যাঁ।

চিরঞ্জীব বলল, দুটো জাওয়ার খরচ ফিরে পাওয়া চাই। একটা দেবে সোলেমন। ও সমিতি করে, চোলাইও করে। আর একটা দেবে সনাতন ঘোষ। ও তো মন্ত্রীর দলের লোক, পুলিশ ওর বাপ। কিছু না দিক, পাঁচ মণ কয়লা আর চার মণ গুড় দিতে হবে তাদের।

দুর্গা বলল, তারা দেবে কেন?

চিরঞ্জীবের সর্বাঙ্গে প্রতিশোধের জ্বালা। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দিতে হবে। তাদেরটা ধরা পড়েনি, আমাদেরটা কেন পড়েছে, জবাব তাদেরই দিতে হবে। আমি তো পুলিশের কাছে যাব না। ওদের জাওয়া আমি তুলে নিয়ে আসব না হয় ভাঙব।

দুর্গা দরজা ধ'রে অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার একবারও ফেরেনি চিরঞ্জীবের মুখের ওপর থেকে। সে বলল, মারামারি করবে তুমি?

—দরকার হয়, করব। মুখ বুজে বুজে ওদের প্যাঁচ কষুনির মার তো বারাবর খেতে পারব না।

—তবে যে বললে, নিজেদের মধ্যে লড়বে না।

চিরঞ্জীব বিরক্ত হ'য়ে বলল, বাজে বকিস কেন? সেকথা পুলিশের বেলায় বলেছি। নিজেদের মধ্যে রফা করা আর পুলিশের কাছে ছোটা কি এক কথা হল? ক্ষমতা থাকে, নিজেরা এসে আমার জাওয়া ভাঙুক। ওরা পুলিশ চিনতে শিখেছে কবে থেকে, সেইটা একবার জানতে হবে। আগুন যদি লাগাতে হয়, ভাল হাতেই লাগাতে হবে।

গজেন সতীশের দিকে ফিরে বলল যে, তোমরা চলে যাও। হানিফকে আর নন্দকে বলবে, বাড়ি থাকে যেন, দেখা করব।

এ অঞ্চলে হানিফ আর নন্দ খুন না ক'রেও খুনী ব'লে কুখ্যাত। তাদের লাঠির ঘায়ের দাগ কয়েকজনের মাথায় আছে। জেলের ভাতও আছে তাদের পেটে। তুজনেই ভূমিহীন কৃষক। সংসার ধ্বংস হয়েছে তাদের অনেকদিন। এখন তারা বড়লোক জোতদারের পাইক পাহারাদার হয়েছে। যদিও ছিনিয়ে নেওয়া আর ডাকাতিতেই তারা এখন সিদ্ধহস্ত। এ তুজনের নামে সবাই আতঙ্কিত। সহসা কেউ এদের ঘাঁটায় না। প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন লোকেরাও না। বিমলাপুরের আন্দোলনের সময় থেকে এরা চিরঞ্জীবের অনুরক্ত। হানিফ গোঁফ গজানো অবস্থায় ক্লাস ফোর অবধি পড়েছিল চিরঞ্জীবের সঙ্গে। তারা আজ একটি জিনিস বুঝেছে। দিন মজুরের চেয়ে তাদের খাতির বেশী। ঘৃণা তাদের করে লোকে। ভয় করে তার চেয়ে বেশী। তাদের তুজনকে অনেকে যেচে পুষতে চায়।

চিরঞ্জীবের মুখে, নাম তুটি শুনে, সকলেই যেন একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। সেটা বুঝে চিরঞ্জীব গজেন সতীশের দিকে ফিরে বলল, কি, ভয় হল নাকি?

সতীশ বলল টেনে টেনে, না, ভয় নয়। তবে, ওদের জান তো। যা হুকুম টুকুম দেবে, এট্টু সমঝে দিও।

চিরঞ্জীব যেন যুদ্ধের ঘোড়ার মত দূর থেকেই বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। বলাই সান্যালের মুখটা মনে পড়ছে আজ। শ্রীধরদার কথাগুলিও ভোলবার নয়। বয়স কম হ'লেও এই জীবনের অভিজ্ঞতায় তার সমগ্র অনুভূতি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ। সে যেন পরিষ্কার দেখতে পেল, চারিদিক থেকে ক্রমেই একটা অদৃশ্য জাল ঘিরে ধরেছে। তবু আজকের অপমানের জ্বালাটাও তার রক্তের মধ্যে ফুটছে। যে-অপমানের কথাটা সে কাউকে বলতে পারবে না।

অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে হঠাৎ বলল, তবে, এবার

থেকে আর আমাদের গাঁয়ের স্টেশনে নয়। চন্দননগরেরও নয়। শিয়াখালার ছোট লাইন দিয়ে সোজা হাওড়ার ভেতর দিয়ে না হয় লেনদেন চলবে। পূবদিক আর কেউ মাড়াবে না। শিয়াখালা জনাইয়ের ভেতর দিয়ে পথ করতে হবে। দরকার হ'লে, দ্বারহাট্টা দিয়ে একেবারে হাওয়াখানা হ'য়ে জাঙ্গীপাড়া দিয়ে যেতে হবে।

গজেন সতীশ একযোগে ব'লে উঠল, সেটা মন্দ বলনি। এদিকটা বড় কড়াকড়ি। এক ভোলা আর কেষ্টার ফেউগিরিতেই অস্থির। যা হোক, যা ব্যবস্থা হয়, একদিন তা'লে সবাইকে ডেকে ডুকে কথা-বার্তা ব'লে নিতে হয়। আমরা চলি।

চিরঞ্জীব বলল, তোমরা যাও, আমি যাচ্ছি। গুলি, বাড়ি থেকে সাইকেলটা নিয়ে আয়। টর্চলাইটটা কোথায় আছে?

দরজার পাশ থেকেই জবাব দিল দুর্গা, এখানে।

—বার ক'রে দে।

একে একে সবাই চলে গেল। যমুনাও চলে গিয়েছে কখন। দাঁড়িয়ে আছে শুধু বেদো ডোম। সে চিরঞ্জীবের পা'য়ের কাছে বসে বলল, তা'লে দারোগা তোমাকে শাসাবার জন্যে ডেকে নে' গেছল? আর এতক্ষণে সারা থানা মহকুমা বোধহয় রটনা হ'য়ে গেল, চিরোঠাউর ধরা পড়ে গেছে।

চিরঞ্জীব বলল, সে আর আশ্চর্য কী। এ্যাদ্দিন ধরা পড়িনি, এবার একদিন ধরা পড়ব।

বেদো হাঁটু দোলাতে দোলাতে, মাথা নেড়ে বলল, সে আমার বিশ্বেস লয় ঠাউর। ওটা আমি মানতে পারব না।

সে কথা বলছে। কিন্তু তার চোরা নজর দুর্গার দিকে। আসলে সে এসেছে একটা খবর দিতে। চিরঞ্জীবের সামনে বলতে পারছে না। দুর্গা তাকে গোপনে চোলাই করতে দেয়। মালমশলা কয়লা, সবই কিনে দেয়। খালধারে, শ্মশানেই চোলাই করে বেদো আর

তার ডোমনী। একদিকে চিতার আগুন জ্বলে। আর একদিকে, বেদোর মাটির ঘরে জাওয়া বসে। ওদিকটায় সহসা কারুর নজরে পড়ে না। এক সময়ে চিরঞ্জীব নিজেই বেদোকে চোলাই করতে দিয়েছিল।

কিন্তু বেদোর সব ভাল হয়ে, একটাই কাল করেছে। চোলাই ক'রে সে আর তার বউ লোভ সামলাতে পারে না। বেহিসেবী হ'য়ে খেয়ে ফেলে। একবার খেয়ে ফেললে, তারপরে আর হিসেব কৈফিয়তের ধার ধারে না সে। তখন চিরঞ্জীবকেও শুনিয়ে দেয়, 'দেখ ঠাউর, অমর্ত নে' ভগমানেরাই নিকি লড়ে যায়। নিজের হাতে তোয়েরী ক'রে এট্টু না চেখে কেউ পারে? অত কিপটেমি করলে চলে না, সত্যি।'

চিরঞ্জীব বকেছে ধমকেছে রাগ করেছে। দু' একটা থাই থাপ্পড়ও যে না দিয়েছে, তা' নয়। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। তাই বেদোকে আর চোলাই করতে দেয় না সে। কিন্তু দুর্গা দেয়। লুকিয়ে, চুপি চুপি দেয়। বেদো খেয়ে কিছু ক্ষতি করে বটে। জায়গাটা নিরাপদ। তা' ছাড়া বেদোকে না দিলে মনটা খারাপ লাগে দুর্গার। বেদো তাকে ভালবাসে, বাপের মত। বাঁকার সে প্রিয় ছিল। কোথায় যেন দুজনের মধ্যে একটা মিলও রয়েছে। সে যখন এসে বলে, 'আগুন না হ'লে থাকতে পারি নে। শ্মশানে কী নে' থাকব বল? চিতা না জ্বললে, শ্মশান শ্মশান লয়। তা' মানুষের চিতা না জ্বলুক, এ্যাট্টা চিতা তো জ্বলবে। দেবে গো মেয়ে কিছু মালমশলা? ট্যাকা প'সা চাই না। জিনিসপত্তর দিলেই হবে।' তখন দুর্গা মনে মনে হাসে। কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে বলে, 'দিলেই তো খেয়ে ফেলবে।' 'এবার আর খাব না।' দুর্গা বলে, 'না, খাবে, খেয়ো, কিন্তু আমি গে' ভাগ ক'রে দেব। আমি যা দেব, তাই খাবে। হবে তো?' ঘাড় নাড়তে কোনো বাধা নেই বেদোর।

বলে, 'নিশ্চয়'। গলা নামিয়ে বলে, 'আমার জন্যে তো ভয় নাই। ওমাগীটা একেবারে কথা শোনে না, মাইরি। ঘটি ডুবিয়ে খেয়ে নেয়।' অর্থাৎ তার বউ। ভাগ্যি, কথাগুলি ডোমনীর সামনে বলে না। তা' হ'লে বেদো এক জায়গায় বসে থাকতে পারত না।

সে আজ খবর দিতে এসেছে, চোলাই হ'য়ে গিয়েছে। পাত্র চাই। অর্থাৎ ব্লাডার কিংবা টিউব। সে আর তার বউ সেগুলি ভরতি ক'রে পৌঁছে দেবে অঘোর কবিরাজের বাড়ি। আজকাল অঘোর কবিরাজের আইবুড়ো মেয়েরা প্রায়ই কলকাতায় কিংবা চন্দনগরে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যায়। সঙ্গে থাকে হয় তো একজন মুনীষ। বোঁচকা পুঁটলি দু'একটা তাদের হাতে থাকে। সেগুলির ওপর সহসা কারুর নজর পড়ে না। তাদের শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আবগারির লোকের নজর পড়ে না। পড়ে, চিরকালের পুরুষের চোখ। সে তো সব মেয়েদের দিকেই পড়ে।

বেদো অপেক্ষা করবে ভাবল। চিরঞ্জীব বিমলাপুর চলে গেলে, কথা বলবে। কিন্তু তার আগেই দুর্গা বলল, বেদো খুড়ো, তুমি এখন যাও।

একটা চকিত হতাশার চমকেই বেদো উঠে দাঁড়াল। বলল, চলে যেতে বলছ?

দুর্গা বলল, হ্যাঁ। দরকার থাকে তো কাল এস।

বোদো বলল, আচ্ছা। কাল আসব তা'লে।

বেদো চলে গেল। তবু দুর্গা দাঁড়িয়ে রইল দরজার একটি পাল্লা ধরে। দুজনের মাঝখানে হ্যারিকেনটা জ্বলছে। সাজ খোলা হয়নি কিন্তু আঁচল লুটিয়ে পড়েছে দুর্গার। তার মেজেন্টো রং এর জামাটা এখন কালো দেখাচ্ছে। তাই বুঝি কণ্ঠার কাছে চিক্‌চিক্ করছে সোনার হার। যে-সোনার হার আজ সকালে পাঠিয়ে দিয়েছিল চিরঞ্জীব। অনেক দিন আগে দিতে চেয়েছিল। দুর্গা পা দাপিয়ে বারণ করেছে। এবার আর বারণ মানেনি চিরঞ্জীব।

আসলে চিরঞ্জীবের মন মানেনি। কেন, তা সে জানে না। সে

জানে না, তার মনের মধ্যে বাস করে এক সেই যুবক। যে-চেয়েছে, তার মনের মত মেয়েকে সাজাবে সর্বালঙ্কারে। তার সবকিছু দিয়ে সবটুকু দিয়ে। সে জানে না, তাই মনে মনে যুক্তি দিয়েছে, দুর্গার অনেক পাওনা। তার পাওনা তাকে দিতে হবে।

সকালবেলা গুলি এসে হারটি দিয়ে বলেছিল, চিরোদা পাঠিয়ে দিলে। বলেছে, পরতে। সন্ধেবেলা আসবে।

গুলির সামনে দুর্গার লজ্জা করেছিল। কিন্তু হারটি পছন্দ হয়েছিল তার। তবু মুখ গোমড়া করে বলেছিল, ছোট্‌ঠাকুরের দেখছি টাকা কামড়াচ্ছে। সেই হার এনে কোট্‌ বজায় রাখলে।

ব'লে সে হারের বাক্সখানি তাচ্ছিল্য ক'রে তুলে রেখেছিল। গুলি চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি গিয়ে খুলেছিল আবার। আস্তে আস্তে হারখানি তুলে নিয়ে, গলার কাছে ঝুলিয়ে, বেড়ায় গোঁজা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। পরমুহূর্তেই তার নিসিন্দা পাতা চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছিল অভিমান। যে একদিন তার হাত ধরবে ব'লে সব দরজা আগলে বসে রইল, সে আজ সোনার হার পাঠিয়ে দিল। কেন? দুর্গা রক্তমাংস মন দিয়ে গড়া সাধারণ মেয়ে। তার কোথাও কোনো জটিলতা নেই। রক্ত মাংস মন, কোনোটাই এ সংসারে কোনোদিন সোনা দিয়ে ভরেনি! সে মাটির মত পূর্ণতা চেয়েছে। পরিপূর্ণ সতেজ প্রাচুর্যভরা গাছের মত বাঁচতে চেয়েছে। সে রোদে নিজেকে মেলতে চেয়েছে, বৃষ্টির কামনা করেছে। তার জন্যে, ঘরে বাইরে কোথাও সে কোনো লজ্জা রাখেনি। আকাশের তলায় প্রকৃতির মত মুক্ত রেখেছে নিজেকে। আতুর হয়ে হাত বাড়িয়ে রেখেছে ঊর্দ্ধে।

আবার হারটির দিকে চোখ পড়তে হেসেছিল সে। এ কি শুধু সোনার হার? এ কি কোনো ইচ্ছে হয়ে আসেনি? মনের একটি ছিটে কি আসেনি এই হারের বিছে বন্ধনে? তাড়াতাড়ি গলায় পরেছিল হারখানি। যদি হার পরা হ'ল, তবে সাজ না হবে কেন?

ইচ্ছে হ'য়ে যদি এসে থাকে, তবে চির ইচ্ছের বাঁধনে কেন বাঁধা হবে না। তাই সে আজ সরোবরে ভাল ক'রে স্নান করতে গিয়েছিল। ডুব দিতেই সে হাসিটুকু শুনতে পেয়েছিল। আর সেই স্বর, মরণ তোর দুর্গা।

দুর্গা বলেছিল, কেন?

—মরণ হল না তোর তাই

—কেমন ক'রে?

—ত্রিশঙ্কু হ'য়ে রইলি। না গেলি ঘাটে, না ফিরলি ঘরে। চিরো ঠাকুরের পাথরে সে চুম্বক কই যে তোকে টেনে নিয়ে যাবে?

—তা' হ'লে পথের মাঝখানেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকব।

—এত অহঙ্কার? কেন এত অহঙ্কার কিসের?

—মরণের বাড়া ভয় নেই বলে।

সরোবরের জলে ডুব দিয়ে সব দ্বিধাটুকু কাটিয়ে এসেছিল দুর্গা। মরণের বাড়া ভয় নেই। আজ মরণের দরজায় তাই তার নির্লজ্জ নির্ভীক অভিসারের দিন এসেছিল। কিন্তু ফিরে গিয়েছে সে।

দুর্গা অনেকক্ষণ পর বলল, ওদিক পানে গেছলে কেন তখন?

চিরঞ্জীব বলল, শুনেছিলুম, জটা এসেছে বাজারে। ওকে তাড়িয়ে দিতে গেছলুম।

কিন্তু চিরঞ্জীব চোখ তুলল না দুর্গার দিকে। দুর্গার দৃষ্টি সরল না। বলল, এখন আর বিমলাপুরে যাবার কথা বললে কেন? যাবে কখন? কাল যেও।

—না। আজই যাব। একটু চা দিবি?

—দেব।

দুর্গা উঠানের উনুনে পাতা জ্বালিয়ে চা করতে গেল। আগুন জ্বেলে জল বসিয়ে ডাকল, এদিকে এস না একটু।

চিরঞ্জীব তার পাশে গিয়ে বসে বলল, কী বলছিস্?

—কী বলেছে দারোগা ?

—অপমান করেছে ডেকে নিয়ে।

—কী বলে ?

—যা বলে। তোর কথা বলেছে।

—কী ?

—কী আবার। ঐই সব বাজে বাজে কথাগুলো। তোকে নাকি আমি রেখেছি।

বলেই উঠতে যাচ্ছিল চিরঞ্জীব। জামা টেনে ধরল দুর্গা।

—কী হ'ল ?

—এ্যাট্টা কথা রাখবে ?

—কী ?

—আমার মামার বাড়ি আছে পাওনানে। আমি সেখেনে চলে যেতে চাই। তোমার মিছে দুর্নাম যাবে ছোট্‌ঠাকুর।

চিরঞ্জীব সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, একি, তুই চোখে কী দিয়েছিস্‌ ?

দুর্গা বলল, কাজল।···বুঝলে, আমি চলে যাব পাওনানে।

চিরঞ্জীবের যেন সহসা নজরে পড়ল দুর্গার বেশবাস। ওর হিমানী মাখা মুখ। বলল, কী ব্যাপার বল্‌ তো ? সেজেছিস কেন ?

তাদের দুজনের মাঝখানে সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরটা যেন কেঁপে ওঠে। তবু যেন সে ছলনার মায়া মাত্র।

দুর্গা বলল, সাজতেও কি মানা আছে ? তুমি আমার কথার কোনো জবাব দিলে না ?

এবার গলার হারটা দেখতে পেল চিরঞ্জীব।

হাত বাড়িয়ে গলার হারটা ধ'রে বলল, পরেছিস্‌ ? দেখি, কেমন হয়েছে ?

দুর্গা তাড়াতাড়ি হারগাছটি খুলে ছুঁড়ে দিল চিরঞ্জীবের কোলে—। নাও তোমার হার।

হারে হাত দিল না চিরঞ্জীব। দুর্গার হাত টেনে ধরল, শোন্।

—ছাড়, জল ফুটে গেছে।

—ফুটুক।

চিরঞ্জীবের গম্ভীর গলা শুনে ফিরে তাকাল দুর্গা। তার মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

চিরঞ্জীব বলল, ওরা যে মিছে দুর্নাম দেয়। সেগুলো তুইও কি মানিস?

—না।

—তবে?

—সে জন্যেই পালাতে চাই।

—তবে মিছিমিছি মিশেছিলি কেন আমার দলে?

দুর্গা অবাক হ'য়ে বলল, এ কেমন কথা। থাকলে নাম খারাপ, যেতে চাইলে জবাবদিহি? কী চাও তবে তুমি আমার কাছে?

—কী চাই? চিরঞ্জীবের গলার স্বর চাপা শোনালো। বলল, জানিনে। সত্যি জানি নে রে। তবে লোকে যখন ওরকম ক'রে বলে, আমি সইতে পারিনে। আমি যে সত্যি ওদের মত ক'রে কোনোদিন ভাবিনি।

দুর্গার অপলক চোখ পাতার আগুনের দিকে। কিন্তু বুকের মধ্যে কাঁপছে। এমন ক'রে সে কোনোদিন চিরঞ্জীবকে বলতে শোনেনি। এমন সুরে স্বরে ও ভাষায়। বলল, তুমি কেমন ক'রে ভাব ছোট্‌ঠাকুর, একটু বল শুনি?

চিরঞ্জীব বলল, কী জানি। খালি মনে হয়, আমি জটা হ'তে পারব না। ও যেমন ক'রে বীণাকে রেখেছে, তেমন ক'রে রাখা আমি জানি নে।

বলতে বলতে তার গলার স্বর আরো চেপে এলো। দুর্গাও যেন শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, তা' কেন হবে?

যেন কোন গভীর অতল থেকে বলল চিরঞ্জীব, তাই আমার খালি

ভয় হয়। কী বা আমার মান সম্মান। তবু এক ভয় দুর্গা, তোকে না কোনোদিন খাটো ক'রে ফেলি। দুর্গা, আমার খালি দিদির কথা মনে পড়ে।

গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে এল তার। দুর্গার চোখে একটি স্তিমিত শিখা যেন ক্রমেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগল। সে বলল, কেন গো?

চিরঞ্জীব বলল, পাছে ঘুরে ফিরে আর একরকম ভাবে তোকেও সেই হাল করি। দিদি, বীণা—

মুহূর্তে ভয়ংকর একটা সত্য বিদ্যুৎ কষায় যেন হানল দুর্গার বুকে। আলোটুকু পুরোপুরি জ্বলল তার চোখে। পরম সত্যের বুঝি সুখ দুঃখ বলে কোনো অনুভূতি থাকতে নেই। সে চিরঞ্জীবের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, থাক্। ও কথা থাক।

—যাক্। কিন্তু চলে যাবার কথাটা তুই আর বলিসনে দুর্গা।

দুর্গার মনে হ'ল, সে যেন তার সারা জীবনের শেষ দৈববাণী শুনলো। শেষ নির্দেশ পেল নিয়তির কাছে। সে যেন বড় ভয় পেয়েছে। তবু জীবনের সবকিছুর সেরা আশ্বাসের আনন্দে তার স্বর নেমে গেল হৃৎপিণ্ডের কাছে। সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, বলব না। আর কখনো বলব না। আমাকে মাপ কর।

তারপরে যে কথাটা দুর্গার মুখের ভাষায় যোগাল না, সে তার বুকের কল্লোলে শুনল, 'তোমার এত ভয়, তাই আমার পাশে থেকেও তোমার এত সাহস। তাই বুঝি আমার সাহসেরও অন্ত নেই।' তার ইচ্ছে হল, আবার গিয়ে সরোবরে ডুব দিয়ে ব'লে আসে, 'ওরে, তাই আমার এত অহঙ্কার। যাদের কপালে সিঁদুর, কোলে ছেলে, তারা আমার বাইরে দেখা দুঃখে দুঃখ পাবে। তবু আমার অহঙ্কার ঘুচবে না।'

চিরঞ্জীবের কোলের ওপর থেকে হারটি নিয়ে সে উঠে যেতে অস্ফুটে বলে গেল, চা চিনি নিয়ে আসি।

দুর্গা ফিরে আসবার আগেই তীব্র টর্চের আলো ধাঁধিয়ে দিল

চিরঞ্জীবের চোখ। পরমুহূর্তেই সে দেখল, ইনস্পেকটর বলাই সান্যালের সঙ্গে প্রায় আবগারির পুরো স্টাফ।

বলাই বলল, অখিলবাবু, আপনি এ বাড়ি সার্চ করুন। কাসেম তুমি আর ধীরেনবাবু, এখানে একজনকে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে গোটা বাগদিপাড়াটা সার্চ কর।

কাসেম বলল, আচ্ছা স্যার

চিরঞ্জীব একটি চকিত মুহূর্তের জন্য অবাক হয়েছিল। এবার তার সঙ্গে চোখাচোখি হ্ল বলাইয়ের। পরস্পরের দৃষ্টি যেন তাদের তীরের মত হানল।

দুর্গার গলার স্বর শোনা গেল, কী ব্যাপার?

অখিলবাবুর রুক্ষ গলা শোনা গেল, আগে পথ ছাড় ঘরের, তারপরে শোনবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

দুর্গা বলল, কেন?

অখিলবাবু দুর্গাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন, সর আগে।

চকিতে চিরঞ্জীবের গলায় একটি ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল, গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? রাত ক'রে পাড়ায় ঢুকে মেয়েদের গায়ে ধাক্কা দিতে এসেছেন? ব'লে চিরঞ্জীব দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়াল দুর্গার পাশে।

দুর্গাও ফুঁপে উঠল, তাই না বটে। দারোগা হ'লেই খপ করে গায়ে হাত।

অখিলবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন দরজার কাছে। বলাই মুখের ভাব কঠিন রেখে, মনে মনে কেমন একটি অপ্রতিভ বিনয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সে অখিলবাবুকে বলল, বী সোবার প্লীজ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবেন না, সার্চ করুন।

কিন্তু অখিলবাবুর চোখে আগুন ফুটে বেরুল। জ্বলন্ত চোখে তাকালেন চিরঞ্জীবের দিকে। চিরঞ্জীব আর দুর্গাও তাকিয়েছিল। অখিলবাবু দুর্গার দিকে তাকালেন না। কেন এই স্মাগলার গুণ্ডিনীর

দিকে তাকাতে পারলেন না, নিজেও জানেন না। যদিও রাগে ও ক্ষোভে দুজনের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে করছিল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে। খালি বললেন, বড় যে মান জ্ঞান দেখছি?

দুর্গা বলে উঠল, না থাকলেই বুঝিন ভাল হয়? চোলাই মদ ধরতে এসেছেন, পাবেন তো বামাল ধরে নে' যাবেন। গায়ে ধাক্কা দেবেন কেন?

অখিলবাবুর মুখ রাগে ফুলে উঠল। বললেন, হুঁ? মনে রেখ, এক মাঘে শীত পালায় না। চল, বাতি নিয়ে ঘর দেখাবে চল।

দুর্গা বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, সে কি আর জানি না ছোটবাবু, এতখানি বয়স হ'ল আমার। শীত কি বছরেই আসে।

চিরঞ্জীব নেমে এল উঠোনে। ঘরের মধ্যে জিনিস ফেলা ছড়ার শব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যে গোটা পাড়াতেই একটা হৈ হট্টগোল প'ড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মাতি মুচিনীর গলাই শোনা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী। যে-গানি মুচিনী ক'ড়ে রাড়ি কাসেমের রক্ষিতা, সে বুঝি সম্পর্কে মাতির ভাইঝি হয়। মাতি এখন সেই ব্যাখ্যাই শুরু করেছে, গানি এসে দেখে যাক্, কার সঙ্গে সে রং পীরিত করেছে। 'যার সঙ্গেতে করি ঘর, সে-ই আমার পর।' হাজার হ'লেও মাতি তো পিসশাশুড়ির তুল্য।

বলাই টর্চের আলো ফেলে ফেলে বাড়ির আশপাশে দেখতে লাগলো। অখিলবাবু বেরিয়ে এলেন শূন্য হাতে। বলাই ফিরে এসে বলল, কী হ'ল?

অখিলবাবু বললেন, কিছু পাওয়া গেল না স্যার।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলাই হঠাৎ দুর্গার দিকে ফিরে বলল, মদ চোলাই কর তুমি?

দুর্গা বলল, সবই তো দেখলেন দারোগাবাবু—

বলাই ধমক দিয়ে উঠল, ওসব বাজে কথা রাখ।

তোমার চলে কী ক'রে ?

দুর্গা বলল, লোক আছে দারোগাবাবু।

—লোক আছে ?

—হ্যাঁ, লোক আছে, টাকা দেয়।

—কেন ?

—তা' কি জানি। অভাবে পড়লে লোকে লোককে দেয় না ?

বলাইয়ের চোখ দপ্‌দপ্‌ ক'রে উঠল। বলল, আজ হেঁয়ালী করছ, আর মুখ তুলে যা খুশি তাই বলছ। কিন্তু যেদিন তোমাকে ধরব, সেদিন সকলের সামনে ধরে চাবকাব, বলে রাখলাম।

চিকুর হানা চোখে তাকিয়ে বলল দুর্গা, কেন দারোগাবাবু, আইনের সাজা কি উঠে গেছে ?

বলাই বলল, তোমাদের মত নোংরা জীবদের জন্য আইনই সব নয়। দশজনের সামনে তোমাদের সামাজিক শাস্তিও দরকার।

দুর্গা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল। ইতিমধ্যেই সে দ্রুত হাতে কখন খোঁপা খুলে দিয়েছে। জোড়া সাপের মত তার দুই বিনুনী কেঁপে কেঁপে উঠল। তার এই রঙ্গিণী মূর্তি দেখে টের পাওয়া যায় না, কিছুক্ষণ আগেও সারা মুখ ও মন থমথমিয়ে ছিল। বলল, সমাজের কথা বলছেন দারোগাবাবু। তা' বলতে পারেন। ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই আছে অনেক। তা' যেদিন পারেন, মারবেন, কী আর করব।

বলাইয়ের আসলে দৃষ্টি চিরঞ্জীবের দিকে। যে কথা বলার ইচ্ছে তার ছিল না, চিরঞ্জীবের ওপর শোধ নেবার জন্যই যেন সেই কথা বলল, গ্রামে কেন রয়েছ, শহরে গিয়ে বসলেই তো পারতে।

দুর্গা বলল, সেই আপনাদের জ্বালা বাবু, শহরে গে' কেন বসলুম না। - ঔকুরদে' মশাইও কত বলেছিলেন। কত লোকে কত বলেছিল। গেলে আর এসব ঝামেলা পোয়াতে হত না।

অখিলবাবু বলে উঠলেন, একদিন তো তাই যেতে হবে।

দুর্গা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, সিদিনে যত খুশি গা'য়ে হাত দেবেন ছোটবাবু, কিছুটি আর বলব না।

বলাইয়ের প্রতিশোধ স্পৃহা ও রাগের মধ্যেও কোথায় যেন একটি অস্পষ্ট গ্লানিবোধ রয়েছে। দুর্গার কথাগুলি সে যতই শুনছে, ততই মলিনার কথা মনে পড়ছে তার। কেবলি মনে হ'তে লাগল, এমন একটা অসামাজিক অন্যায়ের সঙ্গে লিপ্ত থেকেও, মেয়েটার চোখের চাউনিতে এত ধার কেন? কথায় এমন একটা সপ্রতিভ স্পষ্ট তীক্ষ্ণতা কোথায় পেল? কী আছে ওর? কিসের জোরে? শুধু পাপ কি এত শক্তি দেয় শিরদাড়ায়?

অন্যথায়, আর কিসেরই বা শক্তি? এ শুধু পাপেরই আস্ফালন নিশ্চয়। মলিনার শ্লেষ হাসি মুখখানি মনে পড়ল বলাইয়ের। সে হ'লে বলত, পাপের আস্ফালন নয় গো। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ, ওটা জ্বলুনি।

বলাই হ'লে বলত, তোমার বই-পড়া বিদ্যের কথা রাখ। বাস্তবের কথা বল।

মলিনা হেসে কিন্তু রুষে বলত, বাস্তবের কথাই বলছি, রাগছ কেন বলাইবাবু। সবাই মিলে যাকে গর্তে ঢুকিয়ে মারছে, ওটা তার দাপানি ফোঁসানি। গর্তের ভিতরে থাকলে খোঁচা, বাইরে এলে বে-ইজ্জৎ। পাপের মধ্যে কখনো ভালবাসা থাকে না।

সেই 'বাইরে'টা বোধ হয় সদর শহর। যে পরিষ্কার ইঙ্গিত কিছুক্ষণ আগেই বলাই করেছে। কিন্তু ওদের ভালবাসার কথা শুনলেই ধৈর্য হারায় বলায়। তখন বলাই না ব'লে পারত না, তবে কী বলতে চাও? ভালবেসে ওরা যা করছে, ঠিকই করছে? মলিনা বলত, কখনো নয়। তোমার মুখেই বড় বড় বিলাতী মদের দোকানের আর পাবলিক বার'এর গল্প শুনেছি। সেখানে বড় বড় ব্যাপার, বিরাট মহৎ অহঙ্কার করতে পারার মত গৌরবজনক সব চুরি বাটপাড়ি সেখানে হয়, কিন্তু তাদের অনেক টাকা, সমাজের উচ্চস্তরের লোক তারা। আর

এদের তোমরা ইচ্ছে করলেই বাংলা দেশের রাস্তার বাড়তি কুকুরের মত গুলি ক'রে মারতে পার। কিন্তু ওপরের ওদের খাতির করতে হবে।

বলাই তখন আরো রেগে যেত। বলত, একজনের দোষ দেখিয়ে আর একজনের দোষ ঢাকা দিও না।

মলিনা বলত, দেব না। কিন্তু একটা লোভে, আর একটা পেটের দায়ে। তোমার মুখেই শুনেছি, এ গ্রামের অর্ধেক লোক এ ব্যাপারে জড়িত। বলেছ, স্বয়ং এম, এল, একে বেআইনি চোলাইয়ের আসামীকে জামীন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। কেন বল তো? কেন?

তখন বলাইয়ের ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে মনে হ'ত, অন্যায়কে এরা প্রশ্রয় দিতে চায়। অন্যায়কে অন্যায় ব'লে মানতে চায় না। এ কি রকম? দুজনের কেউ কাউকে বুঝতে পারে না। যদিও অন্যায়টা আসলে কারুরই কাম্য নয়। কিন্তু বলাইয়ের মনের মধ্যে কেবলি প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকত, অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়!

এবং এখনো সেই প্রতিধ্বনিই শুনতে পেল সে। না, কোনো সংশয় নয়, অন্যায়। সবটাই ঘোর অন্যায় ও পাপ। যত মনে হ'ল ততই তার জেদ বাড়ল। সে অখিলবাবুকে ডেকে বলল, আজ থেকে আপনি এ পাড়াটা নজরবন্দী ক'রে রাখুন। প্রত্যেকটি লোকের ওপর বিশেষভাবে চোখ রাখার ব্যবস্থা করুন। আই মাস্ট সী দিস্ নোটোরিয়াস্ পার্টি। মেক এ্যাবসার্ড দেয়ার মুভমেণ্টস্।

অখিলবাবু পুরনো লোক। চিরঞ্জীবকে অনেকদিন থেকেই চেনেন। গ্রামের ছেলে হিসেবেই কথা বলেন তার সঙ্গে। হুঁশিয়ারীর ভঙ্গিতে বললেন, আগুন তা' হ'লে ভাল হাতেই লাগালে চিরঞ্জীব। এবার আর রেহাই পাবে না।

চিরঞ্জীব তখন থেকেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। বলল, আগুন লাগাই ভাল অখিলবাবু। জ্ব'লে পুড়ে যা থাকে থাকবে। তবে

আবগারির আইন তো, গভর্ণমেণ্ট ওটা বুঝে শুনেই করেছে। হাজার টাকা ফাইন হচ্ছে সবচেয়ে বেশী, আর অনাদায়ে দশ মাস জেল। তারপর! ও'তে কি আগুন জ্বলবে ?

বলাই বলে উঠল, চোরের মায়েরই দেখছি বড় গলা। কত হাজার টাকা আছে আর কত মাস জেল খাটার ক্ষমতা আছে, সেটাই এবার দেখব। আসুন অখিলবাবু।

দুজনে চলে যেতেই, দুর্গা আর চিরঞ্জীব দেখতে পেল, আরো দুটি ছায়া আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। দেখেই চিনতে পারল, ভোলা আর কেষ্ট। কাছে পিঠেই কোথাও দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে। চিরঞ্জীবের চোখ দুটি শ্বাপদ হিংস্রতায় জ্বলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! সে কিংবা দুর্গা, কেউ কোনো কথা বলল না এসব বিষয়ে।

পাড়ার গোলমাল থেমে এল পুলিস চলে যাবার পর। সবাই একবার ঘুরে গেল এ বাড়িতে। সংবাদ পেয়ে অন্য পাড়ার লোকজনও এসেছিল কেউ কেউ। পাড়া ঘিরে তল্লাসী বড় একটা দেখেনি কেউ। কিন্তু পুলিস কিছুই পায়নি। সকলেরই বক্তব্যের ভঙ্গিটা এইরকম, ও সব বাবা চিরো বাঁড়ুজ্জের কীর্তি। পুলিসের সাধ্য কী ধরে। কেউ কেউ চিরঞ্জীবকে খোসামোদও ক'রে গেল। কিন্তু চিরঞ্জীব কারুর সঙ্গেই কোনো কথা বলল না। সে জানে আজকের এ কাহিনী পত্র-পল্লবিত হ'য়ে ছড়াবে। সত্যি মিথ্যেয় মিলিয়ে সে এক অপূর্ব, অদ্ভুত কাহিনী। সেই বিচিত্র কাহিনীর নায়ক চিরঞ্জীব সম্পর্কে আশ্চর্য সব কথা রটনা হবে। পুলিস যে বোকা বনেছে, তার এক রোমাঞ্চকর কল্পিত কাহিনী রটে যাবে সর্বত্র। কেন যে লোকে এমন করে, কে জানে। এতে যে চিরঞ্জীব একটুও আত্মপ্রসাদ অনুভব না করে, তা নয়। ওটা একটা মৌতাতের মত। কিন্তু তাতে শান্তি নেই। ওই মানুষগুলিকে সে প্রাণধরে বিশ্বাস করতে পারে না। এদের মধ্যে গ্রামের ইতর ভদ্র সবরকম মানুষ আছে। মাতি মুচিনীর মত তাদেরও কোথায় একটা কুসংস্কার

আছে চিরো বাঁড়ুজ্জের সম্পর্কে। চিরঞ্জীবের হাজার হাজার জমানো টাকার কল্পিত কাহিনী বলতে তারা ভালবাসে। যদিও, চিরঞ্জীবকে তারা ঠিক ভালবাসে না। ঘৃণা হয় তো করে, কারণ, একটু ভয় পায়। যেখানে ভয়, সেখানেই ঘৃণা।

কিন্তু এসব কথা ভাবছে না চিরঞ্জীব। তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন কতগুলি শানিত নখ আঁচড়াচ্ছে। জ্বলছে, ফুঁসছে বুকের মধ্যে। এ আগুন খুঁচিয়ে উসকেচ্ছে পুলিস। তাকে ভয় দেখাতে পারিনি। বরং আরো ভয়ংকর কিছু করবার, মরিয়া হ'য়ে-ওঠা জেদ চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। মরণের বাড়া ভয় নেই। সেই মরণেরই পণ থাক্, তবু পুলিসের জেদের কাছে আত্মসমর্পন কিছুতেই নয়। কেউ তাকে কিছু দেয়নি। কৃষক সমিতি তাকে শোধন করতে চায়। পুলিস তাকে শাসন করতে চায়। এ যদি ওদের অনধিকার চর্চা না হয়, তা হলে তারও নির্ভয়ে কাজ চালিয়ে যাবার অধিকার আছে।

—চা নাও।

চিরঞ্জীব পাশ ফিরে দেখল, দুর্গা চায়ের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মাথা নত ক'রে আছে। দুর্গার গলার স্বর নিস্তেজ, সুরে যেন একটি ব্যথিত অভিমানের স্পর্শ। অন্ধকারে, দুর্গার এ ছায়া মূর্তিকে ঘিরে যেন একটা গ্লানি চেপে রয়েছে।

আশ্চর্য! চিরঞ্জীবের মনে হল, তার ঘাড়েও কোনো কোনো শিরা যেন অবশ ও শিথিল হ'য়ে রয়েছে। সেও মাথা তুলতে পারল না। হাত বাড়িয়ে সে চায়ের গেলাস নিল। কিন্তু কী যেন ঘটে গিয়েছে। কোনো কথা বলতে পারল না। দুর্গা বুঝি একবার মুখ তুলল। তারপরে সরে গেল।

আর সেই মুহূর্তে চিরঞ্জীবের মনে হল, বুকের অদৃশ্য শাণিত নখরের আঁচড়গুলি শুধু ক্ষিপ্ততা নয়, শুধু মরণের জেদ নয়, শুধু পুলিসের উস্‌কে দেওয়া আগুন নয়। আরো কিছু, যা মরণের চেয়ে বড। অনেক গভীর অব্যক্ত সেই আশ্চর্য জ্বালাটা তার অনুভূতির অন্ধকারে

যেন একটি তীব্র চকিত বিদ্যুৎ ঝিলিকে হানল। আজ বিকেল থেকে সব ঘটনার মূলে তার সবচেয়ে স্পন্দিত জায়গাটার ছাদ হারিয়েছে। সবকিছুর চেয়ে বেশী তীব্র অনুভূতিশীল কেন্দ্রটিতে তীক্ষ্ণ খোঁচা লেগেছে। এই আবিষ্কারের ব্যথায় ও গ্লানিতে, সে ব্যাকুল চোখ তুলে দুর্গাকে খুঁজল অন্ধকারে। কে জানত, দুর্গার অপমান তার এতখানি বাজবে। তার সামনে দুর্গার অপমান সত্ত্বেও তাকে যে মাথা নত ক'রে থাকতে হয়, আর সেটা যে বড় কষ্টের ও যন্ত্রণার, এটা তার অনাবিষ্কৃত ছিল। কে জানত, মদ চোলাইয়ের জীবনে, একটি বাগ্দি মেয়ের সঙ্গে নিজের একটি আত্মসম্মানের অসম্ভব অবাস্তব তৃষ্ণা থেকে গিয়েছিল। আর সেই তৃষ্ণাটাকে পুলিস আরো খুঁচিয়ে দগ্দগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তাই, যারা পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে কোনোদিন কোনো লজ্জা করেনি, আজ তারা সামনা সামনি মাথা নীচু ক'রে আছে।

চিরঞ্জীব ডাকল, দুর্গা।

কোনো জবাব পেল না। আবার ডাকল। দুর্গা জবাব দিল উঠোনেরই অন্ধকার এক কোণ থেকে। চিরঞ্জীব এগিয়ে গিয়ে বলল, একি, ভেজা নারকোল পাতাগুলোর ওপর বসে আছিস?

ব'লে কিন্তু চিরঞ্জীবও বসল দুর্গার পাশে। বলল, তুই চা' খাবি নে?

দুর্গা বলল, ইচ্ছে করছে না।

—একটুখানি খা।

দুর্গা বলল, তুমি খেয়ে একটু দাও।

চিরঞ্জীব গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই আগে খা।

দুর্গা চমকে উঠে বলল, ছি! আমার এঁটো খাবে বুঝি?

—দোষ কী? আমার যে ইচ্ছে করে।

আজ দুর্গার বড় বুক কাঁপছে। বাঘিনীর বুক কাঁপছে। আজ ছোট্‌ঠাকুরকে তার অন্যরকম লাগছে। আজকের এই মুহূর্তের

চিরঞ্জীবকে যেন তার চিরদিনের ঝড়ের শেষ ঝাপটা মনে হচ্ছে। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ইস্! আমি তা কখনো পারবো না। তুমি খেয়ে দাও।

প্রতিবাদ না ক'রে কয়েক চুমুক খেয়ে গেলাস বাড়িয়ে দিল চিরঞ্জীব। দুর্গা নিল গেলাসটা। কিন্তু তাদের মাঝখানে কিসের আড়ষ্টতা এসেছে সহসা, সে কথা কেউ বলল না। কেবল গেলাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে, গোটা জেলা মাতানো বাঘিনীটার মনে হল, তার চোখের জলে আর গেলাসের চা'য়ে বুঝি একাকার হ'য়ে যাবে।

চিরঞ্জীব নারকেল পাতা টানতে টানতে বলল, রাঁধবিনে?

—তুমি তো বিমলাপুর যাবে বললে?

—বিমলাপুর গেলে কি খেতে নেই?

—তা' হ'লে রাঁধব?

যেন তেমন মন নেই, প্রাণ নেই।

চিরঞ্জীব আবার বলল, আমি না খেলে বুঝি রাঁধবিনে?

—না আজ এক ফোঁটা খিদে নেই।

পরমুহূর্তেই চিরঞ্জীবের গলার স্বর যেন চাপা রুদ্ধ শোনাল; তুই একলা যেতে পারবি দুর্গা?

দুর্গা বলল, কোথায়?

চিরঞ্জীব বলল, কোথায় যেন তোর মামারবাড়ি বলছিলি, সেখানে।

দুর্গা অবাক স্খলিত গলায় বলল, পাওনানে?

—হ্যাঁ। কবে যেতে চাস? কাল হোক, পরশু হোক, যত তাড়াতাড়ি হয়, চলে যা সেখানে।

দুর্গা রুদ্ধ গলায় বলল, আর তুমি?

—আমি এখানেই থাকব। তুই চলে যা দুর্গা।

—আমাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি এখানে থাকবে? আমি থাকব পাওনানে?

যেন ফাঁসীর হুকুম শুনছে। শুনে অন্ধকারে হুকুমকর্তার মুখের

দিকে তাকাল সভয় তীক্ষ্ণ চোখে। পরমুহূর্তেই দু'হাতে মুখ ঢেকে, চাপা রুদ্ধ গলায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, কতক্ষণ আগে, চলে যাবার কথা বলতে তুমি আমাকে বারণ করেছিলে ছোট্‌ঠাকুর। এখন তুমিই বলছ?

—হ্যাঁ, বলছি। শোন্‌—

—না, শুনব না। শুনতে পারব না। না না না।

বলতে বলতে দুর্গার একটি হাত জোরে আঁকড়ে ধরল চিরঞ্জীবের পা। বলল, আমি মরতে চেয়েছিলাম ব'লে, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি মারতে চাও?

চিরঞ্জীব ডাকল, দুর্গা।

সে জোর ক'রে পা' থেকে দুর্গার হাত ছাড়িয়ে নিজের হাতে তুলে নিয়ে এল। চিবুক ধরে মুখ তুলল দুর্গার। আবগারির দুঃস্বপ্ন, বাঘিনীটার দু'চোখে জল। সহসা চিরঞ্জীবের এতদিনের মিথ্যে গ্লানির সব বাঁধ ভেঙে গেল। সে দু'হাতের ব্যাকুল বেষ্টনীতে দুর্গাকে টেনে নিয়ে এল বুকের মধ্যে। সব অপমান সব যন্ত্রণা নিয়ে তার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট অমৃতের সেতু রচনা করল দুর্গার ঠোঁটে মুখে চোখে, চোখের জলের লবণাক্ত স্বাদে। কঠিন আলিঙ্গনে বারে বারে ডাকল, দুর্গা। দুর্গা। পারুলবালা।

জীবনে এই বুঝি প্রথম এই নামে ডাকা। তুলে রাখা, ঢেকে রাখা, ভুলে যাওয়া নাম। যে নামের সঙ্গে হয় তো একটি আসল মন-ই বিস্মৃত গুপ্ত ছিল। সেই যে বুক কেঁপেছিল দুর্গার, তা থামল না। তাই সে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল চিরঞ্জীবকে। তার সন্ধ্যার অভিসার শেষ পর্যন্ত বুঝি এই গভীর রাত্রের চোখের জলে প্রতিধ্বনিত হল। তার যৌবন, ধ্যান, জ্ঞান, সব যেন এক শীর্ষবিন্দুতে এসে, চিরঞ্জীবের প্রতিটি স্পর্শের প্রতিটি প্রতিদানে, নিজেকে নিঃশেষ করতে চাইল।

আকাশে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, যেন চলমান নক্ষত্রেরা

তাকিয়ে আছে নীচে, এই অন্ধকার উঠোনের ওদের দিকে। দক্ষিণের বাতাস পুবে জলো হাওয়াকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। টিপ্‌ টিপ্‌ জোনাকী দীপগুলি বাতাসে অস্থির। এই প্রসন্ন অন্ধকার রাত্রি এবং বিশ্ব আর সর্ব চরাচর যেন দুলছে, ঘুমুইছে, স্বপ্নে কথা বলছে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে।

পাতার ওপর পা' ছড়িয়ে, উপুর হয়ে দুর্গা চিবুক রেখেছে চিরঞ্জীবের কোলে। বলল, মিছে বলব না ছোট্‌ঠাকুর, বড় গায়ে লাগছেল দারোগার কথাগুলোন। মনে করতুম, আমার আবার মান। কিন্তুন, মনের কথা কি সব জানি? তা' শহরের মেয়ে পাড়ায় গে' বসিনি, এখেনেও মাতি বুড়ি, বা গানির মত আজ একে, কাল তাকে নে ঘর করতে পারিনি। একা আইবুড়ো বাগদি মেয়ে আমি কপালের লিখন খণ্ডাতে গেছি, তাই দারোগাবাবুদের আকথা কুকথাগুলোন শুনে যেন মুখে কালী লেপে গেল। মনে হয়েছেল, কপালের লিখন খণ্ডানো যায় না, কলঙ্ক আমার ঘুচবে না কোনোদিন। এ আবার কেমন চিন্তা ছোট্‌ঠাকুর? এ পথে আবার ওসব ভাবনা কেন? এ কি শুধু তোমার সঙ্গে মিশেছি ব'লে?

চিরঞ্জীব বলল, না। ওই যে বললি, 'মনের কথা কি সব জানি?' এ তোর সেই মনের কথা।

মাথা নেড়ে বলল দুর্গা, না, এ তোমারি জন্যে। নইলে মরব পণ ক'রে কী মতি হয়েছেল আমার। চোলাই করব বলে তোমাকে কেন খবর দিয়েছিলুম? তোমারি জন্যে, নইলে, তুমিও তো কই ওরা চলে যাবার পর মুখ খুলতে পারোনিকো? কিন্তু আর আমি সে কথা ভাবি না।

—কেন?

—ও যে মিছে কথা। বড় মিছে কথা। লোকে কতকাল ধরে বলে, আড়ালে বলে। দারোগা বলেছে মুখের ওপর। তবু তুমি জান, আমিও জানি, ওদের কথা সত্যি নয়। রাগে ওদের চিত্তির

জ্বলছে। ধরে মারতে পারে না, তাই মারার বাড়া গাল দে' শোধ নিতে চায়। গাল দে' মনের ঝাল মিটিয়েছে। কিন্তুন, তার শোধ নেব।

দুর্গার দু'চোখ জ্বলে উঠল অন্ধকারে। আবার বলল, ওই ছোট দারোগা অখিলবাবু, এখেনে কতকাল ধরে আছে। কাসেমচাচার সময় থেকে। সে একটা শুধু ধাক্কা দিলে কি আর এমনি চেঁচিয়ে উঠতুম? ঘেন্না হয় বলতে, অত বড় লোকটা শরীলের এমন জায়গায় হাত দে' ধাক্কা দিলে, মনে হয়েছেল মুণ্ডুটা ঠুকে দিই!

চিরঞ্জীব হাত রাখল দুর্গার পিঠে। তার চোখও জ্বলছে। বলল, শুধু আইনের জোরটুকু থাকলে সবাই শাসন করতে চায়। আর ওরা আমাদের শোনায়, 'চোরের মায়ের বড় গলা।' দেখি ওরা কত আগুন লাগায়।

সে উঠতে গেল। দুর্গা বলল, কোথায় যাচ্ছ?

—বিমলাপুর। দেখি, গুলিটা কেন সাইকেল নিয়ে আসছে না।

কথা শেষ হবার আগেই, অন্ধকার থেকে গুলির গলা শোনা গেল, দাঁড়িয়ে আছি সাইকেল নিয়ে।

ওরা দুজনেই চমকে উঠল। দুর্গার মনে হল, তার সারা গা'য়ে কাঁটা দিয়ে উঠল লজ্জায়। সে একবার চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেল।

চিরঞ্জীবও যেন কেমন বিব্রত হ'য়ে উঠল। বলল, কতক্ষণ এসেছিস?

—এই আসছি।

—তা ডাকবি তো।

গুলি বলল, ডাকতে যাচ্ছিলুম।

সে সাইকেল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

চিরঞ্জীব বলল, দাঁড়া, টর্চ লাইটটা নিয়ে আসি ঘর থেকে।

সে ঘরে এসে দেখল, দুর্গা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে, পায়ের নখে

মেঝের মাটি খুঁটছে। এ এক অচেনা দুর্গা। ঠোঁটের কোণে লজ্জিত হাসি, চোখের পাতা তুলতে না-পারা এক বিচিত্র ব্রীড়া জড়ানো সর্বাঙ্গে। তার চেয়েও অদ্ভুত শোনালো, যখন সে মুখ না তুলে বলল, ছি!

চিরঞ্জীব কাছে এসে বলল, ছি করার কী আছে। কোন অপরাধ তো করিনি।

যদিও চিরঞ্জীবেরও কোথায় যেন একটি লজ্জা বোধ থেকে গিয়েছে। কারণ উঠোনের মাঝখানে দুর্গাকে কোনোদিন অমন ক'রে নিয়ে বসেনি।

দুর্গা বলল, অপরাধ না-ই বা হল। লজ্জা করে না বুঝিন্?

প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি ভঙ্গি আজ অন্যরকম লাগছে দুর্গার। কী এক মোহিনী শক্তি যেন আজ ওর আয়ত্তে। কথার জবাব দিতে গিয়ে, তাই সে আগে দুর্গাকে টেনে নিল কাছে। বারে বারে নুয়ে পড়ল দুর্গার মুখের ওপর।

দুর্গা রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে বলল, গুলিটা দাঁড়িয়ে আছে যে? তা' হ'লে ওকে চলে যেতে বল। আর এত রাতে না-ই গেলে বিমলাপুরে।

চোখ তুলে দুর্গার দিকে তাকিয়ে একবার চিরঞ্জীবও তাই ভাবল। পরমুহূর্তেই বলল, না, যেতে হবে। টর্চ লাইটটা দে।

দুর্গা টর্চ লাইট দিয়ে বলল, এখেনে আসবে তো ফিরে?

—হ্যাঁ। যত রাত হোক, রেঁধে রাখিস্, খাব।

—আচ্ছা।

কিন্তু এই দুর্গা ঠায় তাকিয়ে থাকত চিরঞ্জীবের মুখের দিকে। তাতে চিরঞ্জীবই লজ্জা পেত। আজ দুর্গা লুকিয়ে তাকাচ্ছে।

চিরঞ্জীব চলে গেল। কিন্তু পরস্পরকে ছেড়ে যাবার কথাটা আর ওরা বলল না। কারণ, সমাজের চোখে যত হেয় হোক, ওইটুকুই বোধ হয় ওদের মূলধন।

চিরঞ্জীব চলে যাবার পর দুর্গা বলল, গুলি যাস না যেন। না বললেও গুলি যেত না। আজ তার দুর্গাদিকে দেখার বড়

কৌতূহল। সে শুধু দেখেছে, দুর্গাদি চিরোদার কোলে মুখ রেখে শুয়ে আছে। আর চিরোদা দুর্গাদির গা'য়ে হাত রেখেছে। ও দেখাটা নতুন বটে। কিন্তু না-দেখা আরো কিছু অনুভব করেছে গুলি ওর মন আর বয়স দিয়ে। আজ তাই দুর্গাদিকে ওর দেখতে ইচ্ছে করছে।

দুর্গা বাইরে এসে বলল, এখানেই খা'বি। কয়লার উনুনটা নিয়ে আয় তো এদিকে। পাতাগুলোন সব ভেজা। কাঠের ঝামেলাও পোয়াব না আজ। খান কয়েক ঘুঁটে দিয়ে, কয়লাই জ্বালাব। তাকিয়ে আছিস কি? যা।

আজ দুর্গার গুলিকেও লজ্জা। গুলির দিকেও যে ভাল ক'রে তাকান যায় না যেন। আর গুলির মনে হ'ল, দুর্গাদি'কে এত সুন্দর কোনোদিন দেখেনি সে। কয়লার উনুনটা নিয়ে এল গুলি দাওয়ার কাছে।

দুর্গা ঘুঁটে কুচিয়ে দিতে দিতে বলল, ভাত বসিয়ে আমি এট্টুখানি বেরুব। তুই থাকবি, বুঝলি? ভাতটা ফুটে গেলে নামাতে পারবিনে?

ব'লে তাকাতে গিয়েও চোখ নামাল দুর্গা। গুলি যেন কেমন হাবাগোবার মত তাকিয়ে আছে।

গুলি বলল, কোথায় যাবে?

—বেদোর ওখেনে যাব একবারটি।

—শ্মশানে?

—তা' কী হয়েছে? শুনিস্ নি, পাড়ায় অষ্টপোহর আবগারি পাহারা বসাবে। সবসময় চোখে চোখে রাখবে। বরং আজ রাতের মধ্যে আর আসবে না। তৈরী জিনিস প'ড়ে আছে বেদোর ঘরে। রাতভর ওর ঘরে জিনিস থাকলে কাল আর কিছু থাকবে না। দেবা-দেবী দুটিতে সব গিলে বসে থাকবে। রাত পোহাবার আগে যেন সব কবরেজের বাড়ি পৌঁছে দেয়, সেকথা বলে আসব।

গুলি আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগল। সে একলা যাবে, একথা বলার সাহস তার নেই। সব জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু শ্মশানে একলা? এ বোধহয় সে কোনোদিন পারবে না। বলল, একলা যাবে দুর্গাদি?

দুর্গা বলল, তা' দোকলা পেলুম কবে রে? বেদোর ব্যাপার তো ছোট্‌ঠাকুর জানে না। আর শ্মশানে তো মানুষ একলাই যায়।

বলে ঠোঁট টিপে হাসল।

যদিও গুলির পরনে পায়জামা আর চুলে পানিফলের মত ত্রিকোণ উচ্চতা, তবু তাকে বড় অসহায় মনে হল। বলল, তার চেয়ে এক কাজ করনা দুর্গাদি। উনুন ধরিয়ে, ঘরের মধ্যে ভাত বসিয়ে দাও। তারপরে চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

দুর্গা ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত ভাবল। বলল, তা মন্দ বলিস নি। তা' হ'লে আমি উনুন ধরাই। তুই একবার আশপাশটা পাক দে' দেখে আয়। ভোলা কেটাকে তো বিশ্বেস নেই।

বলা মাত্র গুলি নিঃশব্দে মিশে গেল অন্ধকারে। দুর্গা উনুন ধরিয়ে, চাল ধুতে ধুতে ওর ছেলেবেলার একটি গান গুনগুনিয়ে উঠল,

ও কুসুম লুকোবি কোথা
ভোম্‌রা আছে যথা তথা।

কিছুক্ষণ পর গুলি ফিরে এলে, ঘরে ভাত বসিয়ে শিকল তুলে, দুর্গা বেরিয়ে গেল। খালধারে এসে পাশে চলতে চলতে গুলি হঠাৎ বলল, জান দুর্গাদি, চিরোদা'র মা কী করছে?

—কী?

—চিরোদার জন্য সম্বন্ধ দেখছে, বে' দেবে।

দুর্গা হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারল না। যদিও হাসতে হাসতে একদিন চিরঞ্জীবও বলেছিল।

একটু পরে দুর্গা বলল, তা' ছেলের বে' দেবে না?

গুলি সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, ওই যে সেই

অশ্বিনী চাটুয্যে, চিরোদা'কে তো কত গালাগাল দিত বামনাটা। সে নাকি রাজী হয়েছে তার মেয়েকে দেবে। বলেছে, 'ব্যাটাছেলে, চুরি করুক চোলাই করুক, কী এসে যায়। রোজগার থাকলেই হল। আর চিরঞ্জীবের মত ছেলে সহায় থাকলে ভাবনা কী?

দুর্গা হঠাৎ বলল, তা এসব আমাকে বলছিস কেন?

গুলি বলল, আমার রাগ হয় শুনলে।

—তোর রাগ হলে কী হবে? ছোট্‌ঠাকুর যদি বে' করে চাটুয্যের মেয়েকে?

গুলি বলল, চিরোদা? একবার বলুক না তাকে। ওই মা'কে সুদ্ধ চাটুয্যেকে বিদেয় করবে। চিরোদা যখন থাকে, তখন চাটুয্যে বাড়িতেও ঢোকে না।

দুর্গা চুপ ক'রে রইল। কিন্তু তার চোখের সামনে চিরঞ্জীবের মুখখানি ভাসতে লাগল অন্ধকারে। বুকের মধ্যে কোথায় যেন ধিক্কারের ধ্বনি শুনতে পেল দুর্গা। সে সহসা গুলির কাঁধে হাত রেখে, তাকে কাছে টেনে নিয়ে চলতে লাগল। বলল, বে' যদি করেই, তাতে কী? তবু তো সে সেই ছোট্‌ঠাকুরই। এর বেশী বলতে লজ্জা করল।

গুলি ভেবেছিল দুর্গাদির মন খারাপ ক'রে দিয়েছে সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্ধকারেও টের পেল দুর্গাদির মুখে একটি সুন্দর হাসি। দুর্গাদি যেন বাতাসে ভর করে চলেছে। দুর্গাদি তাকে কোনোদিন এমন আদর করে কাঁধে হাত দেয়নি। এমন ক'রে একজন যুবতী মেয়ের নিঃসঙ্কোচ স্নেহ সে কখনো পায়নি। কোথায় যেন তার একটু অস্বস্তি লাগল। কিন্তু তার ভবঘুরে দুর্বিনীত প্রায় কৈশোর উত্তীর্ণ মন আনন্দে ভরে উঠতে লাগল। তবু বুকের মধ্যে কেমন যেন টনটন করতে লাগল। গুলির মনে হল, ওর চোখে জল আসতে চাইছে।

একটু পরে গুলি বলল, আমি জানি দুর্গাদি, 'চিরোদা' তোমাকেই বে করবে।

দুর্গা হেসে উঠে বলল, তুই একটা মুখপোড়া। আমি জাতে বাগদি না?

গুলি বলল, হলেই বা। চিরোদা ওসব মানে না।

দুর্গা চুপ করে রইল। শুধু চিরঞ্জীবের মুখখানি দেখতে লাগল।

গুলি চুপ ক'রে থাকতে পারছে না। হয় তো কোনো কারণ নেই। কিংবা কেন কথা বলছে, নিজেও ঠিক জানে না। আবার বলল, কিন্তু, আমাদের খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে দুর্গাদি। পুলিস আমাদের খুব পেছুতে লাগবে এবার।

—জানি।

—সবাই আমাদের পেছুতে লেগেছে। ঠিক যেন সাঁড়াসীর মত ঘিরেছে আমাদের।

জবাব দেবার আগেই একটা চাপা শাসানি শুনতে পেল দুজনে। লক্ষ্য করে দেখল, শ্মশানে এসে পড়েছে। কোনো চিতা জ্বলেনি। ঝুরি নামা বটের তলায়, বেদোর চালা ঘরটাও অন্ধকার। শুধু একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। চারিদিক খোলা পেয়ে, বাতাস এখানে সোরাগোল তুলে দিয়েছে।

দুর্গা চাপা গলায় ডাকল, বেদো খুড়ো।

বেদোও কান খাড়া রেখেছিল.। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, কে মেয়ে নিকি?

—হ্যাঁ।

—আরে বাবা! এস এস।

দুর্গা কাছে এসে বলল, বাতি কোথায়?

—নেই! তেল ফুরিয়ে গেছে।

বলেই অন্ধকারে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই, এই হারামজাদীর জন্য।

দুর্গা বলল, কী হয়েছে, ধমকাচ্ছো কেন?

বেদো চাপা গর্জন ক'রে বলল, ধমকাচ্ছি? ধরে বেঁধেছি মাগীকে। তোমাকে খবর দিতে গেছলুম, এসে দেখি উনি প্রাণ ভরে মাল খেয়ে

চিৎ হ'য়ে পড়ে আছেন। ওই তক্কে তক্কে ছেল, আমি কখন বেরুব বুইলে? আর তেলের কথা মনে থাকে?

দুর্গার টেপা হাসিটা অন্ধকারে দেখা গেল না। বলল, তা ধ'রে বেঁধেছ কেন?

—বেঁধে গেলাচ্ছি। দেখি ও কত গিলতে পারে মদ। হা করবে না, তাই এই পেতলের হাতা সিঁয়েছি।

এতক্ষণে বেদোর ডোমনী ককিয়ে উঠল, অই গো মেয়ে, দেখ আমার কষ দে' রক্ত বার ক'রে দিয়েছে। ওই হাতার বাট দে' আমার মুখ ফাঁক ক'রে ক'রে মদ ঢেলে দিচ্ছে। পায়ে ধরছি, তবু ছাড়ছে না।

দুর্গা উদগত হাসি চেপে বলল, তা' তুমিও যেমন। ওসব করতে যাওয়া কেন?

যদিও, দুজনেই সমান। পাল্টা শোধ এক সময়ে ডোমনীও নেবে। তবু আপাতত বেদোর রাগ থামাবার জন্যে দুর্গার আর কিছু বলার ছিল না।

বউ কেঁদে উঠে বলল, এবারটি আমাকে ছেড়ে দিতে বল। লইলে মরে যাব নিগ্‌ঘাৎ।

বেদো হেঁকে উঠল, তো কি বাঁচবার জন্যে তোকে গেলাচ্ছি। এ মশানে এইছিস। আজ তোকে শোধ বিদেয় দেব।

দুর্গা বলল, তা আর এখন কর না। পুলিসের হাঙামা খুব বেড়েছে। তুমি চলে আসার পর আবগারির বড়বাবু ছোটবাবু, সব এয়েছেল আবার।

বেদো যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ল। বলল হ্যাঁ!

—হ্যাঁ শোন, এই নাও বোতল খাবার। এই চারটিতে ভরতি ক'রে, রাত পোহাবার আগেই দিয়ে আসবে কবরেজের বাড়িতে। আমার ওখেনে যেন ত্যাখন যেও না, বুঝলে? সব সময় পুলিসের নজর আছে।

ব'লেই দুর্গা বেরুবার উপক্রম করল।

বেদো ব্লাডারগুলি নিয়ে বলল, চলে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ, ভাত বসিয়ে এয়েছি।

গুলি এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। যাবার আগে খালি বলল, খুড়িকে যা খাইয়েছ খাইয়েছ, আর খাইওনি। নিজেও আর খেও না। গন্ধে তো মাতিয়ে দিয়েছ শ্মশান।

বেদো তাড়াতাড়ি যুক্তি দিয়ে বলল, তা বললে হবে না বাবা গুলিরাম। মশানের গায়ে ও গন্ধ সবসময়ে লেগে আছে জানবে। কারণ কি, না—

দুর্গা বাধা দিয়ে বলল, খুড়ো চুপ কর। খুড়িকে রান্না করতে দাও। তুমি বেরিয়ে পড়।

বলে, দুর্গা আর গুলি তাড়াতাড়ি খাল ধার ধরে এগিয়ে গেল।

গুলি বলল, সেটি হচ্ছে না। খুড়ো এখন কী করবে আমি জানি।

দুর্গা জানলেও, কৌতুকচ্ছলে হেসে বলল, কী করবে ?

গুলি বলল, খুড়ি কাঁদবে। সামলাতে গিয়ে খুড়োও কাঁদবে খানিকক্ষণ, তারপর—

কথা শেষ হবার আগেই দুর্গা হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। বলল, তা পরে দুজনেই আরো খানিকটে গিলবে।

গুলি তাড়াতাড়ি বলল, চুপ দুর্গাদি, কেউ শুনতে পাবে।

দুর্গা মুখে আঁচল চাপল। ডাকিনীর চেয়ে আজ দুর্গা রঙ্গিনী বেশী।

কিন্তু শুধু বাগদিপাড়া নজরবন্দী ক'রে স্বস্তি বোধ করল না বলাই! কয়েকদিন পরেই সে একদিন অক্রুরদে'কে ডেকে পাঠাল। এই ডেকে পাঠানোর মধ্যে নিজেকে ছোট মনে হল বলাইয়ের। অস্বস্তি হল। তবু তার তীব্র জেদ বাধা মানল না।

অক্রুর এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। অক্রুর নয়, ওকুর। ওই নামেই তাকে মানায়। ফিন্‌ফিনে ধুতি হাঁটুর ওপরে। থপ্‌থপে

মাংসল বুকটা হাট ক'রে খোলা। সার্টের সোনার বোতাম শুধু পটিতে লাগানো। এসে হাত জোড় ক'রে, পোষা কুকুরের মত হেসে বলল, ডেকেছেন স্যার?

এসেছে ভয়ে ভয়েই। কোথাও কোনো বিপদ আপদ ঘটে বসে আছে কি না কে জানে। যদিও কোনো বিপদের সংবাদ সে পায় নি। আবার আশাও আছে মনে মনে, যদি এতদিনে বলাই সান্যালের সুমতি হ'য়ে থাকে। তা হ'লে হাত ভরে টাকা দেবে অক্রুর তাকে।

কিন্তু বলাই তাকে একবারও বসতে বলল না। ভাল ক'রে ফিরেও তাকাল না। শুধু অখিলবাবু আর কাসেম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বলাইয়ের দিকে। কী জন্য অক্রুরকে ডাকা হয়েছে, এখনো কিছুই জানে না তারা।

বলাই বলল, হ্যাঁ, ডেকেছি। কথা আছে আপনার সঙ্গে।

ঘাড় কাৎ ক'রে, বিগলিত হেসে বলল অক্রুর, বলুন স্যার। শোনা মাত্রই এসেছি। কিন্তু স্যার, এর মধ্যে আমার কোনো মাল—

—সেইজন্যে নয়।

বলাই বাধা দিল। তবে যে-জন্যে ডেকেছে, সেকথা বলতে শুধু সঙ্কোচ নয়, লজ্জা হচ্ছে। তার নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। কার্যসিদ্ধির মধ্যেও কোথায় যেন একটা পরাজয়ের খোঁচা লাগছে। কিন্তু না ব'লে উপায় নেই।

সে ফাইলের থেকে চোখ না তুলেই বলল, দেখুন, আমি বললেও তো চোলাইয়ের ব্যবসা ছাড়তে পারবেন না। কারণ, যে গরু একবার বিষ্টা খায়, সে আর তা' ছাড়তে পারে না।

অক্রুর মাথা নীচু ক'রে, হেসে বলল, কী যে বলেন স্যার।

বলাই অক্রুরের চোখের দিকে তাকাল। বলল, তা তো বটেই, কথাটা সুবিধের লাগল না। কিন্তু একটা কথা রাখতে পারবেন।

—বলুন স্যার।

—আমার কাছ থেকে তাতে কিন্তু আপনি একটুও উপকৃত হবেন

না। আমি কোনোদিন আপনার কাছ থেকে ঘুষও খাব না। আপনার লোককে পেলেও ছাড়বো না। ভেবে দেখুন।

অক্রুর তেমনি কুঁজো হ'য়ে বলল, তা কি হয় স্যার। শত হলেও আইন বলে একটা জিনিস আছে দেশে। আপনি তা রক্ষে করছেন। আপনার মতন মানুষ কখনো ঘুষ খেতে পারেন? ও আমাকে কেউ তাঁরা তুলসী গঙ্গা—

—থাক্।

—অ্যাঁ?

—বলছি থাক, অতটা বলতে হবে না। কথাটা রাখতে পারবেন কি না, তাই আগে বলুন।

—চেষ্টা করব স্যার।

বলাই বলল, মাস কয়েক এই চোলাইয়ের কাজ বন্ধ রাখতে পারবেন?

অক্রুর যেন বুঝতে পারেনি, এমনি বোকার মত তাকিয়ে রইল।

বলাই আবার বলল, বুঝতে পারলেন না। আমি বলতে চাইছি, আপনারা সবাই সরে দাঁড়ান, চিরঞ্জীবকে একলা স্মাগল করতে দিন। আমার সুবিধে হবে।

অক্রুর তাড়াতাড়ি বলল, তা স্যার আপনার হুকুম নিশ্চয় পালন করব। তা' ছাড়া, আপনার শাসনে ও-কারবারে তো একেবারে ঢিলে পড়েই গেছে।

রাগে ও অস্বস্তিতে, বিদ্রূপ করে বলল বলাই, তাই নাকি? কিন্তু এখন সুযোগ নিয়ে সেটা পরে আর জোরদার করতে পারবেন না। তা' আমি দেবও না পারতে। একটা জিনিস বোঝেন তো, আপনাদের চেয়ে চিরঞ্জীবকে ধরাই মুশকিল বেশী।

অক্রুর বুঝল বলাইয়ের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। চিরঞ্জীবকে সামলাতে পারলে সবাইকে সামলানো যাবে। অক্রুরদের যে-কোনোদিন টিট্ করা যায়। করা হয়েছেও অনেকখানি। তবে,

অক্রূরের ফণা নেই, কিন্তু বিষ ছিল। সে-বিষ একটু না উগ্‌রে সে পারল না। বলল, তা যা বলেছেন স্যার। অতবড় চোলাইকর আর এ তল্লাটে কখনো কেউ দেখেনি। তবে, সনাতন ঘোষকে স্যার কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনাকেও তার ওপর থেকে মামলা তুলে নিতে হবে।

ছোবলটা ঠিক জায়গাতেই লাগল। বলাইয়ের বুকের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত জ্বলে উঠল। কথাটা সত্যি কিন্তু অপমানকর। সেই বিস্ময়কর চিঠিটার কথা কোনোদিন ভুলতে পারবে না বলাই। খুব সাধারণ চিঠি, তাতে কোনো বড় জায়গার ছাপ ছিল না। একটি নাম সই যথেষ্ট ছিল। চিঠির বক্তব্য ছিল, 'শাসনের আওতায় সবাইকে রাখার চেষ্টা ক'রো না, কারুর কারুর সঙ্গে মিলে মিশে আলোচনা করে, পরস্পরের মধ্যে একটা মিতালীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে নিতে হবে। পাবলিক কোর্টের সামনে তাদের হাজির না ক'রে, সব সময়ে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করা উচিৎ। নিজেদের লোক সম্পর্কে তোমার অবহিত হওয়া উচিৎ। এটা নীতি। পত্রটি সনাতন ঘোষের হাত দিয়েই পাঠালাম, কিছু মনে কোরো না। তোমাদের কর্তার সঙ্গে তোমার বিষয়ে আমি আলাপ করব। পত্রটি পড়ে ফিরিয়ে দিও, এই অনুরোধ।'

পত্রটি প'ড়ে স্তব্ধ আড়ষ্ট হ'য়ে বসেছিল বলাই। সেই মুহূর্তে তাকে ভাবতে হয়েছিল, হয় চাকরি রাখা, অন্যথায় চিঠিটি হস্তগত ক'রে, নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়া। এবং নিশ্চিৎ বরখাস্তের জন্য অপেক্ষা করা। শুধু বরখাস্ত নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু ঘটা অসম্ভব নয়।

একটি চকিত মুহূর্তের জন্য বোধহয় শক্ত হ'য়ে উঠেছিল বলাইয়ের মন। কিন্তু সেটা বিবেকের কথা। পরমুহূর্তেই সে দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। নিজেকে তার মনে হয়েছিল, একটা মার খাওয়া খাঁচা বন্ধ জীব। খাঁচাটা জীবনধারণের। চিঠিটা সে ফিরিয়ে দিয়েছিলো।

সনাতন ঘোষের হাতে। বিজয়ী সনাতন ঘোষ যাবার সময় খালি বলেছিল, আমার মামলাগুলো তুলে নেবার চেষ্টা করবেন বলাইবাবু। যখনই দরকার পড়বে, আমাকে ডাকবেন। যে কোনো কারণে, যখন খুশি।

মামলা তুলতে হয়েছিল। কোনোদিন ডাকেনি বলাই সনাতনকে। সেইদিন থেকে সে মনে মনে স্থির করেছে, আগে চিরঞ্জীব, তারপর সাধারণ লোক লেলিয়ে দিতে হবে ওই সনাতনের ওপর। কারণ, তাকে ধরার অধিকার পুলিসের নেই। কিন্তু সনাতনকে সে রেহাই দেবে না। আইনের আশ্রয় নিয়ে সনাতনকে ধরা যাবে না। আজ যেমন সে ভাবছে, সবাইকে সরিয়ে ফাঁদের মধ্যে একলা চিরঞ্জীবকে এনে ফেলবে, ঠিক তেমনি ক'রে সনাতনকে ধরার কথা ভেবেছিল। সবাইকে দূরে রেখে, একলা সনাতনকে বিচরণ করতে দেবে সে। তারপরে সাধারণ মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে। সাধারণ মানুষকে লেলিয়ে দিতে হবে ওর বিরুদ্ধে।

আর জীবনে বোধ হয় এই একটি ব্যাপার, পত্রটির বিষয় মলিনাকে কখনো বলতে পারেনি বলাই। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল শুধু আবগারি ইনসেপকটর সুরেশবাবুর মুখ। সুরেশবাবুর পরিণতিটা যেন এই শাসনতন্ত্রের একটি স্বাভাবিক ছন্দ।

অক্রূরের কথায়, রাগে ও ঘৃণায় জ্বলে উঠল বলাই। বলল, সে বিষয় আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি তা' হ'লে আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন?

অক্রূর তেমনি বিগলিত বিস্ময়ে বলল, আপনি যেমন বলবেন স্যার। তবে যদি অনুমতি দেন, একটা কথা বলব?

—কী?

—চিরো বাঁড়ুজ্জেকে আপনি জেলা খারিজ ক'রে দিন না।

এক মুহূর্ত থমকে বলাই বলল, কী লাভ। আপনারা কণ্টকশূন্য হতে পারেন, কিন্তু চিরঞ্জীবের কিসের টান. আছে এখানে? কিছু

না। সে যেখানে যাবে, সেখানেই চোলাই করবে, স্মাগ্‌ল করবে। তাকে আমি দেশছাড়া করতে চাইনে, অপরাধ বন্ধ করতে চাই। তা' ছাড়া, ওকে তাড়িয়ে দিলে মেয়েটার কী হবে?

অক্রুরের যেন বিষম লাগল। সে অবাক হ'য়ে বলল, আজ্ঞে কী বললেন স্যার? বলেই বুঝতে পারল, বলাই, কথাটা ঠিক পুলিসের মত হয়নি। চিরঞ্জীবের অভাবে দুর্গার কী হবে, সে দুশ্চিন্তা বলাইয়ের করার কথা নয়। নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গিয়েছে তার।

কিন্তু অক্রুর কথাটাকে ঠিক, ধুলো থেকে চিনির টুকরো তুলে নেওয়া পিপড়ের মত তুলে নিল। তাড়াতাড়ি আবার বলল, অ! সেটা ঠিক বলেছেন স্যার। মেয়েটার মাথার ওপরে কারুর থাকা দরকার। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব স্যার মেয়েটাকে। আগেও অনেকবার বলেছি স্যার—

—কিন্তু যেতে চায়নি মেয়েটা, না?

বলাই অক্রুরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। অক্রুর একটু থতিয়ে গিয়ে হাসল। বললাম, হ্যাঁ স্যার।

বলাই বললে, শুনুন, আপনাদের বাড়িঘর দোর নানান ব্যবসা আশেপাশে আছে। জেলা খারিজ যদি করতে হয়, আপনাদের মত লোককেই আমি করব। তাতে ফল হবে।

অক্রুর করুণ গলায় বলল, আঁজ্ঞে?

—হ্যাঁ, চিরঞ্জীবকে জেলা খারিজ ক'রে আমার কোনো লাভ হবে না। তবে আপনাদেরও করতে চাইনে আমি। তা' হ'লে, আজ থেকে ওই কথা রইল। কাজ বন্ধ থাকবে, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এবার আসুন।

অখিলবাবু আর কাসেমের দিকে একবার তাকিয়ে, বলাইকে নমস্কার ক'রে বলে গেল অক্রুর।

বলাই জিজ্ঞেস করল কাসেমকে, কী মনে হল কাসেম। অক্রূর কথা রাখবে?

কাসেম বলল, রাখতে পারে। চিরঞ্জীবকে যদি ঘায়েল করা যায়, সেই আশায়।

কিন্তু স্বস্তি পেল না বলাই। তার কপালে কতগুলি সর্পিল রেখা ছড়িয়ে রইল জালের মত। কিন্তু ওপরে মলিনার কাছে যেতে তার ইচ্ছে করল না। ঘুরে ফিরে মলিনাও এই প্রসঙ্গেই আসবে। একটু বাঁকিয়ে, ঠোঁটের কোণে হেসে জিজ্ঞেস করবে, 'কী, নতুন কোনো ফাঁদ পাতলে নাকি?' এক্ষেত্রে বলাইয়ের পরাজয়-ই মলিনার কাম্য। মলিনা ভুলে যায়, সে আবগারি অফিসের বাড়িতে বাস করে। সে একজন ইনসেপকটরের স্ত্রী। সে নিজের মন দিয়ে, নিজের জগৎ দিয়ে বিচার করে। মনে করে, বলাই এই সমাজ ও শাসনের কিছু বোঝে না। মলিনা সহজ বোঝে। বোঝে শুধু ভালোবাসাবাসি। সংসারের একমাত্র নিরীখ। কষ্টিপাথর। সেইটুকু বুঝি বলাইয়েরও পরম ভাগ্য। কিন্তু প্রত্যহের তিক্ত কুটিল জটিলতা সে বোঝে না।

তবু এখন ওপরেই যেতে হবে। হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল সে কাসেমকে, যে মামলা তিনটে আছে, তাদের মালগুলো বার ক'রে রাখ। আমি কোর্টে যাব। অখিলবাবু বিমলাপুর পর্যন্ত একটা টহল দিয়ে আসবেন। বিনয় কোথায়?

কাসেম বলল, নিল্লায় গেছে একটা কেসের সংবাদ পেয়ে।

বলাই বেরিয়ে গেল। কাসেম দেয়ালে ঝোলানো, বড় চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে বলল, কই, কিছু বললেন না ছোটবাবু?

অখিলবাবু বললেন, বলার দরকার নেই কাসেম। আমি জানি ও ছুঁড়িকে না ধরতে পারলে চিরঞ্জীবকে ধরা যাবে না কোনোদিন। দেখি, আমিই সে চেষ্টা করব।

কাসেমের সুরমা টানা চোখের চাউনিটা তীক্ষ্ণ হল। কুঁচকে উঠল

চোখের কোল। বেশ কয়েক বছর এক সঙ্গে থেকেও এমন সন্দেহ কোনোদিন হয়নি তার অখিলবাবুর সম্পর্কে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে কাসেম অনুভব করছে, ছোটবাবুর মনে একটি ফুল ফুটেছে। সে ফুল দুর্গা। মনে মনে সে বলেছে, ই-আল্লা! তাজ্জব। খোদার মর্জির কোনো তল নেই নাকি? আত্মীয়স্বজনহীন বিপত্নীক প্রায় বুড়ো ছোটবাবুর নজর শেষে ওখানে গিয়ে ঠেকল! বড় বেকায়দার জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে।

সে চাবিটা নিয়ে মালখানার দিকে এগুল। মালখানাটা এই প্রকাণ্ড বাড়ির এক অন্ধকার মহল। লোকে বলে, সেকালের জমিদারের কোট ঘর আর জেলখানা ছিল এই মহলে। অচেনা মানুষ হ'লে একলা আসতে ভয় পেত। রাতে অবশ্য পালা ঘরে পাহারা দিতে হয়। কারণ, মালখানা থেকে মাল চুরি হ'য়ে গেলে, কোর্টে প্রমাণ করা যাবে না।

কাসেম থমকে দাঁড়াল। ঝনাৎ ক'রে শব্দ হ'ল তার চাবির গোছায়। বলল ওখানে কে?

মালখানায় যাবার সুদীর্ঘ বারান্দার দু'পাশেই ঘর। তারই এক অন্ধকার কোণ থেকে আবির্ভাব হল ভোলা আর কেষ্টর। মুখে পোষা জন্তুর হাসি, চোখে একটা অপ্রস্তুতের ভাব।

ভোলা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, আমরা চাচা।

কাসেম দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, শালা! তোদের না ছোটবাবু চব্বিশ ঘণ্টা বাগ্‌দিপাড়ায় থাকতে বলেছে।

কেষ্ট বলল, সারাদিনই তো থাকি চাচা। এখন সব রান্না খাওয়ার সময়, তাই একটু চলে এয়েছি।

কাসেম ভেংচে বলল, কেন এয়েছ।

ভোলা কেষ্টকে যেন কেউ কাতুকুতু দিয়েছে, এমনি ভাবে তারা হাসতে লাগল।

কাসেম বলল, বাঃ! বাঃ!

ভোলা কেষ্টর হাসি তাতে আরো বাড়ল। কাসেম চাবির গোছাটা সুদ্ধ হাত তুলে খেঁকিয়ে উঠল, চোপ্! চোপ্! মস্করা করতে এয়েছ কাজ ফেলে? ঠিক খেয়াল আছে এসময়ে মালখানা খোলা হবে। আর ছুটিতে এসে খাপটি মেরে আছ? ডাকছি ছোটবাবুকে।

ভোলা ব'লে উঠল, পা'য়ে পড়ি চাচা।

কেষ্ট বলল, হ্যাঁ চাচা পা'য়ে পড়ি। ছোটবাবুকে ডেক না। তোমার সঙ্গে খালি এট্টু ঢুকব আর বেরুব।

—খালি ঢুকবে আর বেরুবে? কেন, ঠাকুর আছে মালখানার মধ্যে?

আবার দুজনে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ক'রে হেসে উঠল।

কাসেম মালখানার দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, ওসব কিছু হবে না বলে দিলুম। কোনো কিছুতে হাত দিবি তো, হাত মুচড়ে ভেঙে দেব।

দরজা খুলল সে মালখানার। একটা তীব্র গন্ধ আর একটা ভিন্ন জগৎ। অনেক উঁচুতে মোটা মোটা লোহার রড গাঁথা দুটি গবাক্ষ। সেই আলোয় প্রায় সবটাই দেখা যায়। আর কোনো জানালা নেই। দরজাও মাত্র একটিই।

প্রথমেই চোখে পড়ে রাশি রাশি ব্লাডার। টিউবও কম নয়। তা ছাড়া তরকারির ঝাঁকাতে ব্লাডার আর টিউব আছে। তরকারি অনেকদিন শুকিয়েছে। ব্লাডার টিউবে পড়েছে ছাতা। ফুটো হ'য়ে গলে গলে পড়ছে মদ। স্যুটকেশ, ট্রাঙ্ক, ঝুড়ি, মাটি আর ধাতুর হাঁড়ি, কেরোসিনের টিন, ছোট বড় মাঝারি শত শত বোতল। সবই বে-আইনি ধরা-পড়া মদের পাত্র। নিঝুম, মদ খাওয়া অসাড় হল ঘরটায় কোনো সাড়া শব্দ নেই। কেবল গবাক্ষ দিয়ে ঢোকা বাতাসে চাপা ফিস ফাস। ইঁদুর কখনো আসে না এ ঘরে। সাপের কোনো প্রশ্নই নেই। যদিও সাপের পক্ষে একদিক থেকে আদর্শ

আশ্রয় এই প্রায়ান্ধকার ঘরটা। কিন্তু গন্ধেই তাকে পালাতে হবে।

শুধু নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠল ভোলা আর কেষ্টর। চোখের চাউনি বদলে গেল। ভোলা বলল, দুগ্‌গার রস আছে মালখানায়।

কেষ্ট বলল, হ্যাঁ, বাঁকা বাগদির মেয়ের রস।

দুজনে রক্তাভ চোখ তুলে, শত শত ব্লাডার টিউব বোতল আর ঝাঁকাগুলির দিকে তাকায় অনুসন্ধিৎসু চোখে।

কাসেম হাঁক দেয়, অই, অই ছুঁচো, ধর এটা। দরজার কাছে রাখ্‌।

তিনটি বোতল সুদ্ধ একটি চাটের থলি এগিয়ে দিল সে।

ভোলা হুকুম পালন করল যন্ত্রের মত। কিন্তু তার নজর অন্যদিকে। নাকের পাটা ফুলিয়ে নিঃশ্বাস টেনে টেনে দুজনেই ব্লাডারের গায়ে হাত বোলাতে থাকে। যেখানে ব্লাডারের গা' বেয়ে মদ চুঁইয়ে পড়ছে, সেখানে আঙুল ঘষে ঘষে, শোঁকে। পরপর দুজনেই চোখাচোখি ক'রে হাসে। চাপা হিস্‌হিস্‌ শব্দে হাসে।

—এই শালারা, ধর এটা।

গুটিতিনেক মাটির হাঁড়ি, মুখে মুখে পর পর সাজানো। তিনটের মধ্যেই তিনটি মদ ভরতি ব্লাডার। হাঁড়িগুলি দিয়ে, সে এগিয়ে গেল একটা টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপরে ছিল একটি বড় মাটির টব। টবে ছিল গাঁজা গাছের ছোট ছোট চারা। ধরা পড়েছে দিন কুড়ি আগে। যদিও বলাইয়ের নির্দেশে জল দেওয়া হয় রোজ, তবু গাছগুলির মরো মরো অবস্থা। আজ কোর্টে দিন পড়েছে এ কেসের। টবটা তুলে নিয়ে এসে, কাসেম হাঁক দিল, আয়, বেরিয়ে আয়।

ভোলা আর কেষ্ট তখন আঙুল দিয়ে নেড়ে নেড়ে পোকা দেখছে। মদের পোকা, শাদা শাদা, প্রায় কেঁচোর মত মোটা কিন্তু ছোট ছোট।

ভোলা বলল, মালের বাচ্চা।

কেষ্ট বলল, মালেরও খোকা খুকু হয়।

আর ওদের দুজনেরই মনে হ'ল, সমস্ত চোলাই মদের পাত্রগুলির ওপরে যেন মহারাণীর মত বসে আছে দুর্গা। সেই যেমন বসেছিল ন্যাড়া কালীতলায়।।

কাসেম আবার ধমক দিল। এই, আসবি? না তালা বন্ধ ক'রে যাব?

ওরা দুজনে করুণ চোখে তাকাল কাসেমের দিকে।

কাসেম খেঁকিয়ে বলল, শালারা দোজাখের ভূত। নে, যা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকের ঝাঁকা থেকে একটা ব্লাডার তুলে খেয়ে নে।

কিন্তু ওরা একটা বিশেষ ঝাঁকার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বলল, এ ঝাঁকার বল তুলব চাচা?

—কেন, ওতে কী?

ভোলা বলল, এটা বোধহয় দুগ্‌গার হাতের রস।

কেষ্ট বলল, মানে, মনটা বলছে আর কি।

কাসেম বলল, ওঃ, দুগ্‌গার হাতের রস না হলে ভাল লাগে না বুঝি? খচ্চরের জান্থু। মরবি ওই ক'রে। নে, খেয়ে নে, খা।

কাসেমের মুখের ওপরে রুক্ষতা থাকলে, ভিতরে একটা নরম দিক আছে ভোলা কেষ্টর জন্য। হুকুম পাওয়া মাত্র ভোলা একটা ব্লাডারের মুখ খুলে চুমুক দিল। তার শেষ না হতেই কেষ্ট টেনে নিয়ে চুমুক দিল। পরস্পর টানাটানি ক'রে, যেন অমৃত পান করতে লাগল।

ব্লাডার চুপসে আসবার আগেই কাসেম ধমকে বলল, রাখ্‌ এবার রেখে দে। খালি ব্লাডার ফেটে পরডিউস হবে নাকি?

ব্লাডার রেখে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এল দুজনেই। পেছন ফিরে তাকাল আর একবার। তারপর দরজার বাইরে গেল। কিন্তু তাদের চেহারা ও চাউনি বদলে গেছে কয়েক মিনিটের

মধ্যেই। তারা টলে না, যেন নিশ্বাসও নেয় না। পাথরের মূর্তির মত স্থির।

কাসেম দরজা বন্ধ ক'রে ফিরে তাকাল ওদের দিকে। কোমরে হাত রেখে বলল, তারপর?

কেষ্ট বলল মোটা নির্ভীক গলায়, তা'পরে আর কিছু নয় চাচা। এই দুগ্‌গার জন্যে এখনো আছি?

—কোথায়?

ভোলা বলল, এ লাইনে।

কেষ্ট বলল, হ্যাঁ। দুগ্‌গাকে ধরবার জন্যে।

এখন ওদের গলা মোটা কিন্তু স্পষ্ট। ভোলা বলল, হ্যাঁ, ওকে একদিন ধরব, তা'পরে চলে যাব অন্য দেশে।

কাসেম যে একজন বাঘা আবগারি জমাদার, সেটা বোধহয় এ সময়েই ভোলে। যেন খুব অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে। একদিন ধরলেই হবে? ব্যস্?

কেষ্ট বলল, হ্যাঁ, একদিন।

কাসেম বলল, কী ধরবি? মদ ধরবি না ওকে ধরবি, কোনটা?

ভোলা বলল, ওই যা বল, ওকেই ধরব আসলে।

কাসেম বলল, হুঁ। সকলেরই নজর দেখছি ওই ছুঁড়ির দিকে। তা' তোরা এ্যাদ্দিনেও পারলি নে। এবার—

কেষ্ট ব'লে উঠল, ছোটবাবু চেষ্টা পাচ্ছেন চাচা।

ভোলা বলল, দেবীর পা'য়ে কত গণ্ডা মুণ্ডু বলি যায়। আর একখান বাড়ল।

কাসেমের যেন কেমন অস্বস্তি হয়। তীব্র চোলাই মদের গন্ধ, আর খালি গা, সদ্য মদ খাওয়া এই দুটি মূর্তি। দু'পাশে ঘর এই গলি বারান্দাটা যেন নরকের সুড়ং। সে বলে উঠল, নে, নে, মালগুলোন হাতে হাতে নিয়ে চল্।

কিন্তু যতটা সহজ ভেবেছিল বলাই, তা' হ'ল না। প্রথম কিছুদিন মনে হ'ল, এ দেশে বে-আইনী চোলাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কুমোরের মাটির হাঁড়ির বোঝা, তরকারির ঝাঁকা, মাছের চুপড়ি, বিচুলির গাড়িগুলি তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেও অবাক হ'তে হয়। মনে হয়, এ দেশে কোনোদিন বেআইনী চোলাই বোধহয় ছিলই না। যাও বা দু'টি চারটে ধরা পড়ল, সবই অন্য লোকের। চিরঞ্জীবের দলের কেউ নয়। হ'লে চিরঞ্জীব জামীন দিতে আসত। সে হিসেবে চিরঞ্জীব আদর্শ দলপতি।

কিন্তু সীক্রেট রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। বিশেষ ক'রে চিরঞ্জীবের বিষয়েই খবর পাওয়া গিয়েছে, তার লোকেরা এদিক ওদিক থেকে প্রায় পনর মণ গুড়, দশ বারো মণ কয়লা কিনেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে কম করে, বিশ বার (bar) পাকিস্থানি ছাপ মারা নিশাদলগুলিকে বহন করতে দেখেছে কৃষক সমিতির লোকেরা। সংবাদ তারাই দিয়েছে। অথচ কোথায় জাওয়া বসছে, কোন পথে স্মাগল হচ্ছে, কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে অখিলবাবু থেকে শুরু করে, এখানকার গোটা আবগারি বিভাগ চিরঞ্জীবের দলের ওপর চোখ রাখছে। বিশেষ অখিলবাবু আর ইনফর্মার ভোলা কেষ্ট তো অধিকাংশ সময় বাগ্‌দিপাড়াতেই আছে, যদিও, অখিলবাবুর ভাব সাব কেমন যেন ভাল লাগছে না বলাইয়ের। দুর্গার উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবার দাবী করছেন ভদ্রলোক। দুর্গার কাছে চা' খেতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। আশ্চর্য! তবু ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে চুপ ক'রে আছে বলাই।

কিন্তু ক্রমেই তার বুকের মধ্যে একটা অসহায় জ্বালা বাড়ছে। এ কি শুধুই ভেল্‌কি? না কি বলাইরাই অপদার্থ। এর আগে, ভিন্ন হাতে হ'লেও, চিরঞ্জীবের মাল ধরা পড়ছিল। কোথায় গেল তারা। কেমন ক'রে অদৃশ্য হল?

কেবল কয়েকটি ব্যাপারে, একটি নতুন আশার আলো দেখতে

পেয়েছে বলাই। সনাতন ঘোষকে জব্দ করেছে চিরঞ্জীব। সে নিজে, সনাতনের বসানো জাওয়া খুঁজে খুঁজে বার করেছে। নিজের হাতে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে, খুঁচিয়ে সেই জাওয়া ভেঙেছে। সনাতন দলবল নিয়ে মারামারি করতে গিয়েও থম্‌কে গিয়েছে। হাত তুলতে সাহস করেনি। চিরঞ্জীব পরিস্কার নাকি জানিয়েছে, প্রাণের মায়া না থাকে তো গায়ে হাত তুলবে। কিন্তু প্রতিশোধ নেবই। আমার জাওয়া যারা আবগারিকে ধরিয়ে দিতে পারে, তাদের জাওয়া আমিনিজের হাতেই ভাঙব। পুলিসের কাছে গিয়ে টিকটিকির মত বলে আসতে পারব না।

সেই ভাঙা জাওয়া বিনয় আর কাসেম গিয়ে দেখে এসেছে। শুধু তাই নয়। যে উড়ানখোলার জঙ্গলে চিরঞ্জীবের জাওয়া ধরা পড়েছিল, সেখানেই ইয়াসিনের একটি জাওয়া নিজের হাতে ভেঙেছে চিরঞ্জীব। ইয়াসিনকে লোকে জানে কৃষকসমিতির লোক ব'লে।

ইয়াসিন বলেছিল চিরঞ্জীবকে, তুই কি আবগারির লোক, যে নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছিস ?

চিরঞ্জীব জবাব দিয়েছে, না, আইনের লোকেরা তোমাদেরই হাতে। তোমরা সেখানে গিয়ে কল কাটি নেড়ে আস। এটা আমার আইন। তোমার একটা জাওয়া ভাঙলুম, আর একটা ভাঙব। তোমার বাড়িতে বসালেও ভাঙব। আর সনাতন ঘোষেরও আর একটা ভাঙব। তোমরা আমার দুটো জাওয়া ধরিয়ে দিয়েছ। তোমাদের চারটে যাবে। পথে ইয়ে করবে আবার চোখ রাঙাবে, তত মগের মুলুক পাওনি। এবার ডেকে নিয়ে এস শ্রীধর বাবুকে যদি সাহস থাকে। আর এ বৃত্তান্ত পোস্টারে লিখে, সেঁটে দিয়ে এস হাটে। না হয় বল তো আমিই দেব।

শ্রীধরের নাম শুনেই বোধহয়, ইয়াসিন কেমন যেন চুপসে গিয়েছে। পোস্টারের কথায় আরো। জোর গলায় সে কথা বলতে পারেনি।

বলাই বুঝতে পারল, চোলাই মদের ব্যাপারটা এতদিন রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে আসেনি। কিন্তু শ্রীধরদাসের এক বক্তৃতায়, ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গিয়েছে। যে-সনাতন আর ইয়াসিন দলের ব্যাপারে পরস্পরের অনেক দূরে, প্রায় মুখ দেখাদেখি নেই, তাদেরই শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একজন। ইয়াসিন যদি কৃষকসমিতির প্রতি বাধ্য থাকে, তবে তাকে এসব বিষয় থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। সনাতনের সঙ্গে লড়তে হবে চিরঞ্জীবকে। কারণ একবার যখন সনাতন ঘা খেয়েছে, সে শোধ নেবে। শাসনের ওপর মহলে তার গতিবিধি আছে। হয় সে চিরঞ্জীবকে কোনো অপরাধে জড়িয়ে চালান করবে। অন্যথায় সনাতনকেই আর দশজনের সামনে বার বার অপমানিত হ'য়ে চোলাইয়ের পথ ছাড়তে হবে।

এই দুটিই চায় বলাই। কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা তুলতে চায় সে। আর এটাই ঘটবে ব'লে মনে হয়। কারণ, ইয়াসিন খুব সম্ভবত সরবে। শ্রীধরবাবুর নির্বাচনী প্রচারে সে ইতিমধ্যেই নেমেছে। তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন। কৃষক সমিতি কোনো কালেই চোলাইয়ের ব্যাপারটাকে এত বড় ক'রে তোলেনি। তোলবার কথাও নয়। চিরঞ্জীবকে ঘায়েল করতে গিয়ে, শুধু এ অঞ্চলেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ঠিক হয়েছে। ভুমিহীন দরিদ্র কৃষকরা যদি সরে দাঁড়ায়, দারিদ্র্যের সুযোগে যদি তাদের টেনে না আনা যায়, তা' হ'লে বে-আইনি চোলাই বন্ধ হতে বাধ্য। শ্রীধরদাস নিজে যাদের জন্য বারে বারে জামীন দিতে আসেন, তাদের তিনি সরিয়ে নিতেই চাইবেন নিশ্চয়।

কিন্তু আপাতত চিরঞ্জীব। যে রাত্রের ঘুম কেড়েছে, সমস্ত শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে বলাইয়ের। মামলা তুচ্ছ, কিন্তু চিরঞ্জীবকে ধরাই যাচ্ছে না। যেন বুকের ওপর বসে আছে বলাইয়ের। যখনই সে চিন্তা করে, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে চিরঞ্জীবের মুখ। ঠোঁটের কোণে বাঁকা বিদ্রূপ হাসি। প্রতিমুহূর্তে উপহাস করছে বলাইকে।

পেয়েছে বলাই। সনাতন ঘোষকে জব্দ করেছে চিরঞ্জীব। সে নিজে, সনাতনের বসানো জাওয়া খুঁজে খুঁজে বার করেছে। নিজের হাতে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে, খুঁচিয়ে সেই জাওয়া ভেঙেছে। সনাতন দলবল নিয়ে মারামারি করতে গিয়েও থম্‌কে গিয়েছে। হাত তুলতে সাহস করেনি। চিরঞ্জীব পরিস্কার নাকি জানিয়েছে, প্রাণের মায়া না থাকে তো গায়ে হাত তুলবে। কিন্তু প্রতিশোধ নেবই। আমার জাওয়া যারা আবগারিকে ধরিয়ে দিতে পারে, তাদের জাওয়া আমিনিজের হাতেই ভাঙব। পুলিসের কাছে গিয়ে টিকটিকির মত বলে আসতে পারব না।

সেই ভাঙা জাওয়া বিনয় আর কাসেম গিয়ে দেখে এসেছে। শুধু তাই নয়। যে উড়ানখোলার জঙ্গলে চিরঞ্জীবের জাওয়া ধরা পড়েছিল, সেখানেই ইয়াসিনের একটি জাওয়া নিজের হাতে ভেঙেছে চিরঞ্জীব। ইয়াসিনকে লোকে জানে কৃষকসমিতির লোক ব'লে।

ইয়াসিন বলেছিল চিরঞ্জীবকে, তুই কি আবগারির লোক, যে নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছিস ?

চিরঞ্জীব জবাব দিয়েছে, না, আইনের লোকেরা তোমাদেরই হাতে। তোমরা সেখানে গিয়ে কল কাটি নেড়ে আস। এটা আমার আইন। তোমার একটা জাওয়া ভাঙলুম, আর একটা ভাঙব। তোমার বাড়িতে বসালেও ভাঙব। আর সনাতন ঘোষেরও আর একটা ভাঙব। তোমরা আমার দুটো জাওয়া ধরিয়ে দিয়েছ। তোমাদের চারটে যাবে। পথে ইয়ে করবে আবার চোখ রাঙাবে, তত মগের মুলুক পাওনি। এবার ডেকে নিয়ে এস শ্রীধর বাবুকে যদি সাহস থাকে। আর এ বৃত্তান্ত পোস্টারে লিখে, সেঁটে দিয়ে এস হাটে। না হয় বল তো আমিই দেব।

শ্রীধরের নাম শুনেই বোধহয়, ইয়াসিন কেমন যেন চুপসে গিয়েছে। পোস্টারের কথায় আরো। জোর গলায় সে কথা বলতে পারেনি।

বলাই বুঝতে পারল, চোলাই মদের ব্যাপারটা এতদিন রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে আসেনি। কিন্তু শ্রীধরদাসের এক বক্তৃতায়, ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গিয়েছে। যে-সনাতন আর ইয়াসিন দলের ব্যাপারে পরস্পরের অনেক দূরে, প্রায় মুখ দেখাদেখি নেই, তাদেরই শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একজন। ইয়াসিন যদি কৃষকসমিতির প্রতি বাধ্য থাকে, তবে তাকে এসব বিষয় থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। সনাতনের সঙ্গে লড়তে হবে চিরঞ্জীবকে। কারণ একবার যখন সনাতন ঘা খেয়েছে, সে শোধ নেবে। শাসনের ওপর মহলে তার গতিবিধি আছে। হয় সে চিরঞ্জীবকে কোনো অপরাধে জড়িয়ে চালান করবে। অন্যথায় সনাতনকেই আর দশজনের সামনে বার বার অপমানিত হ'য়ে চোলাইয়ের পথ ছাড়তে হবে।

এই দুটিই চায় বলাই। কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা তুলতে চায় সে। আর এটাই ঘটবে ব'লে মনে হয়। কারণ, ইয়াসিন খুব সম্ভবত সরবে। শ্রীধরবাবুর নির্বাচনী প্রচারে সে ইতিমধ্যেই নেমেছে। তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন। কৃষক সমিতি কোনো কালেই চোলাইয়ের ব্যাপারটাকে এত বড় ক'রে তোলেনি। তোলবার কথাও নয়। চিরঞ্জীবকে ঘায়েল করতে গিয়ে, শুধু এ অঞ্চলেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ঠিক হয়েছে। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকরা যদি সরে দাঁড়ায়, দারিদ্রের সুযোগে যদি তাদের টেনে না আনা যায়, তা' হ'লে বে-আইনি চোলাই বন্ধ হতে বাধ্য। শ্রীধরদাস নিজে যাদের জন্য বারে বারে জামীন দিতে আসেন, তাদের তিনি সরিয়ে নিতেই চাইবেন নিশ্চয়।

কিন্তু আপাতত চিরঞ্জীব। যে রাত্রের ঘুম কেড়েছে, সমস্ত শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে বলাইয়ের। মামলা তুচ্ছ, কিন্তু চিরঞ্জীবকে ধরাই যাচ্ছে না। যেন বুকের ওপর বসে আছে বলাইয়ের। যখনই সে চিন্তা করে, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে চিরঞ্জীবের মুখ। ঠোঁটের কোণে বাঁকা বিদ্রূপ হাসি। প্রতিমুহূর্তে উপহাস করছে বলাইকে।

চিরঞ্জীব যেন হাসতে হাসতে আগুন উস্‌কে দিচ্ছে বুকের। শুধু আবগারীর লোক নয়। নিশ্চয় সনাতন ইয়াসিনদের চোখকেও ফাঁকি দিচ্ছে সে। নইলে, তারা ব'লে দিত।

ঠাট্টা করে শুধু মলিনা। হেসে ব'লে, তুমি যে বাইরের ঝড় ঘরে টেনে আনলে? নাওয়া খাওয়া অনিয়মিত, আমার সঙ্গেও কথা বলার অবসর পাও না। এক আসামীকে ধরাতেই এত ব্যাপার?

বলাই বলে, এক আসামী মলিনা, এ গোটা অঞ্চল থেকে বেআইনি চোলাই হয় তো তুলে দিয়ে যাব আমি।

মলিনা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। বলে, তুমি নিজে বিশ্বাস কর এ কথা?

এত তীব্র অবিশ্বাসের সামনে বলাই যেন কেমন থমকে যায়। তখন মনে হয়, বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছা করে। কিন্তু পারে না। মনে হলেই, অক্ষম রাগে সে আরো জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় করি।

মলিনার হাসির শব্দটা থেমে আসে। সে বুঝতে পারে বলাই রেগে উঠেছে। তারপর সে গম্ভীর হ'য়ে বলে, গোটা অঞ্চল থেকে তোলা যাবে কি না জানি নে। কিন্তু আমার ইচ্ছে ক'রে, ওদের দুজনকে গিয়ে আমি কিছু বলে আসি।

অর্থাৎ চিরঞ্জীব আর দুর্গাকে। অপরাধ বিজ্ঞান সম্পর্কে এমনি ধারণা মলিনার। রক্ত খাওয়া বাঘকে মিষ্টি কথায় পোষ মানানোর মত। সেই এক পুরনো পচা ভালোবাসার বুলি। মলিনার মতে সেটা সংসারের সবকিছুর সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। তখন বলাই বলে, তোমার এই সাহায্যটুকু আমার বাকী আছে।

বলে সে সরে যায়। জানে, মলিনা আঘাত পায়। তবু একটি নিটোল ভালবাসার কল্পনায় বিভোর হ'য়ে থাকে। মানুষের কি এমনি হয়? কোথাও বড় রকমের একটি অভাব থাকলেই, মনে মনে সে একটি কল্পনার জগৎ তৈরী করে শান্তি পেতে চায়?

কিন্তু বলাইয়ের মন শান্ত হয় না। বুকে তার দাহ। সর্বশক্তি

দিয়ে একটা আঘাত হানবার জন্য ফুঁসতে থাকে। আঘাতের জায়গাটা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ অল্প কয়েক বছরের চাকরিতে, অনেকগুলি রিয়োয়ার্ড সে পেয়েছে। শুধু শিলিগুড়িতে নয়। এখানেও। কিছুদিন আগেও, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সে একটি প্রাইভেট ডজ-গাড়ি আটকেছিল। রীতিমত উর্দিপরা ড্রাইভার। যাত্রীটি পোশাকে পুরোপুরি সাহেব। পরে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, বিহারের অধিবাসী, ব্যবসায়ী কলকাতার সাধারণত, দ্বারভাঙার উত্তর সীমান্ত নেপালের জয়নগর অঞ্চল থেকে গাড়িটা গাঁজা বহন ক'রে থাকে। এটা বলাইয়ের ধারণা। কিন্তু ডজের এই নতুন মডেলের বিরাট ঝকঝকে গাড়িটাকে সন্দেহ করা কঠিন। চ্যালেঞ্জ করতে সাহস না হবারই কথা। করবার আগে একশ'বার ভেবেও সংশয় থেকে যায়। কিন্তু বলাই সাহস করেছিল। কারণ, গাড়িটাকে মাস কয়েক আগে, রাত্রি আটটার সময় মহকুমা শহরের বেশ্যাপল্লীতে একদিন দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছিল। এত বড় গাড়ি মফঃস্বলের বেশ্যাপল্লীতে কেন? ও গাড়ির মালিক নিশ্চয় ওরকম জায়গায় প্রমোদ করতে আসবে না। একমাত্র মালিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে ড্রাইভারের পক্ষেই তা সম্ভব। কিন্তু ড্রাইভার বসেছিল নিজের জায়গায়। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে, পাড়ার চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে, মহকুমা শহরের আবগারির একজন ইনফর্মারকে সে পাঠিয়েছিল খোঁজ নেবার জন্য। খবর পেয়েছিল, একটি নতুন অবাঙালী মেয়ে ও-পাড়ায় উঠেছে। লোকটি তার ঘরেই উঠেছে। এবং ও-পাড়ায় লোকটি একেবারে অচেনা নয়। তবে আবগারির কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু লোকটাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই, এটা বুঝেছিল বলাই।

তারপরেও দু' একবার গাড়িটাকে চোখে পড়েছে। সেই ছোট্ট ত্রিকোণ পার্কের, ডেনিস স্মৃতিফলকের কাছে, পুরনো কামানের মুখোমুখী একদিন বেলা তিনটের সময় দেখেছিল।

যেদিন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সে চ্যালেঞ্জ করেছিল, সেইদিন মাত্র একটি ব্যাপারই সাহস যুগিয়েছিল তার। প্রথমে দূর থেকে সে লক্ষ্য করেছিল, পিছনের সীটে বসে লোকটি গাড়ির বাইরে মুখ বাড়িয়ে সামনে কিছু নিরীক্ষণ করছে। বলাইকে দেখা মাত্র মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। ড্রাইভার গাড়ির স্পীড দিয়েছিল বাড়িয়ে। মুহূর্তে একটা ঝোঁক চেপে বসেছিল বলাইয়ের মনে। দাঁড় করিয়েছিল সে গাড়িটাকে।

যাত্রীটি চোখ পাকিয়ে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করেছিল, এসবের মানে কী?

বলাই বলেছিল, আপনাকে আমি জানি। গাড়িটা আমি সার্চ করব।

লোকটি শুধু তার বিমূঢ় বিস্ময় চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে জানেন?

বলাই বুঝেছিল, লোকটা দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। তার সঙ্গে ছিল জমাদার বিনয় আর একজন সেপাই। সার্চ করবার অনুমতি দিয়ে সে বলেছিল, এখুনি বলব আপনাকে কবে থেকে জানি।

ড্রাইভার বলেছিল, পিছে বহোত্ গাড়ি জাম্ হো রহে, জেরা সাইড্ করনে দিজীয়ে।

বলাই আর গাড়িটাকে স্টার্ট নিতে দেয়নি। বলেছিল, গাড়ি জাম হোক্, সাইড্ করবার দরকার নেই।

বলাই সন্দেহ করেছিল, গাঁজা অথবা আফিম। না থাকলেও, তার ভয় ছিল না। লোকটা ভাল নয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ধরা পড়েছিল বাইশ বোতল মদ। একলা বলাই দেড় হাজার টাকা রিয়োয়ার্ড পেয়েছিল সরকার থেকে। বিনয় এবং সেপাইটিও বাদ যায়নি।

কিন্তু কোথায় গেল চিরঞ্জীবের দল? তারা যে থেমে নেই, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। ভোলা আর কেষ্টর ধারণা, কবিরাজের মেয়েরা চোলাই মদ চালান দিচ্ছে। ভাবতেও সঙ্কোচ হয়। বিশ্বাস

করা আরো কঠিন। যদিও ভোলা কেষ্টর যুক্তি আছে। ও-বাড়ির মেয়েরা বাইরে বড় একটা বেরুত না। আজকাল প্রায়ই এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। এবং কবিরাজের বাড়িতে দুর্গাকে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে অনেকবার। সেখানে যে চোলাই হয়, সে সংবাদও পাওয়া গিয়েছে। তবু বলাই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দিতে পারেনি। অন্তত মেয়েদের ব্যাপারে পুরোপুরি স্থির নিশ্চয় না হ'য়ে, কিছুতেই তা সম্ভব নয়। কারণ, বলাইয়ের একটি সুনিশ্চিত সংস্কার আছে। আর যাই হোক, কবিরাজ মশায়ের মেয়েদের সে দুর্গা পর্যায়ে ফেলতে পারে না।

তবু দুর্গারই হাসি যেন শুনতে পায় বলাই মলিনার হাসির মধ্যে। তারই ঘরে, তারই পাশে মাঝে মাঝে যেন দুর্গারই ছায়া ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে মন নিয়ে এতখানি গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়া নিজেরই ভাল লাগে না বলাইয়ের। কিন্তু উপায় নেই। চিরঞ্জীব আর দুর্গা তার প্রত্যহের নিয়মিত কাজ ও শান্তি ছিনিয়েছে।

এ অবস্থায় একদিন সে অফিসের কাছেই গুলিকে দেখতে পেল। তার ভিতরের জ্বলুনি মুহূর্তে যেন একটি নিষ্ঠুর বিদ্যুৎ কশা হানল। কাসেমকে হুকুম করল সে গুলিকে ডাকতে। না এলে জোর ক'রে ধরে নিয়ে আসতে।

এ বিষয়ে কাসেম হুকুমের আগে ছুটতে জানে। গুলিকে ধরে নিয়ে এল সে; বলাই টের পেল, গুলি ভয় পেয়েছে। অবাকও হয়েছে। সে মনে মনে ভাবল, ধৈর্য ধরে ভদ্র ব্যবহার করবে সে গুলির সঙ্গে।

গুলি কাসেমের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বলল, আমি কী করেছি যে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন?

বলাই বলল, কিছুই করনি?

গুলি বলল, না, কিছু করিনি।

বলাই এক মুহূর্ত গুলির চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, গত

সপ্তাহের বুধবারে তুমি কতগুলি নিশাদলের বাট নিয়ে যাচ্ছিলে, মনে পড়ে?

গুলি জোর দিয়ে বলল, কে বললে? কই, না তো।

বলাই শান্ত গলায় বলল, যেই বলুক। মিছে ব'লো না। কিন্তু কোথায় নিয়ে গেছলে সেগুলি? খালি এইটুকু বললেই আমি ছেড়ে দেব।

গুলি বোধ হয় একটি চকিত মুহূর্তের জন্য থম্‌কে গিয়েছিল। তারপরে বলল, আমি কোনো নিশাদলের কথা জানি না।

কথা শেষ হবার আগেই বলাই টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে গর্জন ক'রে উঠল, আল্‌বৎ জানিস্‌, তাড়াতাড়ি বল্‌।

বলতে বলতে সে উঠে এল চেয়ার থেকে। অবিশ্বাস্য হ'লেও, বলাইয়ের দু' চোখে রক্ত উঠে এসেছে। কঠিন নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে তার মুখ।

গুলি মাথা নামিয়ে বলল, আমি জানি না।

ঠাস্‌ করে তার গালে একটা চড় দিল বলাই। চাপা ক্রুদ্ধ গলায় হিসিয়ে উঠল, জানি না! জানাচ্ছি।

ধৈর্য রাখতে পারল না বলাই। ইঁদুর লুফে নেওয়া বেরালের মত জামার কলার ধ'রে গুলিকে টেনে নিল সে। কষে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কোথা থেকে এসেছিল সেই নিশাদল, আর কোথায় নিয়ে গেছিলি, বল্‌।

নাড়া খেয়ে গুলির আল্‌বাট বিস্রস্ত। সে বলাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে, মাথার চুলটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

বলাই আবার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, চুল পরে ফেরানো যাবে। আগে বল্‌।

গুলি আর একবার তাকাল বলাইয়ের দিকে। ততক্ষণে তার চাউনি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। অসহায় বিদ্বেষ তার চোখে। সে আবার বলল, আমি জানি না।

বলাই রুদ্রমূর্তি ধ'রে, সজোরে আঘাত করল আবার গুলিকে। মুখে পিঠে আঘাত ক'রে, চুল টেনে সে ঘরের একটা কোণে নিয়ে ফেলল গুলিকে। গুলি একটা আর্তনাদ ক'রে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

বলাই চাপা গলায় গর্জে উঠল, রাস্‌কেল, এখনো জানি না। এর মধ্যেই খুব বড় দরের স্মাগলার হ'য়ে গেছ, না? মনে করেছ, কিছু জানি না? সংবাদ রাখি না? ভেবেছিস্ চিরঞ্জীব বাঁড়ুজ্জে আর ওই বাগ্‌দি ছুঁড়ি তোকে রক্ষা করবে?

ইতিমধ্যে কাসেম ছাড়াও কয়েকজন সেপাই এসে পড়েছিল ব্যাপার দেখতে। কাসেমের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, স্বীকারোক্তি আদায়ের এই প্রহারটা সে নিজের হাতে চাইছিল।

বলাই সবুট লাথি তুলে বলল, কোথায় নিয়ে গেছিলি সেই নিশাদল?

গুলির ঠোঁটের কষে রক্ত। গালে আঙুলের ছাপ ফুলে ফুলে উঠেছে। সে অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আমি জানি না।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে গুলির কোমরে লাথি মারল। চুলের মুঠি ধরে আবার তুলে ধরল। বলল, কৃষক সমিতির নেতার কাছে শিক্ষা পেয়েছিস বুঝি? লোচ্চা! বল্ শীগ্‌গির।

গুলির সর্বাঙ্গ তখন বেঁকে পড়েছে। হাত দিয়ে চেপে ধরেছে কোমর। সে কোনো কথা বলল না। এবং বলাই অনুভব করল, তার সমস্ত উত্তেজনার জোয়ারে একটা শৈথিল্যের ভাঁটা আসছে যেন।

কাসেম বলল, মরে যাবি। ব'লে ফ্যাল্।

গুলি নীরব। বলাই আবার একটা ঝাঁকুনি দিল গুলিকে। —বল্। মুখ তোল্।

ব'লে চিবুক তুলে ধরল গুলির। ঠোঁটের কষ থেকে বেয়ে-পড়া রক্ত লেগে গেল বলাইয়ের আঙুলে। তার উত্তেজনা আরো হ্রাস পেল।

গুলি নিশ্চুপ।

বলাই তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল। বলল, দাঁড়া, কেমন ক'রে স্বীকার করাতে হয়, দেখাচ্ছি। কাসেম, বেত।

কাসেম ছুটল বেত আনতে। দেয়ালে ঝোলানো থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো রাইফেল ক'টার ঠিক নীচেই, গুলি হেলে দাঁড়াল। তার মুখ গিয়েছে ফুলে। চোখে দু' ফোঁটা জল। হাত দিয়ে সে রক্ত মুছে নিল কষ থেকে।

কিন্তু বলাই বেরিয়ে গেল। উঠোনের মাঝখানেই কাসেমকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এদিকে এস।

কাসেম বেত নিয়ে বলাইয়ের সঙ্গে বলাইয়ের নিজস্ব অফিস ঘরে গেল। চেয়ারে ব'সে বলল বলাই, আর মার নয়! কী করবে? ওকে ধরে রাখবে না ছেড়ে দেবে?

কাসেম বলল, একটা কেস্ না ঝুলিয়ে দিলে কী করে হয় স্যার? নইলে চিরঞ্জীব পাল্টা নালিশ করতে পারে।

বলাই ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত ভাবল। বলল, না, সেটা তো মিথ্যে কেস্ সাজাতে হবে। আমরা তো ওকে বামাল ধরিনি। খানিকক্ষণ আমাদের গারদে আটকে রাখ। জলটল খেতে চাইলে দিও। ছেড়ে দিও ঘণ্টা দুয়েক বাদে। অবশ্য আর একবার জিজ্ঞেস-বাদ করো। মেরো না যেন। আর চিরঞ্জীব যদি খেপে যায় ভালই হয়। ও আমার এগেন্স্টে একটা কেস্ করুক, আমি তাই চাই।

কাসেম যেন থম্‌কে গেল। বলল, ছেড়ে দেবেন?

—হ্যাঁ।

কাসেম ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা। তবে চিরঞ্জীবের ব্যাপার তো। বদলা নিতে ছাড়বে না। আমাদের একটু সাবধানে ঘোরাফেরা করতে হবে।

বলাই বলল, তা হোক। চিরঞ্জীবকে যদি ফৌজদারীতেও

আটকানো যায়, তাও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। ও শোধ নেবে। এটাই আমি চাই।

কাসেম ভক্তিভরা বিস্ময়ে তাকাল বলাইয়ের দিকে। মনে মনে তারিফ করল সে। বুঝল, কেন গুলিকে মেরেছেন বড়বাবু। শুধু চিরঞ্জীবদের রাগিয়ে খেপিয়ে তোলার জন্য।

কাসেম বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলাই উঠে দাঁড়াল। ঢাকা-দেওয়া জলের গেলাসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেলল। যদিও গুলির রক্তের দাগটা সে আগেই গুলির জামাতেই মুছে ফেলেছিল, তবু বারে বারে ঘষে ঘষে আঙুলটা ধুয়ে ফেলল সে। কিন্তু বসতে পারল না। তার ঘরের উত্তর দিকে বেশ খানিকটা খোলা জমি। অখিলবাবু সেখানে বাগান করেছেন। তারপরেই পুকুর। আশে-পাশের অনেক মেয়ে এবং পুরুষেরা সেখানে স্নান করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে। তাদের মধ্যে বড় মেয়ে পুরুষও দু' একজন আছে। হাসি, উৎফুল্ল কলরব, বড়দের বক্‌বকানিতে ঘাট ও পুকুর মুখরিত। বাতাসে গাছপালা দুলছে। মাঝ পুকুরে, একটি আল্‌তা-পরা পায়ের ঘা'য়ে জল চল্‌কে উঠল রূপোলী ছটায়। একটি বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে ঘাট থেকে চীৎকার ক'রে বলল, দিদি, ডুব-সাঁতারে যাব তোর কাছে।

মেয়েটি মুখ থেকে জল ছুঁড়ে দিল। কোথায় যেন একটা কাঁটা টাঁটাতে লাগল বলাইয়ের বুকে। তার মনে হ'ল, জানালার বাইরে একটি স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবন ছলছলাচ্ছে। পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল গুলির রেকর্ডটা। গুলি কে, কী তার অতীত জীবন। বোধ হয় সব চিন্তাটা দেড় মিনিটের। জানালার গরাদ ধরে বলাই মনে মনে বলে উঠল, আমি কী? একজন একসাইজ্‌ ইনস্পেক্টর ছাড়া কিছু তো নয়। এর'চেয়েও বেশী মারধোর করতে-দেখেছি অনেককে। আমি নিশ্চয় তাই করব। আমি জানি, আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেবল সনাতন ঘোষকে ধরতে পারব না। তার পরিবর্তে···। কিন্তু

মলিনা ··· কিন্তু দুর্গার কথা আমার ভাবার কথা নয় ··· কিন্তু চিরঞ্জীবকে আমি শেষ ক'রে ছাড়ব ···।

কেমন একটা এলোমেলো অসহায় মন নিয়ে যেন বলাই প্রলাপ বকার মত ভাবতে লাগল। আরো জোরে সে গরাদ চেপে ধরল।

এমন সময় মলিনার গলা শোনা গেল, আসতে পারি বড়বাবু? দোতলার সিঁড়ি থেকে কয়েক ফুটের মধ্যেই বলাইয়ের অফিস ঘর। ইচ্ছে করেই সে এটি নির্বাচন করেছিল। যেন যখন খুশি মলিনা আসতে পারে।

বলাই যেন থতিয়ে গেল। দেখল, মলিনা হাসছে।

বলাই বলল, এস।

মলিনা ঢুকেই বলল, কী, কন্‌ফেস্‌ করল?

ভ্রূ কুঁচকে উঠল বলাইয়ের। কিন্তু গম্ভীর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কী ক'রে জানলে?

মলিনা তেমনি হেসেই বলল, দেখছিলাম, কাসেম ধরে নিয়ে আসছে ছেলেটাকে।

—ও! না পাওয়া গেলে বোধহয় খুশি হও। কিন্তু কিসের জন্য? তুমি কি চাও, অসামাজিক নোংরা লোকেরা সমাজে বুক ফুলিয়ে বাঁচবে?

মলিনা বলল, না, শাসন করতে হবে।

বলাই দৃঢ় গলায় বলল, শাসনের যখন কিছু বোঝ না, তখন এবিষয়ে কৌতূহল না-ই-বা রাখলে।

মলিনা চকিতে গম্ভীর হল। পরমুহূর্তেই আবার হাসল। বলল, আচ্ছা বলব না। আমি এ বিষয়ে শুধু তোমাদের সরকারী পদ্ধতির কথাই বলতে চাই।

বলাই বলল, সেটাও শাসনের অন্তর্গত বিষয়।

বলাই নিজেও বোধহয় অবাক হচ্ছিল তার নিজের রূঢ়তায়। এই

তো একটু আগেই, গুলিকে মেরে এসে, পুকুরের দিকে তাকিয়ে তার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল।

মলিনা বলল, আচ্ছা, আর বলব না। তুমি রাগ ক'রো না।

মলিনার গলার স্বর যেন রুদ্ধ শোনাল। বলাইয়ের মন আবার শান্ত হ'য়ে এল। সে অনুতপ্ত হ'য়ে চোখ তুলে কিছু বলবার আগেই মলিনা দরজার কাছে চলে গিয়েছে। বললে, অনেক দেরী হয়েছে, খেতে এস। তোমাকে ডাকতে এসেছিলাম।

মলিনা অদৃশ্য হল। বলাই কী বলতে গিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল। তার শুধু মনে হল, কেউ কাউকে বোঝে না।

গুলিকে দেখেই প্রথমে ধমকে উঠেছিল চিরঞ্জীব, 'কোথায় ছিলি সারাদিন?' যেদিন গুলি মার খেয়ে ফিরে এসেছিল। পরমুহূর্তেই তার চোখে পড়েছিল গুলির মুখটা। ফোলা ঠোঁট, যদিও তখন আর রক্ত ছিল না। কিন্তু গালে ছিল কালশিরা। হাঁটছিল একটু টেনে টেনে। গুলি কোন জবাব দিতে পারে নি। সংসারে গুলিদের মত দুর্বিনীত অসামাজিক ছেলেদের চোখেও জল লুকিয়ে থাকে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কোথাও গোপনে থম্‌কে থাকে কান্না। চিরঞ্জীবকে দেখা মাত্র তার চোখ ফেটে জল এসেছিল।

চিরঞ্জীবকে যা কোনোদিন দেখা যায়নি, ভাবাও যায়নি বোধহয়, তাই হয়েছিল। সে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল গুলিকে।

—কে মেরেছে? কে মেরেছে তোকে এমন ক'রে?

ফুঁসে উঠতে গিয়েও চিরঞ্জীবের বুকের মধ্যে অসহ্য ব্যথায় টনটনিয়ে উঠেছিল। তার গলার স্বর যেন টিপে ধরেছিল কেউ। কান্না বোধহয় তারও থম্‌কে ছিল কোথাও।

গুলি ফিসফিসিয়ে বলেছিল, বড়বাবু।

চিরঞ্জীব গর্জে উঠেছিল তারপরেই, বড়বাবু? বলাই সান্যাল? কেন?

—এমনি। কথা আদায়ের জন্যে।

আগুন জ্বলে উঠেছিল চিরঞ্জীবের চোখে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, বাঁশঝাড়ের ওপারেই, বটতলায় ভোলা কেষ্টর মূর্তি। তার মনে হয়েছিল, ঘণ্টা বেজে উঠেছে। যুদ্ধ ঘোষণার ঘণ্টা। চুপি চুপি অন্ধকারে, ছলচাতুরির খেলা শেষ হয়েছে। এবার খোলাখুলি, মাঠে ঘাটে শারীরিক আঘাত ক'রে, ওরা ডাক দিচ্ছে লড়তে। সেই ভাল। লড়াই হোক্। হয় চিরঞ্জীব থাকুক না হয় বলাই সান্যাল থাকুক।

বটতলার দিকে ছুটতে উদ্যত হ'য়ে সে চীৎকার ক'রে হাঁক দিয়েছিল, নন্দদা, লাঠি নিয়ে এস!

বিমলাপুরের সেই কুখ্যাত লাঠিবাজ ডাকাত হানিফ আর নন্দ। নন্দ সারাদিনই থাকত দুর্গার বাড়িতে। লোকে বলত, দুর্গার জন্য দারোয়ান রেখেছে চিরো বাঁড়ুজ্জে। মধ্যবয়সী, লোহার মত শক্ত পেটানো শরীর, ছোট ছোট পলকহীন সাপের মত চোখ ও ভাঙা চ্যাপটা নাক নন্দও হেঁকে উঠেছিল, চল।

ঘরের মধ্য থেকে তাড়াতাড়ি দুর্গা বেরিয়ে এসে আগে টেনে নিয়েছিল গুলিকে। হাত চেপে ধরেছিল চিরঞ্জীবের। উদ্বেগে ভেঙে পড়েনি সে। ব্যাকুল হ'য়ে বাধা দেয়নি। তার নিশিন্দা পাতার মত আয়ত চোখ দুই টুকরো অঙ্গারের মত জ্বলে উঠেছিল। স্থির দৃঢ় চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, না, যেও না ছোট্‌ঠাকুর। বলাইবাবু খ্যাপা কুকুর হয়েছে। তুমি খেপো না।

চিরঞ্জীব হিসিয়ে উঠেছিল, শোধ নেব না? ছেড়ে দেব?

দুর্গা বলেছিল, তুমি একলা শোধ নেবে? আমরা নেব না? ওই বড়বাবু আর ছোটবাবুরা হারছে বলেই তো হাতে মেরে শোধ নিতে চাইছে। ওদের আরো খেপতে দাও।

চিরঞ্জীব মাথা নেড়ে বলেছিল, তুই বুঝিস্‌নে দুর্গা। আজ ওরা গুলিকে মেরেছে। কাল গজেন সতীশকে মারবে। তারপর আমাকেও মারতে আসবে?

—তোমাকে মারবে?

ছুটে-যাওয়া হাউয়ের মত শিসিয়ে উঠেছিল দুর্গার গলা। বলেছিল, তত সাহস যদি কোনদিন ওদের হয়, সেদিন জানব ওদের মরার সাহসও আছে। কিন্তু এখন হাঙামা ক'র না ছোট্‌ঠাকুর। মাথা গরম ক'র না। চাদ্দিকের হাওয়াটা কেমন একবার ভেবে দেখ।

চারদিকের হাওয়ার কথাটা শুনে শান্ত হ'য়ে এসেছিল চিরঞ্জীব। শান্ত নয়। অসহায়, খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মত মাথা নত ক'রে নিতে হয়েছিল। গুলির দিকে সেদিন সে আর ভাল ক'রে তাকাতে পারেনি। নিজেকে যেন তার অপরাধী মনে হয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল, চারিদিক থেকে একটা লৌহ বেড়ি ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। ঘিরে ধরছে তাকে সদলে।

না, নিজের কাছে কোনো ন্যায়ের যুক্তি ছিল না চিরঞ্জীবের। সে জানত, সে আর তার দলের সবাই জোর ক'রে, বেআইনি ভাবে বেঁচে আছে এ সংসারে। বাঁচবার অধিকার তাদের কারুরই স্বীকৃত নয়। সমাজ তাদের অস্বীকার করেছে।

কিন্তু সে বিশ্বাস করে, এ সমাজের হাতে ন্যায় ব'লে কিছু নেই। এ দেশে আইন যাদের হাতে আছে, তারা সবাইকে গোলাম মনে করে। ন্যায় নিষ্ঠা সব মিথ্যা। ছলনা। বলার জন্য বলা। দেয়ালে দেয়ালে উপদেশ বাণী বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখার মত। শুধু গৃহের শোভা, মনুষ্যত্বের বিজ্ঞাপন! যার জোর আছে, যে অন্যায় করতে পারে, এ দেশে ও সমাজে তারাই বাঁচছে বুক ফুলিয়ে! এদের শাসন মানবে না চিরঞ্জীব। কারণ ন্যায় অন্যায়ের সংঘাত নেই কোথাও। শুধু স্বার্থের সংঘাত। এই সংঘাতকে বড় বড় বুলির ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছে তারা, যারা আইন দিয়ে অন্যায়ের অধিকার পেয়েছে।

ন্যায় বুঝি আছে শুধু শ্রীধরদাদের পক্ষে। তিলে তিলে মরণের ায়। অপমানের বোঝা বয়ে বয়ে, কোনো এক সুদূর ভবিষ্যতের

ন্যায়ের জন্য। হয়তো সে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত, কিন্তু অনিশ্চিত কালের অন্ধকারে। শুধুই বিশ্বাস ক'রে, পলে পলে মরা। সংবাদপত্রের শিরোনামায় একটি অপমানকর মৃত্যুসংবাদের নায়ক হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

সে দেখতে পাচ্ছিল, তাকে কেন্দ্র ক'রে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল সবাই। দুর্গার 'চারদিকের হাওয়া' সেই কথাই বলতে চেয়েছিল। চিরঞ্জীব দেখছিল, তার বিরুদ্ধে সকলে একত্র হয়েছে। তাকে সবাই মিলে মারতে চাইছে। এখানকার স্থানীয় মন্ত্রীর দলের লোক সনাতন ঘোষ। বিরুদ্ধ দল, কৃষক সমিতির লোক শ্রীধরদা! পুলিশ আর পুলিশের সুহৃদ অক্রুরেরা। এরা সবাই শুধু চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছে।

একটা তীব্র জ্বলন্ত হাসি ফুটে উঠেছিল চিরঞ্জীবের ঠোঁটে। এই ব্যূহ রচনাকারী শত্রুদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে আরো জ্বলে উঠছিল। যতই ওদের সাঁড়াশী ব্যূহ ছোট হ'তে হ'তে টুটি টিপে ধরছিল, ততই সে মরিয়া হ'য়ে উঠছিল।

সোলেমানকে চোলাই চিরদিনের জন্যই ছাড়তে হয়েছে। অন্তত শ্রীধরের কাছে ও সমিতির কাছে সেই রকমই কসম খেতে হয়েছে তাকে। অন্যথায় সমিতি থেকে বহিষ্কার। এমন কি সে নিজের খাবার জন্যও বাড়িতে চোলাই করতে পারবে না।

কিন্তু সোলেমান হয়তো ভবিষ্যতে কথা রাখবে না। সমিতি ছেড়ে চলে যাবে। কারণ সোলেমান বড়লোক কৃষক। শুধু এখন সে চোলাই বন্ধ রেখেছে। এক ঢিলে দুই পাখী মারবে সে। ইলেকশনের প্রচার শুরু হয়েছে। গ্রামে গ্রামে এখন নতুন জ্বর। উত্তাপ বাড়ছে প্রতিদিনই। এখন চোলাই না করাই ভাল। এ হল সোলেমানের ছদ্মবেশ। আসলে চিরঞ্জীবের দলকে ধরিয়ে দেবারই চক্রান্ত। তাই সরে দাঁড়িয়েছে।

চিরঞ্জীব জানে, এ অঞ্চলের প্রায় সবাই চোলাই বন্ধ রেখেছে।

এমন কি স্থানীয় মন্ত্রীর চোখের মণি সনাতন ঘোষও। উদ্দেশ্য একই। চিরঞ্জীবদের সকলের সামনে প্রকাশ করা। ধরিয়ে দেওয়া। অক্রুরও তাই।

ন্যায়দণ্ড সকলের হাতে। শুধু সেই ন্যায়দণ্ডের আঘাত চিরঞ্জীবেরই মাথায়। সে জানত, শুধু ভূমিহীন গরীব কৃষকেরাই শ্রীধরদার ন্যায়ে বিশ্বাস করে। অভাবের দায়ে চুপ ক'রে থাকতে পারে না সব সময়। নিজেরাও নেশা ক'রে ফেলে। দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে দেয় নিজেদের মধ্যে।

তারাই মানবে শ্রীধরদাকে। কারণ, তাদের অনুশোচনা আছে। ভাল ক'রে খেয়ে প'রে কিছু জমির স্বত্ব নিয়ে বাঁচবে এই স্বপ্ন চির-দিন ধ'রে দেখতে ভালবাসে। এদের উপর বিদ্বেষ আসে না। বুক জ্বলে তার, শ্রীধরদাস, সনাতন ঘোষ, আর পুলিসের ঐক্য দেখে। ন্যায়ের ঐক্য! কিন্তু সাহস নেই সোলেমান সনাতন অক্রুরদের, তার সঙ্গে লড়ে। সমাজের এইসব সজাগ চোরেরা বুক ফুলিয়ে বেড়াবে, হয়তো একদিন মন্ত্রী হবে, এ্যাসেম্বলীর প্রতিনিধি হবে। শুধু অসামাজিক থাকবে চিরঞ্জীব।

না, কোন শাসন মানবে না চিরঞ্জীব। কারুর শোধন মন্ত্র চায় না।

অনেক কথা ভেবেছিল সেদিন চিরঞ্জীব। তবু গুলির মারের শোধ নিতে পারেনি। তাকে চুপ ক'রে থাকতে হয়েছিল। যদিও তার সন্দেহ ছিল, ওরা চুপ ক'রে থাকবে না। যতই বুঝতে পারবে, তাদের দল ঠিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ ধরা যাচ্ছে না, ততই খেপে উঠতে থাকবে। শ্রীধরদার এক ডাকে হয়তো একদিন শত শত লোক তার, দুর্গার, সকলের ঘর বাড়ি-জ্বালিয়ে দেবে। সেইটিই বাকী। জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ দেখবে চিরঞ্জীব। কারণ মঙ্গল মন্ত্র কারুর হাতে নেই।

সে বুঝতে পারছিল, নির্বাচনে শ্রীধরদারই জয় সুনিশ্চিত। নির্বাচনের পর শ্রীধরদা নতুন ক'রে লাগবে তার পিছনে। সনাতনরাও

ছেড়ে কথা কইবে না। আসুক সেই দিন। সেই দিনটিরই প্রতীক্ষা। কারণ, বিশ্বাস করার এবং বিশ্বাস ক'রে পাবার কিছুই নেই এ সংসারে।

তবু একদিন মার খেল ভোলা। বাগ্‌দিপাড়ারই একজনের হাতে একদিন থাই থাপড় খেল সে। পাড়ায় দাঁড়িয়ে নাকি অকথা কুকথা বলছিল। নন্দ সামনে ছিল। কিন্তু না-রাম না-গঙ্গা কিছুই বলেনি। পরে বুঝেছিল চিরঞ্জীব, নন্দরই কারসাজি সেটা।

এর পর, কয়েকদিনের মধ্যে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে পায়ে পায়ে ঝোপ-ঝাড়ের গা থেকে। শেয়াল ডেকে উঠল ঘরের পিছনে। তবু মাতি মুচিনী বুড়ী আর তার ভাইঝি গানির ফিস্‌ফাস গজ্‌ গজ্‌ শেষ হয় না।

এতদিন গানি কাসেমের রক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন চোলাইয়ের সংবাদ তাকে দেয়নি। দিতে রাজী হয়নি। কাসেমের রক্ষিতা হ'তে পারে, তা' ব'লে গাঁয়ের ভিতরের কথা বলবে কেন? কিন্তু এবার সে রাজী হয়েছে। তাও নাকি একবারটির জন্যে। কেবল চিরো ঠাকুরকে কিংবা দুর্গাকে ধরিয়ে দিলেই হবে। গানিকে পয়সা দিয়েছে কাসেম মাতিকে দেবার জন্য। তার বিশ্বাস, মাতি ধরিয়ে দিতে পারে।

সেই নিয়েই গানির সঙ্গে কথা হচ্ছিল মাতির। অন্ধকার দেখে গানি বলল, পিসী আমি যাই, আঁধার হল। তুই বাতি দেখা তুলসীতলায়।

মাতি আঁচলে পয়সা বেঁধে এক গাল হাসল। দাঁত অনেকগুলি নেই। বুড়ীর মুখভরতি রেখা। রেখার ভাঁজে ভাঁজে হেসে বুড়ী তার সেই মান্ধাতা আমলের ভাঙা চিমনী হ্যারিকেনটা ধরাল। বাতির সামনে চিমনীর কালির অন্ধকার। পিছনে মাতির নিজের ছায়া। তবু একটি টিম্‌টিমে বাতির ইশারা।

বুড়ীর এক ছেলে আছে। বাড়িতে আসে না, থাকে না। শহরে কাজ করে, থাকে। পাশের ভিটেতেই আছে গানি। হয়তো সে এখন সেজেগুজে কাসেমের কাছে যাবে।

মাতির তুলসীগাছ মরে গিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু মাটির একটা ছোট ঢিপি আছে। চোখ বুজলে তুলসীগাছ একটি দেখতে পায় সে।

মাতি বাতি নিয়ে তুলসীতলায় এসেই থম্‌কে দাঁড়াল। থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে, প্রাণপণ জোরে সে চীৎকার ক'রে উঠতে গেল। পারল না। শুধু দেখল, সামনে একটি শাদা কঙ্কাল। মট্‌মট্ শব্দে তার হাতটা ক্রমেই মাতির দিকে উঠে আসছে। মাতি শুধু বলতে পারল, রাম রাম! রাম রাম! হে ভগবান!

তারপরেই মাটিতে প'ড়ে গেল।

এমন সময়ে গানি আবার এল বোধহয় কিছু বলতে। সে সামনে এই মূর্তি দেখেই, চীৎকার ক'রে ছুটে পালাল, অ' গো মা গো, সর্বনাশ গো!

তাড়াতাড়ি লোকজন এল ছুটে। বাতি এল কয়েকটা। এসে দেখল, মাতি তখন প্রায় নিথর। উদ্দীপ্ত চক্ষু। ঠোঁটের কষে ফেনা। হ্যারিকেনটা প'ড়ে আছে উপুড় হ'য়ে। কিন্তু আর কোথাও কিছু নেই।

যমুনা চীৎকার ক'রে ডাকল, অ বট্‌ঠাকুরঝি, বট্‌ঠাকুরঝি, কী হয়েছে? কী দেখেছ? কথা বল।

মাতির কথা বলার লক্ষণ দেখা গেল না। সর্বাঙ্গে থেকে থেকে একটা চকিত আক্ষেপের চমক। চোখের তারা স্থির। মুখ থেকে ওঠা গ্যাজলার সঙ্গে রঙের ছোপ দেখা দিল।

ই।তমধ্যে কয়েকজনকে একসঙ্গে জাপটে ধ'রে গানি এল। দু' চোখে তার মৃত্যু-ত্রাস। সেও কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। তুলসীতলার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বারে বারে বলল, অইখানে, অইখানে

গো, অইখানে দেখেছি তাকে আমি। হেই মা গো, জয় বাবা মহাদেব, জয় বাবা অযুধ্যেরাজ, আমাকে ক্ষমা কর গো। আমি আর কোনো পাপ করব না গো।

কয়েকজন একসঙ্গে ধমকে উঠল, আরে কী মুস্কিল, বলবে তো কী দেখেছ? দুর্গাও এসেছে। নন্দ একটু দূরে দাঁড়িয়ে। আশে-পাশেই কোথাও বোধহয় ভোলা কেষ্ট ছিল। তারাও এসেছে মাতির উঠোনে।

দুর্গা বলল, বলবি তো গানি, কী দেখেছিস?

গানি অমনি ছুটে এল দুর্গার কাছে। তার হাত আর কাপড় চেপে ধরে বলল, হ্যাঁ বলব, বলব দুগ্‌গা, তোকে সব বলব আমি। আমি পিসীর কাছেই ছিলুম এতক্ষণ। তা'পরে ঘরে গে' জামাকাপড় প'রে বেরুবার আগে, মাসীকে বলতে আসছিলুম, কাঠে আঁচ থাকলে রেখে দিও। ওবেলার তরকারিটুকুনি গরম ক'রে নেব। উঠোনে পা দিয়েই দেখলুম—

ব'লে আর একবার তুলসীতলার দিকে দেখে কেঁপে উঠল গানি। বলল, দেখলুম এ্যাট্‌টা মস্তবড় কংকাল দেঁড়িয়ে আছে গো তুলসীতলায়। হে ভগমান, মিছে বললে আজ রাতে আমার মুখ দে' রক্ত উঠে যেন মরি। সে যে কত বড়, সে হাত দে' পিসীকে আমার ধরতে আসছে, আর হাড়ে হাড়ে কী কড়মড়্ কড়্মড়্ শব্দ!

মুহূর্তে একটা গা ছমছমে স্তব্ধতা নেমে এল। কেউ তুলসীতলার দিকে তাকাল না। সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কথা বলবার ছল্ ক'রে পরস্পর ঘন হল আরো। কিন্তু কথা বলতে পারল না। অবিশ্বাস করবার ক্ষমতাও কারুর নেই। মাতি মুচিনী জলজ্যান্ত প্রমাণ প'ড়ে রয়েছে।

শুধু দুর্গা হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে।—কী যে বলিস্ তুই গানি।

সবাই তাকিয়ে দেখল দুর্গাকে। তখনো দুর্গার চুল বাঁধা হয়নি।

তার সর্বাঙ্গে হাসির দমক দেখে, সবাই যেন অশরীরী মায়া দেখতে লাগল। ভোলা কেষ্টও।

গানি একেবারে ভেঙে পড়ল দুর্গার পায়ের কাছে। ডুকরে ডুকরে বলল, তুই সত্যিকারের মা দুগ্‌গা, এ তোর লীলা।

দুর্গা আরো হেসে উঠল, দুলে দুলে উঠল বেতস লতার মত। বলল, আ রে দূর। সর্, এখন ছাখ্। বুড়ীর কী হাল।

সকলের গলায় যেন একটু একটু স্বর ফুটল। কেউ কেউ বলল, একজন রোজা বদ্যি ডাকা দরকার। আর ফেলে রাখা চলে না।

দুর্গা বলল, আগে জল দাও দিকিনি মুখে মাথায়।

কিন্তু মাতি তখন মারা গিয়েছে। গানি পিসীর বুকের ওপর প'ড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। যেন মনে হল, চারদিকের অন্ধকারে, গাছের ঝুপসি ঝাড়ে কংকালের রাশি রাশি হাত ঘুরছে।

কে যেন ব'লে উঠল, কই তুলসীতলায় একখানি তুলসীগাছও তো নেই। মানুষগুলি সবাই মিলে যেন একটা হ'য়ে গিয়েছে। একটা দেহ একটা মুখ। শুধু অনেক জোড়া ভয়ার্ত চোখ। অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হ'য়ে এল। বোধহয় বাতাসে রোগের গন্ধ পেয়ে একটা কুকুর আঁউ আঁউ ক'রে ডেকে উঠল।

একজন বলল, দূর হ দূর হ!

শুধু দুর্গা ভ্রু কুঁচকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভোলা কেষ্ট তাকিয়েছিল পরস্পরের দিকে। এই দুই নির্ভয় নিশাচরদের চোখেও যেন একটি ভয়ার্ত প্রশ্ন থম্‌কে আছে। বোধহয়, জীবনে এই প্রথম, দুর্গা কাছে থাকতেও তারা তাকাতে ভুলে গেল।

ভোলা বলল, চল্ যাই।

কেষ্ট বলল, চল্।

দুজনে গা ঘেঁষে ঘেঁসে চলতে লাগল।

ভোলা বলল, বিশ্বেস করতে মন চায় না।

কেষ্ট বলল, কিন্তুন গানি বলছে যে?

—দিষ্টি বেব্‌ভোম্‌ হ'তে পারে।

—দুজনারই ?

—হ্যাঁ। এ পাড়ায় সারারাত কাটিয়েছি কালকেও। কই, কোনোদিন কিছু দেখি নাই তো।

কেষ্ট বলল, তা তো বটেই। কংকাল ? তাও কখনো সম্ভব ?

ভোলা বলল, হ্যাঁ, চল্‌ এট্টু মাল খাইগে বাজারে গে। ওসব চিন্তা চলে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই চল্‌।

কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা ভোরবেলার মধ্যেই চারদিকে রটনা হ'য়ে গেল। অনেক আলোচনা, কূট তর্ক উঠল ঘাটে মাঠে, হাটে বাজারে। থানার পুলিস এসেও একবার দেখে গেল জায়গাটা। মাতি মুচিনীর দেহটা অবশ্য টেনে নিয়ে যায়নি মর্গে। মুখে অবিশ্বাস থাকলেও, সর্বত্রই ভিতরে ভিতরে একটা ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল। গানি তো পাড়া ছেড়ে একেবারে বাজারে গিয়ে উঠেছে। কাসেম ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে মাছের বাজারের সামনে একটি চালাঘর। শুধু একটি কাজ কিছুতেই ক'রে উঠতে পারেনি গানি, পিসীর আঁচল থেকে কাসেমের দেওয়া টাকা দুটি নিতে পারেনি। ভয় পেয়েছে। হয়তো ওই জন্যেই পিসী রোজ সন্ধ্যাবেলায় ধর্না দিত। কিন্তু শ্মশানের বেদো নিশ্চয় ছাড়ে নি।

অখিলবাবু রাত্রে কয়েকদিন একলা একলাই টহল দিয়ে গেলেন বাগ্‌দিপাড়ায়। ভোলা কেষ্ট বড় একটি লোহার ডাণ্ডা নিয়ে বাগ্‌দিপাড়ায় নজর রাখল। ডাণ্ডা তো বটেই। লোহাটা নাকি কাছে থাকাও ভাল।

কিন্তু বাগ্‌দিপাড়ার বাতাসে আর তেমন যেন ঝেড়ে নিশ্বাস ফেলা যায় না। আড়ষ্টতা থেকেই গেল। লোকজন রাতবিরেতে একলা আর বেরুতেই চায় না।

দিন দশেক পরে, রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় ভোলা আর কেষ্ট

খাল পারের দিক থেকে বাগ্‌দিপাড়ার দিকে আসছিল। দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার সামান্য এক টুকরো চাঁদ বোধহয় আকাশে ছিল। তাতে অন্ধকার ফিকে হয় নি। একটা কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল। অল্প অল্প কুয়াশাও ছিল। মাঘ মাসের আকাশ একটু ঝাপ্‌সা।

প্রথমে ভোলারই চোখে পড়ল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে লোহার ডাণ্ডাটা প'ড়ে গেল। কেষ্টর চোখে পড়ল এক পা এগিয়ে। বুড়ো অশ্বত্থের তলায়, শাদা ধবধবে কংকাল। পা নাড়াচ্ছে আর মড়্‌মড়্‌ শব্দ উঠছে। হাতে একটা মোটা হাত দুই লম্বা লাঠির মত যেন কী রয়েছে।

ভোলা মুহূর্তে পিছন ফিরেই, চীৎকার ক'রে দৌড় দিল। কংকালের হাতের লাঠিটা সজোরে এসে পড়ল কেষ্টর ঘাড়ে। সেও চীৎকার ক'রে দৌড়ুবার আগেই, চোখের ওপর ধাঁই ক'রে একটা ঘুষি পড়ল। কেষ্টর মনে হল, যে অন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। সে চীৎকার ক'রে উঠল। পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে সে, জঙ্গল মাড়িয়ে, গাছে ধাক্কা খেয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুল।

চীৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন সাড়া দিল। অখিলবাবুও এসেছিলেন বাগ্‌দিপাড়ার দিকে। তিনি টর্চলাইট নিয়ে, চীৎকার লক্ষ্য ক'রে ছুটলেন। কেষ্টকেই দেখতে পেলেন আগে। চীৎকার ক'রে ডাকলেন, এই কেষ্টা, এই, কী হয়েছে?

কিন্তু কেষ্টর অন্ধ আতঙ্ক তখনো যায় নি। তার মনে হ'ল, ছোটবাবুর বেশ ধরে, এ হয়তো সেই কংকালেরই ছলনা। অখিলবাবু টর্চের আলো ফেলে আরো জোরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই কেষ্ট, দাঁড়া। আমি রে, আমি। আমি ছোটবাবু।

কেষ্ট দাঁড়াল এবার। অখিলবাবু কাছে যেতেই, তার হাত চেপে ধরল কেষ্ট। আতঙ্কে তার চোখ উদ্দীপ্ত। একটা চোখের কোল ফুলে উঠেছে। গলার স্বর ভেঙে গিয়েছে তার। রুদ্ধ ভয়ার্ত

গলায় বলল, কংকাল ছোটবাবু, অশথের তলায়, জলজ্যান্ত ছোটবাবু। কোনো রকমে পাণে বেঁচে এয়েছি।

অখিলবাবুর ভ্রু কুঁচকে উঠল। টর্চের আলোটা জ্বালিয়েই রাখলেন। কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন এই জঙ্গলে ও চারপাশের অন্ধকারে। তবু বললেন, কংকাল?

—হ্যাঁ ছোটবাবু, অব্যথ কংকাল, শাদা ধপ্‌ধপে। এই দেখুন, আমার কাঁধ ভেঙে দিয়েছে। হাড়ের হাত তো। চোখে কেমন ঘুষি মেরেছে, দেখুন।

টর্চের আলো ও কথাবার্তা শুনে দু' চারজন এসে পড়ল এদিকে হ্যারিকেন নিয়ে। তবু একটা সন্দেহ হল অখিলবাবুর। কেষ্টর মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুঁকলেন। না, মদ তো খায় নি।

কেষ্ট নিজেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বিশ্বেস করুন ছোটবাবু, এক ফোঁটা, কিছু পেটে পড়ে নাই। আমি আর ভোলা রোজ যেমন আসি, তেমনি আসছিলুম। খালধার থেকে পাড়ায় ঢুকছিলুম। ঠিক সেই সময় অশথের তলায় —

সকলের চোখের সামনে একটি জীবন্ত বীভৎস কংকাল ভেসে উঠল।

একজন জিজ্ঞেস করল, কিন্তু, ভোলা কোথা গেল?

কেষ্ট বলল, পালিয়েছে। ও আগে দেখেছিল। আমি পালাতে পারি নাই। হাড়ে মড়মড়্ ক'রে শব্দ হল, আর একখান্ গাছের ডাল দে' আমার কাঁধে মারল। তা'পরেই চোখে একখানি মণকে ওজনের ঘুষি।

কে একজন জিজ্ঞেস ক'রে উঠল, উনি মুখ ফুটে কিছু বললেন তোমাকে? মানে, এ পাড়ায় কেন ভর করেছেন, কেন নজর পড়ল, সে সব কিছু বললেন?

কেষ্ট ঘাড় নেড়ে বলল, না, মুখে সাড়া শব্দ নাই। নিশ্বেসের শব্দ পর্যন্ত নাই।

অস্বস্তি বোধ করলেও অখিলবাবু সমবেত সবাইকে বললেন, চল তো একবার অশ্বত্থতলায় ঘুরে দেখে আসি, ব্যাপারটা কী?

কেউ রাজী হল না। একজন বলল, ওখেনে গে' কী হবে ছোটবাবু। সে কি আর আছে? সে এখন হাওয়ায় ভাসছে।

আর সেই হাওয়া যে এখানেও খেলছে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সকলেই ঘরমুখো হ'ল হ্যারিকেন নিয়ে। অখিলবাবু বললেন, আচ্ছা চল, অফিসে যাই আগে। বলাইবাবুকে নিয়ে আসা যাবে।

অফিসে এসে দেখা গেল, ভোলা আগেই সেখানে পৌঁছেছে। তার কথা শুনে বলাইয়ের ঠোঁটের কোণে একটি বাঁকা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভ্রু'র খোঁচায় ক্রোধ সূচাগ্র হ'য়ে আছে। অখিলবাবুকে দেখে সে বলল, কী অখিলবাবু, আপনিও কংকাল ভূত দেখলেন নাকি?

অখিলবাবু কিন্তু উপহাস করতে পারলেন না। বললেন, দেখিনি। কিন্তু ব্যাপারটা ইগ্‌নোর করা যাচ্ছে না।

বলাই বলল, তা তো বটেই। গুলিকে মারার শোধটা খুব ভালভাবে নিল চিরঞ্জীব। মাতি বুড়ী মরার পরেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

অখিলবাবু একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন, তা-ই কী?

বলাই বলল, নিশ্চয়। আপনারও সন্দেহ আছে নাকি? মাতি যেদিন মরে, সেইদিন থেকেই মাতি আমাদের ইনফর্মারের কাজ নিয়েছিল। কিন্তু চিরঞ্জীবের প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে না। ভয় দেখিয়ে একটা বুড়ীকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলাটা ঠিক হয়নি তার।

ভোলা কেষ্টকে দেখিয়ে বলল, আর এদিকে যা দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে, এ দুই শ্রীমানকে রাতে আর ওপাড়ায় পাঠানো যাবে না। তবে, আমাদের যে-কজন আর্মড পুলিশ রয়েছে, তারা থাকুক। আমি কালকেই আমাদের থানার ও-সি-কে জানিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে আসব।

বাগ্‌দিপাড়ায় এখন থেকে তারাই থাকবে। কংকাল দেখা মাত্র গুলি চালাবার হুকুম থাকবে তাদের ওপর। নইলে দেখছি কোন্‌দিন কংকাল এই অফিসে এসে হাজির হয়ে আমাদের পিটতে শুরু করবে।

বলাই অবাক হচ্ছিল কাসেমকে চুপ করে থাকতে দেখে। কাসেমের ওপর একটু বেশী ভরসা তার। জমাদার বিনয়ের চেয়েও সাহসী সে। বলল, কাসেম কী বল?

কাসেম বলল, হাঁ, ব্যাপারটা তো বড়বাবু খুবই গোলমেলে। কংকালটা সাজানো বলছেন আপনি?

বলাই বলল, তবে কী? কংকাল কী চলাফেরা করতে পারে নাকি? তা হ'লে তো মেডিকেল কলেজে কংকালের হাট বসে যেত রোজ রাত্রে।

কেষ্ট বলে উঠল, কিন্তুন, বড়বাবু, তার হাড়ে কী কড়্‌কড়্‌ মড়্‌মড়্‌ শব্দ! মান্‌ষের কি অমন হয়?

বলাই বলল, করতে জানলেই হয়। চল দেখি তুমি আমার সঙ্গে, কোথায় দেখেছিলে তাকে। ভোলা চল। অখিলবাবুও চলুন।

অখিলবাবু বললেন, চলুন।

বলাই বাইরে যেতে যেতে বলল, এক মিনিট, আসছি।

ওপরে এসে, ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বার করে নিল সে। মলিনা যে অন্ধকার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, লক্ষ্য করেনি। রিভলবারটা লোড করা আছে কিনা দেখে, চোখ তুলতেই মলিনাকে দেখতে পেল।

মলিনা বলল, কী হয়েছে? এত রাতে রিভলবার নিয়ে কোথায়?

বলাই বেল্টের সঙ্গে রিভলবার বেঁধে নিতে নিতে বলল, কংকালের সন্ধানে।

—কংকালের সন্ধানে?

—হ্যাঁ, যে কংকাল দেখে মাতি বুড়ী মরেছে, সে কংকাল আজ

আমাদের এক ইনফর্মারকে মেরেছে। জানি নে, তোমার হিরো কত খেলা দেখাবে।

ব'লে মলিনার চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে চলে গেল বলাই। মলিনা দাঁড়িয়ে রইল তেমনি অন্ধকারে। কেন যেন তার বার বার মনে হ'তে লাগল কোথায় একটা সর্বনাশ চুপি চুপি ঘনিয়ে আসছে।

কিন্তু নিঝুম অন্ধকার অশ্বত্থের তলা। শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক। টর্চের আলো ফেলে গাছতলায় পায়ের দাগ খুঁজল বলাই। কিছুই বোঝা গেল না। শুধু এই নির্জন অশ্বত্থের গায়েও একটি হাতে লেখা পোস্টার লাগানো রয়েছে, 'কৃষক সন্তান শ্রীধরদাসকে কৃষকেরা ভোট দিন।'

ফিরে যাবার পথে, অখিলবাবু বললেন, একটু ওই দিক হ'য়ে যাওয়া যাক্।

বলাই বলল, কোন্ দিক?

—বাগ্‌দিপাড়া।

বলাই বুঝল, অখিলবাবু দুর্গার বাড়ির কথা বলছেন। আজকাল অখিলবাবু আর তেমন স্পষ্ট ক'রে দুর্গার নাম করেন না। সে বলল, চলুন।

দুর্গার বাড়ি অন্ধকার, নিঝুম। কিন্তু মোটা গলার স্বর ভেসে এল, কে রে ওখানে?

কেউ কোন জবাব দিল না। গলাটা নন্দর সে ঠিকই বুঝেছিল, কারা যাচ্ছে। তবু সে আবার বলল, মুখে যে বাক্যি নেই? জিজ্ঞেস করছি যে, কে?

বলাই বলল, তুমি কে?

—আমি নন্দ।

—আমি বলাই সান্যাল।

নন্দ বলল, অ! তাই জিজ্ঞেস করছি, এত রাতে কে যায়?

বলাই জিজ্ঞেস করল, দুর্গা কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে।

বলাই দাঁড়াল না। অখিলবাবু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, একবার দেখে গেলে হ'ত।

কেষ্টও সায় দিয়ে উঠল, হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলুম।

বলাইয়ের মতামত পাবার আগেই, উঠোনে ঢুকে পড়লেন অখিলবাবু। অখিলবাবুর গা ঘেঁষে কেষ্টও। ভয়টা তার যায়নি। তবু একবার দুর্গাকে দেখার লোভ সামলানো যায় না।

নন্দ রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হল আবার। বাড়ির মধ্যে কেন?

অখিলবাবু বললেন, দুর্গা কোথায়?

নন্দ কিছু বলবার আগেই দুর্গা বলে উঠল, এই যে দাওয়ায় আছি। কেন, কী দরকার?

অখিলবাবুর টর্চের আলো তীরের মত ছুটে গেল দাওয়ায়। নন্দ বলে উঠল, আঃ, কেমনধারা লোক আপনারা। রাত ক'রে পাড়ায় ঢুকে, মেয়েমানুষের গায়ে ব্যাটারির আলো মারছেন? কী হয়েছে কী?

অখিলবাবু বললেন, তবে যে তুমি বললে, ঘুমোচ্ছে?

দুর্গা বলল, না হয় শুয়েই আছি! আপনার কি দরকার? কংকাল দেখতে এয়েছেন এখানে?

টর্চের আলো সরাতে হল অখিলবাবুকে। সোজা দুর্গার গায়ে আলো না ফেলে, একটু দূরে ফেললেন। দুর্গার অবয়বটি পরিষ্কার দেখা যায়। দুর্গার এলিয়ে বসে থাকা, কোমরের ওপর দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসা, পা চেপে ধরা চুড়ি পরা পুষ্ট বলিষ্ঠ হাত আর জামাহীন কাঁধের ওপর দিয়ে এলিয়ে পড়া আঁচল।

অখিলবাবুর হাতের একটি বিশেষ জায়গায়, তার প্রৌঢ় রক্ত দপ্‌দপিয়ে উঠল। নিতান্ত ক্ষণিকের জন্য হ'লেও দুর্গার দেহের একটা স্পর্শ তার হাতে লেগে আছে। হাত থেকে দপ্‌দপানি চোখে উঠল

অখিলবাবুর। অন্ধকারে চোখ খাবলার মত তীব্র ও অপলক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি দুর্গার দিকে। তবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তাঁর বুক থেকে। কেষ্টও তাকিয়েছিল। কংকালের মার-খাওয়া ফোলা চোখে তার আজ নেশা ধরল যেন।

অখিলবাবু বললেন, কংকালের সন্ধানেই আছি। তবে এবার আর চোখে দেখা নয় শুধু। দেখা মাত্র গুলি ক'রে মারা হবে।

নন্দ ব'লে উঠল, সেই ভাল বাবু। গুলি করে যদি ভূত মারা যায়, লোকের এ্যাট্টা পেত্যয় হবে যে ওসব কিছু লয়। দেখুন না কেন, কাল থেকে নিকি গাঁয়ে সংকেত্তন করবে সব। তা'পরে অষ্টম-পোহর লাগাবে।

অখিলবাবু ফিরে গেলেন। কেষ্টও গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ির বাইরে এসে দেখা গেল, বলাই চলে গেছে। নন্দ অন্ধকারে খানিকটা অনুসরণ করল তাদের। ফিরে এল আবার পা টিপে টিপে।

নন্দ দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

দুর্গা বলল, চলে গেছে?

নন্দ বলল, হ্যাঁ। আর কেউ একলা থাকে এ পাড়ায়?

দুর্গা বলল, তোমার গপ্পটা এবার শেষ কর নন্দদা। তা'পরে কী দেখলে?

নন্দ দাওয়ার সিঁড়িতে বসে বলল, তা'পরে সেই ঘুরে ঘুরেই বেড়াই। তা' কলকেতা শহর, কে কাকে চেনে? ভিক্ষে করতেও শিখিনি তখন। এ্যাট্টা জোয়ান মদ্দ, ভিক্ষে চাইলেই কি আর লোকে দেয়? তার জন্যে কত কাঁদুনি শিখতে হয়, গল্প ফাঁদতে হয়। কিন্তুন কলকেতা কেন যেতে গেলুম, সেকথা তো বলা হ'ল না। শালার আকাশ তো ছেদা হ'য়ে গেছে, খালি বিষ্টি আর বিষ্টি। গোটু গাঁয়ে আপন মাসীর কাছে গে' ছিলুম কদিন। সেও বুঝল, এ আপদ বোনঝির জমি জিরেত নেই, মাঠে কাজও নেই, ব'সে ব'সে খাবে।

পষ্ট জানিয়ে দিলে, গাঁয়ে ফিরে যাও, এতবড় ছেলেকে আমি বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। সদরের শহরে চলে গেলুম। মাসীর একখানি পেতলের ঘড়া চুরি ক'রে নে' গেছলুম। কিন্তুন তাতে কদিন চলে? গাঁয়ে থাকবার জায়গা নেই, শহরেও নেই। তার ওপরে বিষ্টি। তা শহরের ব্যাপার তো। কত রকম লোক যে আছে। দিন তিনেক ত্যাখন পেটে কিছু পড়েনি। একজন বললে, বিনা টিকিটে কলকেতা যাও। পুলিসে ধরবে, ধরলে পোড়া হোক, পচা হোক কিছু খেতে দেবে। ধু—র! কেউ ধরলে না। হাওড়া ইস্টিশানে বাবুরা ছুটো কি বুজুর বুজুর ক'রে গালাগাল দিলে, গায়ে ধাক্কা দে' ছেড়ে দিলে। পাথর গো কলকেতা। কী বলি কাকে। লোকগুলোন তো আমাদের দেশের মতন নয়। কেমন যেন আড়মাতলা, নিজের খেয়ালেই আছে। তা কি ভাগ্যি, বৈকুণ্ঠের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। সেই যে বড়াতে ডাকাতি হয়েছেল, খুন হয়েছেল আগুরি বাড়ির হেতু রায়, সে কীর্তি তো বৈকুণ্ঠেরই। সে ত্যাখন ফেরার। সে নে' গেল এক জায়গায়। দেখলুম, সেখানে বৈকুণ্ঠ ঘর নে' থাকে। তবে জায়গাটা ভাল না। বেবুশ্যে টেবুশ্যে আছে সব ঘরে। অনেকদিন খাইয়েছিল বসিয়ে বসিয়ে। তা'পর হাতেখড়িও দিয়েছিল। তবে শহরে নয় গাঁয়েই। চুরি নয় ডাকাতি।

দুর্গা বাধা দিয়ে বলল, জীবনে কতবার ডাকাতি করেছ নন্দদা?

নন্দ বলল, তা বড় ডাকাতি বার পাঁচেক করেছি।

—ক'টা খুন করেছ?

—মা কালীর দিব্যি ক'রে বলছি, এ্যাট্টাও না। কুক্ পাড়লে যেখেনে পেটের ছেলে খসে যায়, সেখেনে খুনখারাপি হয় নিকি? ডাকাতে যে খুন করে সেটা ভয়ে ক'রে, দিদি, বুঝলে!

—ভয়ে?

—হ্যাঁ, ভয়ে। যদি ধরা পড়ি কিংবা মরি, এ ভয় যাদের বেশী হয়, তারা খুন করে। রক্ত দশ্‌শন ক'রে তাদের সাহস বাড়ে। কালী

পুজোর পাঁটা বলির মতন। ওটা ভাল নয়। এ আমি দেখলুম দিদি, মানুষ দু' কারণে খুন করে। এ্যাট্টা তোমার ভয়। তা সে তোমার যেমন ভয়ই হোক। আর মারে ইজ্জতের জন্যে। যার ইজ্জৎ জ্ঞান বেশী, সে তার ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে খুন করতে পারে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম—

দুর্গা আবার বলল, ক'বার জেল খেটেছ?

—তিনবার। একবার পাঁচ বছর, তারপরে দু' বছর আর একবার আড়াই বছর। এই আড়াই বছর চলছে, এখনো বাইরে আছি।

ব'লে হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলল নন্দ। বলল, হান্‌ফে (হানিফ) ডাকাডাকি করে। এদিকে কিছু করে না। হরিপালের ওদিক দে' হাওড়ার দলের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে ডাকাতি ক'রে আসে। শুনি নিকি, সোবেদালীর বেধবা মেয়েটাকে নিকে করবে। মেয়েটার তো দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছেই। তা হান্‌ফে নিকে করবে বলে, জমি কিনবে, সোমসার টোমসারও করবে। কিন্তন্ তা কি কখনো হয়? মা বিয়োল পরের জমিতে। ডাকাতি ক'রে নিজে জমি কিনে ভোগ করব? সে কখনো সয় না। এ জন্মোটা এমনি গেল। আবার জন্মালে পরে দেখা যাবে। তবে, মন ব'লে এ্যাট্টা কথা আছে। ইচ্ছে কি আর করে না। কিন্তন সোমসারে সব জিনিস সকলের সাজে না। তবে আজকাল এ্যাট্টা কি হয়েছে, শরীলে আর মনে কেমন যুত পাই না। সেই দলবল নে দাঙ্গা হাঙ্গামা, আর ইচ্ছে করে না। তবে, নিজের চরিত্তিরটা তো জানা আছে। কখন বেরিয়ে পড়ব, আবার হয়তো জেলে চলে যাব।

কিন্তু দুর্গা চুপ ক'রেই ছিল। তার মনটা খারাপ হ'য়ে উঠছিল। কেবলি ঘুরে ফিরে একটি কথা কানে বাজতে লাগল, 'সোমসারে সব জিনিস সকলের সাজে না।' মনে হ'ল, নন্দর কথাগুলির সঙ্গে, কোথায় যেন নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ মিল আছে।

শীতটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘন হতে লাগল কুয়াশা। আকাশে তারাগুলি অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে আরো।

নন্দ গায়ের চাদরটা মাথা সুদ্ধ জড়িয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ যা বলছিলুম—

দুর্গাও বলল, হ্যাঁ, সেইটে বল।

নন্দ বলল, ওই বৈকুণ্ঠের সঙ্গেই একদিন রাত্রে কলকেতায় প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছি। ত্যাখন দুগ্‌গা পূজো লেগেছে। সব মণ্ডপেই সব নানান রকমের সাজগোজ, গান বাজনা। এক জায়গায় দেখলুম, অনেক লোক ভিড় করে আছে। ভিড় ঠেলে, সামনে তাকিয়ে থ' মেরে গেলুম। দেখলুম, বাঁশ দে' ঘেরা এ্যাট্টা জায়গায় একখান্ মরা গাছ সাজিয়েছে। সেটা ঠাহর ক'রে দেখতে হয়। অন্ধকার তো, আর সেই মরা গাছে এ্যাট্টা কংকাল উঠছে আর নামছে। মড়্‌মড়্ শব্দ হ'চ্ছে তার হাত পা নাড়ায়, চলায় ফেরায়। আর থেকে থেকে হি হি ক'রে হাসি। এ আবার কী খেলা রে বাবা! একেবারে সত্যি কংকালের মতন। বৈকুণ্ঠ বললে, খেলাটা তো জানতেই হবে। কাজে লাগবে অনেক। লোকে লোকারণ্য হ'য়ে সে খেলা দেখছে। কংকাল হাসলে, কলকেতা শহরের লোকেরা পর্যন্ত কাট হয়ে যায়! বৈকুণ্ঠ নড়লে না। রাত বারোটা পর্যন্ত বসে রইল। মণ্ডপ ফাঁকা হয়ে যাবার পর বাবুদের সে বললে। 'বাবু, আমাদের গাঁয়ে এ খেলাটা আপনাদের দেখাতে হবে।' ছেলেছোকরা বাবুরা হেসেই বাঁচে না। ব'লে 'আবার খেলা কী হে। ও তো তুমিও গাঁয়ে গে' দেখাতে পার।' বাবুরা গেঁয়ো মানুষ পেয়ে খুব একচোট হাসাহাসি করলে। তা'পর নিজেরাই কংকাল সেজে দেখিয়ে দিলে। সেই দেখলুম, ছাতার কালো কাপড়, মানষের মাপে মাপে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাপ্‌টি খাওয়া জামা। তার দু'পিঠে সাদা রং দে' কংকাল আঁকা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে খালি সাদা রংটাই দেখা যায়। বৈকুণ্ঠ বললে, 'বাবু আমাকে একখানি তোয়ের ক'রে দিতে লাগবে।' বাবুরা বললে, 'পুজো যাক

তা' পরে এস। কিন্তুন পুজোর পরেই হয়নি। একমাস ঘুরে ঘুরে টাকা দিয়ে একখান তোয়ের ক'রে এনেছিল। তা' কি বলব, যিদিনে আনল, সিদিনেই কলকেতার সেই পাড়ায় একজনকে ভয় দেখাল। এ্যাট্টা মেয়েমানুষকে। বেটি দাঁত কপাটি লেগে প'ড়ে গেল।'

দুর্গা হেসে উঠল। বলল, বেঁচেছিল?

—হ্যাঁ বেঁচেছিল। ওই মাতি বুড়ীর মতন—

দুর্গা বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, ওটা তা বলে তোমার ঠিক হয় নি নন্দদা।

নন্দ বলল, কী ক'রে জানব বল। বুড়ী যে একেবারে পটল তুলবে, তা জানতুম না। তা'হলে আগে গানির দরজায় গে' দাঁড়াতুম। ওতো আমি শুধু পরখ করতে গেছলুম গো দিদি। লাগে তাক্ না লাগে তুক্। সে যাক্‌গে—

ব'লে অন্ধকারে একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নন্দ। তারপর কেশো গলায় হেসে বলল, কিন্তুন ভোলা কেষ্টারও যে এমন দুগ্‌গতি হবে ভাবি নাই, সত্যি বলছি। ভোলাকে দৌড়তে দেখে হেসে মরে যাই। শালা লোহার ডাণ্ডা ফেলে চোঁ চা। কেষ্টটা বলে উঠল, 'পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।'

শীতার্ত অন্ধকার রাত্রি দুর্গার খিল্‌খিল্ হাসিতে শিউরে উঠল যেন।

পর পর দুটি ঘটনায় পাড়াটা সিটিয়ে আছে ভয়ে। আজ বোধহয় কেউ হাজার দরকার পড়লেও বাইরে বেরুবে না। তার ওপরে দুর্গার এই হাসি কানে গেলে হয়তো ঘরের মধ্যেই অনেকে ভিরমি যাবে।

নন্দ বলল, কংকাল না হ'য়ে এখন যদি ভোলা কেষ্টর সামনে ওই যন্তরটি দে' কড়্‌কড়্ শব্দ করা যায়, তা'লেই শালারা দৌড়ে পালাবে।

দুর্গা বলল, তা'তো বুঝলুম। ওদিকে অখিলবাবু কী বলে গেল শুনলে তো?

—শুনেছি। গুলি চালাবে। সে রকম দেখলে অবিশ্যি সরে আসতে হবে। তুমি যেন কার কথা বলছিলে আরো?

—ওকুর দে'র কথা। পুলিশের গা-চাটাটাকে একদিন ভয় দেখাতে পার?

—তা দেখানো যাবে না কেন? দু' ঘা দেয়াও যাবে। ভাবছি বিমলাপুরে গে' ওই সোলেমান আর সনাতন ঘোষকেও একদিন ঝেড়ে আসব। শালারা এখন সাধু সেজে ভোটের নড়ায়ে লেমেছেন।

দুর্গা তেমনি খিল্ খিল্ করে হেসে বলল, কংকালের গুঁতো খেলে বুঝি আবার চোলাই করতে নামবে?

নন্দ বলল, না, চোলাই ওরা করবে না এখন। জানে, এমনিতেই চিরো বাঁড়ুজ্জা তা নষ্ট ক'রে দেবে। এখনো দুজনের দুটো জাওয়া ভাঙা বাকী আছে না? তবে সোলেমান কী করবে জানি না। সনাতন আবার চোলাই করবে, তার আগে চিরো ঠাকুরকে ধরিয়ে দিতে চায়। শালা জানে, পুলিসে আমাকে কিছু করতে পারবে না, চিরো ঠাকুরই টিট্ করবে। তাই যত আকোচ্ চিরো ঠাকুরের ওপর। কিছু না হোক, কংকাল দেখলে ঘরের বার হবে না রাতে।

দুর্গার কেবলই হাসি পায় কংকালের কথা শুনলে। নন্দ বলল, হ্যাঁ দিদি, ও জিনিস এমন মনে গেঁথে যায়, দশজনে হাজার সাহস দিলেও পাণ আঁইঢাই করে।

হাসতে হাসতে দুর্গা খোলা চুল এলো খোঁপা করে বাঁধতে গেল। কী যেন পড়ে গেল তার কোমর থেকে। শব্দ হল ঠকাস্ ক'রে। একটু ঝকমকিয়ে উঠল।

নন্দ বলল, কী ওটা?

খুবই নির্বিকার গলায় বলল দুর্গা, ওই দেখ না, ছোটঠাকুরের কীর্তি। অস্তর দিয়েছে একখানা সব সোমায় কাছে কাছে রাখতে। গুপ্তি নিকি বলে। বলেছে, তাই রেখে দিয়েছি।

নন্দ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ভাল করেছ দিদি, দরকার

শাখা। কিন্তুন কোনোদিন টের পাই নাই তো যে ওটা তোমার কাছে থাকে?

দুর্গা কিছু বলল না। এই শীতেও সে জামা গায়ে দেয় নি। আঁচলটিই জড়িয়ে নিল ভাল ক'রে।

নন্দ আবার বলল, কিন্তুন আর কত রাত করবে। আমাকে তো খাইয়ে দিলে। তুমি খেয়ে নাও এবারে?

দুর্গা বলল, খাব। ছোট্‌ঠাকুরের রান্না করেছি। সে এসে খেয়ে নিক্‌ আগে। কিন্তুন্‌, আজ যেন বড্ড দেরী করছে। রাত একটা তো বুঝি বাজল। গুলিটাও তো আসে না।

নন্দ বলল, এবার এসে পড়বে দুজনেই।

একটু চুপ করে থাকার পর নন্দর গলায় হাসির মত শব্দ শোনা গেল।

দুর্গা বলল, হাসছ যে?

নন্দ বলল, তোমার দুশ্চিন্তে দেখে। এ নাইনে এত চিন্তে করলে চলে?

দুর্গা বলল, সেই জন্যেই বলি ছোট্‌ঠাকুরকে, তাকে ঘরে বসিয়ে আমি সব ক'রে আসতে পারি। তাইতে আমার মনে মনে শান্তি থাকে।

নন্দর ছোট ছোট অপলক চোখের বিস্ময় অন্ধকারে দেখা যায় না। সে দুর্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সহসা একটি নিশ্বাস চেপে বলে, তা' তুমি পার। নইলে রাত দশটায় আদাড় বাদাড় ভেঙে শ্মশানে যেতে পারতে? তা' চির ঠাউর কি তোমাকে অদ্দুর পাঠাতে পারে? ওই নিয়ে তোমাদের রোজ বিবাদ হয় দেখি। সে তোমাকে যেতে দেবে না।

দুর্গা যেন রুষ্ট গলায় বলল, দেখ না, শুধু ভেবে মরি বসে বসে।

নন্দর গলার স্বরটা যেন হাসিভরা গোঙানির মত শোনালো,

সে বলে, তুমি যাবে না, তুমি বল সে যাবে না, হেঁ হেঁ হেঁ…। বড় বেমানান লাগে।

দুর্গা বলল, বেমানান ?

—হ্যাঁ। সোমসারেতে জনে জনের নানান জায়গা। এখানটায় তোমাদের বেমানান লাগে।

দুর্গা বুঝতে পারল, কী বলতে চায় নন্দ। সে বললে, কে আর মানানসই জায়গায় আছে বল নন্দদা। কাউকে তো দেখি না। তুমি কি মানানসই জায়গায় আছ ?

নন্দ হেসে বলল, আমাদের কোনো জায়গাই নাই। জোর ক'রে এ্যাট্টা জায়গা লিয়েছি। লোকে জানে খুনী ডাকাত হয়েছি। জেল-খাটা আসামী। ওতে বেমানান কিছু হয় নাই।

দুর্গা বলল, সে তো আমার বেলাতেও নন্দদা। লোকে বলে, মদ চোলাই করা নিকি আমার রক্তের মধ্যে আছে। চোলাই ক'রে খাই। সবাই বলে, বাঁকা বাগ্দির মেয়ে আইবুড়ো বেলায় লোক ধরেছে। সেও সত্যি কথা। এখন যা আছি, এর চেয়ে আর আমার মানান কী থাকবে। জায়গা আমারো ছিল না, জোর ক'রে এ জায়গার পত্তনী নিয়েছি।

ব'লে হাসল দুর্গা।

নন্দ বলল, সে যারা বলে, তারাও জানে দিদি তোমার সত্যিকারের জায়গা কোথা। আমিও জানি। তুমি সেটা বুঝবে না

দুর্গা বলল, আমি বুঝি না, লোকে বোঝে, তা হয় না নন্দদা। লোকে আমাকে বুঝতে দেবে না। বাবা মরার পরে, লোক তো আমি কম দেখলুম না। মানানসই জায়গায় যাবার হদিস আমাকে কেউ দেয়নি। বুড়ো আঙুল দেখাবে ব'লে সব তোয়ের হ'য়ে ছিল নন্দদা, বুঝলে। দেখাতে পারেনি, তাই রাগে বাঁচছে না তারা। তবে আমারো জেদ, পাপ বল, অন্যায় বল, আমি হটব না। নতুন রক্ত যখন কেউ দিতে পারলে না, ত্যাখন বাপের রক্ত-ই কাজ করবে।

নন্দ বুঝল, দুর্গা রেগে উঠেছে। তার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। নন্দর মুখের হাসিটা গেল না। কিন্তু আপন মনে মাথা নাড়তে লাগল সে। মনে মনে বলল দুর্গাকে উদ্দেশ করে, এ তোমার ভিতরের কথা নয় দিদি। আজ বুঝবে না, একদিন বুঝবে। দশ বছর আগে, এ সোমসারের ওপর আমারো বড় রাগ ছিল, অভিমান ছেল। সবাই এ সোমসারের মানুষ, আমি শুধু ভেসে এয়েছি? বাপ মা নাই, এট্টু জমিজমা নাই, তাই কি অমন হতচ্ছেদ্দা ক'রে ফেলে দেবে? দাও দিকিনি? তোমাদের ভুলতে দেব না আমি আছি। ঘুমন্ত আমার কথা মনে পড়বে। কিন্তুন, এখন কেন মনে হয়, আমি যেন হেরে গেলুম, সোমসারটা হারে নাই। দুর্গা দিদি, বেমানান জায়গায় থাকবে ব'লে জেদ ক'রে আছ, তবু একজনের পথ চেয়ে তোমার রাত কেটে যায়। মুখে ভাত তুলতে পার না। কোমরে গুপ্তি গুঁজে রাখ।

সহসা দুজনেই চমকে উঠল। স্টেশনের ওপারে, দূরের থানার ঘণ্টার স্তিমিত শব্দ এখন পরিষ্কার শোনা গেল। ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল।

নন্দ নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একবার যাব নিকি নিল্লায়?

দুর্গাও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, তুমি কি চেন হিদে গোয়ালার বাড়ি। তোমাকে না চিনলে হয়তো কেউ কিছু বলবেই না। আমিই বরং যাই।

নন্দ বলল, তা' হয় না। তোমার জন্যেই আমার থাকা এখানে। একবার গে' শ্মশানে ঘুরে, কবরেজের বাড়ি হ'য়ে এ'য়েছ, সেই আমার কাজের খেলাপ হয়েছে চিরো ঠাউ'রের কাছে। এখন তুমি নিল্লায় গেলে, আমাকে আর রক্ষে রাখবে না সে। আর হিদে গোয়ালার বাড়িও চিনি, গয়লাপাড়াটাও জানি।

বলতে বলতেই নন্দ লাঠিগাছটি তুলে নিল। বলল, সাবধানে থেক। যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।

দুর্গা কী যেন ভেবে বলল, আচ্ছা, এস। তুমি এলে আমি বেরুব

নন্দদা। যদি তুমি সাড়ে চারটের মধ্যে না আসতে পার, তবে ঘরের ভিতরের খিলটা সেই ভাবে খুলে নিও। আমি বেরিয়ে যাব। কবরেজবাড়ি যাব।

নন্দ বলল, আর সে এসে যদি জিজ্ঞেস করে, কোথা গেছে?

সে অর্থে চিরঞ্জীব।

—ব'লো কবরেজমশায়ের বাড়ি গেছে। সাবধানে যেয়ো, কেউ যেন পিছু না নেয়।

নন্দ বলল, না, আজ পাড়া ফাঁকা আছে, কেউ আসে নি।

নন্দ নিল্লোয় ঢোকার মুখে এসে চারদিক একবার দেখে নিল। নিল্লার বাতাস যেন থমথমিয়ে আছে মনে হ'ল। যেন গন্ধ পায় নন্দ। এই বিশেষ অনুভূতিটা তার রক্তের মধ্যে আছে। তার ভিতর থেকে যেন কেউ ব'লে উঠল, কিছু একটা ঘটেছে। একথা মনে হতে হ'তেই একটা টর্চের আলো ঝলকে উঠল দূরে। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল নন্দ। সে আড়াল নিল। পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল, আলোটা এদিকেই আসছে।

রাস্তাটা পুবে-পশ্চিমে লম্বা। উত্তরে ধান-কাটা মাঠ। দক্ষিণে জঙ্গল। জঙ্গলের শেষে নিল্লার চুনুরিপাড়া। তারপরেই কানা নদী। নন্দ রাস্তা পার হ'য়ে জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গল দিয়ে ঘুরে ঘুরে চুনুরিপাড়ায় এল। নিস্তব্ধ চারদিক। পুবে দুলেপাড়া। তারপরে একটা বড় বাগান। বাগানের ওপারে গয়লাপাড়া। সেখানে এসে যখন হিদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল, মনে হল ঘুমন্ত পুরী, কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই। নন্দ দরজায় টোকা মারার আগেই গুলির গলার স্বর শুনতে পেল, কে? নন্দদা?

—হ্যাঁ। গুলি নিকি?

গুলি অন্ধকার ফুঁড়ে বেরুল যেন।

—হ্যাঁ। এলে কী করে এখানে? গাঁ তো পুলিসে ঘিরে ফেলেছে।

—কেন ?

—গোকুল স্যাকরার বাড়িতে নাকি ডাকাতি হবার কথা ছিল, তাই। আমরা বেরুতে পারছি না। চলে এস তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে।

পাশাপাশি অনেকগুলি বাড়ি। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু এবাড়ি ওবাড়ি যাবার রাস্তা আছে। খড় আর গোবরের গন্ধ চারিদিকে। একটি উঠোনে এসে, অন্ধকারে দু' একটি লোকের ছায়া দেখা গেল। উঠোনটি প্রায় জেলখানার চত্বরের মত। চারিদিকেই ঘর বাড়ি। নন্দ একলা হ'লে নিশ্চয় এখানে আসতে পারত না।

অন্ধকার থেকেই চিরঞ্জীবের রুষ্ট গলা শোনা গেল, তুমি আবার এখানে এলে কী করতে ?

নন্দ বলল, তোমার দেরী দেখে। নইলে তো দিদিই আসতে চাচ্ছিল।

চিরঞ্জীব বলল, .এখন কেমন ক'রে যাবে যেও। আমাদের তো তবু একরকম। তোমাকে আজ এ গাঁয়ে পেলে ছাড়বে ভেবেছ ? ডাকাতির খবর পেয়ে সদরের পুলিস সাহেব পর্যন্ত গাঁয়ে এসে লুকিয়ে আছে। এস, ঘরে এস।

অনুমান মিথ্যে হয়নি নন্দর। চিরঞ্জীব ঠিকই বলেছে। কোনো প্রমাণ থাক বা না থাক, আজ নিল্লায় গেলে তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

যে-ঘরে ঢুকল সে চিরঞ্জীবের সঙ্গে, সে ঘরে টিম্‌টিমে আলোয় দু'জন লোক কাজে ব্যস্ত। কাট-কয়লার আগুন জ্বালিয়ে রংঝালাইয়ের কাজ চলেছে। আপাতত যদিও সেটা দুধের টব, আসলে চোলাই মদেরই পাত্র। সোয়া দুই ফুট উঁচু প্রায় তিরিশ সের দুধের টব। টবের নীচে থেকে এক ফুট উঁচুতে আবার টিনের পাত্‌ দিয়ে সীল করা। সেই পাতের ওপর সরু ছিদ্র দিয়ে আগে মদ ঢেলে নিয়েছে। ছিদ্র একেবারে ঝালাই ক'রে বন্ধ। তার ওপরে বাকী সোয়া ফুটের

যতটা ধরে ততটাই দুধ ঢেলে নেওয়া। বোধহয় এখনো এটাই এ-অঞ্চলে শেষতম পন্থা। আবগারি বিভাগের যেটা অনাবিষ্কৃত। কলাপাতা কিংবা বিচুলি ডুবিয়ে বাঁকের দোলায় ছল্‌ছলিয়ে শুধু দুধের টব নিল্লা থেকে চলে যায় নিরাপদে। খোলা টব, তাতে কোনো ঢাকাঢুকি নেই।

এ অঞ্চলের মধ্যে নিল্লা থেকেই সবচেয়ে বেশী দুধ যায় কলকাতায়। নিল্লা স্টেশন থেকে সদর শহরের জংশন স্টেশনে। সেখান থেকে হাওড়ায়, হাওড়া থেকে গন্তব্যে। যেখানে দুধ ঢেলে নিয়ে, ঝালাইয়ের সীল ছিদ্র ক'রে মদ খালাস ক'রে দিতে হবে।

রোজ যায় না। সপ্তাহে তিনদিন নিল্লার দুধের সঙ্গে স্মাগল করে চিরঞ্জীব। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে সব ক'রে যায়। প্রয়োজন হ'লে, ভিন্ন পথে, সদর পর্যন্ত চলে যায়। এক সময়ে সে ভেবেছিল, হাওড়ার ভিতর দিয়ে চালান করবে। কিন্তু এ চোলাইয়ের জগতেও এলাকার সীমানা আছে। সে-সীমানা পরস্পরের মেনে নেওয়াই নিয়ম। না মানলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। চিরঞ্জীব তা চায়নি। নিজের সীমানার মধ্যেই এ নতুন পন্থা তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সে দেখেছিল, দুধের টবগুলি প'ড়ে থাকে, পুলিস তরকারির ঝাঁকা আর বাক্স প্যাঁটরা ঘেঁটে দেখে। দুধের টব যদি কাজে লাগানো যায়, আর সেটা নিল্লার গোয়ালাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায়, তবেই কৃতকার্য।

কৃতকার্য হ'য়েছে চিরঞ্জীব। কিন্তু তার সমস্ত চেহারাটার মধ্যে একটি অতৃপ্তি, একটা বিক্ষোভ কোথায় কী ভাবে ফুটে রয়েছে। চোখের কোলের গভীর পরিখার মধ্যে দৃষ্টিতে যেন আগুনের ধার। একটু লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়, কেমন একটা অশান্ত অস্থিরতা তার মধ্যে। তাকে কৃশ দেখাচ্ছে, তীক্ষ্ণ মনে হ'চ্ছে। বয়সের চেয়েও গম্ভীর ভারী দেখাচ্ছে তাকে। সমাজের এই নীচের গুহা-অন্ধকারেও বোঝা যায়, তার ব্যক্তিত্বের কাছে দলের সকলেই নমিত, আজ্ঞাবহ, ভক্ত। হয়তো ভয়ও পায়।

চিরঞ্জিবকে আজকাল হাসতে দেখা যায় কম। কথা কম শোনা যায় তার মুখ থেকে। যেন রেগে আছে, রুদ্র হয়ে আছে। কখন ফুঁসে উঠবে, গর্জে উঠবে। কেন?

চিরঞ্জীব নিজেও জানে না। অধিকাংশের ধারণা, চিরো এই রকমই। তাই কেউ কিছু বলে না। কিন্তু দুর্গা তো জানে। দুর্গা থেকে থেকে জিজ্ঞেস করে 'কী হয়েছে তোমার?' মাথা নাড়ে চিরঞ্জীব। কিছু নয়। দুর্গার দিকে তাকিয়ে তার চোখের জ্বলনি যায়, শান্ত হয়। একটা ব্যাকুল আবেগে দুর্গাকে বুকে টেনে নেয় সে। যেন অবগাহন করে। দুর্গা যেন অথৈ শীতল জল। চিরঞ্জীব স্নান করে।

তবু, একদিন যে-রাগ ও ঘৃণা নিয়ে সে এপথে এসেছিল, সেই আগুন ক্রমে যেন বাড়তেই থাকে তার। দুর্গা বলে, গুলি যেদিন মার খেয়ে এল, সেদিন থেকে তোমার যেন কী হয়েছে ছোট্‌ঠাকুর। এত রাগছ কেন? এত জ্বলছ কেন?

বলতে পারে না কিছু চিরঞ্জীব। বোঝাতে পারে না ঠিক। কারণ সে নিজে বোঝে না। এর মধ্যে দু'দিন শ্রীধরদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে এখন সব সময় লোকজন থাকে। শ্রীধরদা জ্বলন্ত বিদ্রূপের হাসি নিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন। কথা বলেননি। সঙ্গের লোকেরা বিদ্রূপ ক'রে কথা বলেছে, 'কী হে চোরা শুঁড়ি লীডার, চালান যাচ্ছে কেমন?' নিষ্ঠুর জবাব দিয়েছে চিরঞ্জীব, 'তোমরা যে পরিমাণ টানো, সেই পরিমাণেই চালান হচ্ছে।' কথায় ও জবাবে পরস্পরের চোখে রক্ত উঠে এসেছে। গরম হ'য়ে উঠেছে হাওয়া। যদিও কোনোরকম দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়নি। কিন্তু ইঙ্গিত থেকেছে, নির্বাচনের পরেই চিরঞ্জীবকে তারা টিট্ করবে। আর এও নিশ্চিত, শ্রীধরদাই এবারও নির্বাচিত হবেন।

এই কারণেই কি এত বিক্ষোভ তার? কিন্তু এতো নতুন নয়। আছেই, থাকবেও। কেবল পরস্পরের বিবাদ তীব্র হয়েছে আরো।

এ নয়। আরো কিছু। যেন একটি কোণঠাসা পশুর মরীয়া

হ'য়ে ওঠা, দুর্বার ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করছে তার। চন্দননগরের ড্রাইভার বুধাইদা হলে হয়তো বলতে পারত কিছু। বুধাইয়ের কাছে আর যায় না চিরঞ্জীব। চন্দননগরের সমস্ত পাট সে চুকিয়ে দিয়েছে প্রায়। সেটা এ কাজের সহায় বলেই বোধ হয়। এক পথে, এক ধরনে বেশী দিন চলা উচিত নয়। বুধাইদাকে পেলে হয়তো সে ওই পুরনো কথাটা আবার বলত। চেঁচিয়ে, চীৎকার করে বলত, 'ভাল লাগে না। আমার ভাল লাগছে না।' তার সঙ্গে শুধু একটি কথা নতুন ক'রে যোগ করত, 'কেবল দুর্গাকে ছাড়া। আমি কী জানতুম, দুর্গাকে ছাড়া আমি আর একমুহূর্ত বাঁচতে পারি না। আমি জানতুম না, দুর্গার পরিমণ্ডলের মধ্যে আমার সব মন, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু লাট খাওয়া ঘুড়ির মত পাক খেয়ে মরছিল। দুর্গার সর্বনাশ হবে, এই ভয়ে আমি মিথ্যে লুকিয়েছিলুম। আজ আমি সব ভাল-লাগার বাইরে নিজেকে আবিষ্কার করেছি দুর্গার অন্তরে, তার দেহে, তার রক্তে। কিন্তু আবিষ্কার ক'রে আমার জ্বালা বাড়ল। ওরাই বাড়াল। সমাজের শাসন শৃঙ্খলার চোখরাঙ্গানি, অক্ষম নীতি ও নৈতিকের ধমকানি। না, মাথা নত ক'রে ফিরে যাব না এ সমাজ ও শাসনের কাছে। এ আমার মরণের পণ। আর সে মরণ যেন দুর্গার কোলে শুয়ে হয়। এই এক ছাড়া আর কোনো বাসনা নেই।'

তারপর নিজেরই বলা সেই কথাটি তার মনে হয়, 'একটা ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করে বুধাইদা, প্রলয়ঙ্কর একটা কিছু।'

কপাল থেকে উস্কো খুস্কো চুলগুলি সরিয়ে সিগারেট ধরাল চিরঞ্জীব। অপলক চোখে মদপূর্ণ মস্তবড় টবটার দিকে তাকিয়ে রইল। ইচ্ছে হ'ল গণ্ডুষ ভরে পান ক'রে সমস্ত অনুভূতিটাকে মেরে টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অদ্ভুত অনাসক্তি তার। জীবনে দু' একবার যে না খেয়েছে তা' নয়। একটুও উপভোগ করতে পারেনি, আকর্ষণ অনুভব করেনি।

উঠে বাইরে চলে গেল সে। নন্দর মত সাহসী লোকও দুর্গার ভোর সাড়ে চারটেয় বাইরে যাবার কথাটা বলতে পারল না।

দু' মিনিটের মধ্যেই আবার ঘরে এল চিরঞ্জীব। বলল, বড্ড গন্ধ বেরুচ্ছে। মদ আর ঝালাইয়ের গন্ধ। তাড়াতাড়ি কর।

তারপরে নন্দর দিকে না তাকিয়ে বলল, আজও নাকি কংকাল বেরিয়েছিল গাঁয়ে?

নন্দর মুখে হাসি ফুটল। বলল, খবর পেয়ে গেছ?

—অনেকক্ষণ। কেষ্টা নাকি মরতে মরতে বেঁচে গেছে।

ব'লে চিরঞ্জীব নন্দর চোখের দিকে তাকাল। নন্দ বলল, হ্যাঁ দেখলুম তো, চোখের কোলটা ফুলে উঠেছে। কাঁধে নাকি গাছের ডাল দে' মেরেছে।

যারা টবে মদ ভরে সীল করছিল, তাদের হাতের কাজ বন্ধ হ'য়ে গেল। একজন ব'লে উঠল, সত্যি, কী ব্যাপার বল তো? মনে হলে তো অন্ধকারে ঘরের বার হ'তে পারব না।

নন্দ নির্বিকার গলায় বলল, কংকাল লোক বুঝেই ধরে। তোমাকে আমাকে ধরতে যাবে কেন শুধু শুধু? ওরা নিশ্চয় কিছু পাপ করেছেল।

চিরঞ্জীব তাকিয়েছিল নন্দর মুখের দিকে। চোখাচোখি হ'তে নন্দ একটু হাসল। চিরঞ্জীব বলল, বড় সেয়ানা কংকাল। খুন টুন ক'রে ফেলে শেষটায় না কংকালেরই হাতে কড়া পড়ে।

নন্দর আগেই একজন ব'লে উঠল, কংকালের আবার হাত আছে নাকি যে কড়া পরাবে। কী যে বল তুমি চিরোঠাকুর, তার ঠিক নেই। যে দেখে, সে দেখে, পুলিস কি তাকে দেখতে পাবে নাকি?

আর একজন বলল, শুনেছি অপদেবতাকে বশ মানিয়ে অনেকে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। ওদের দিয়ে মাল এস্‌মাগল করতে পারলে ভাল হ'ত।

চিরঞ্জীবের ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি দেখা গেল। বলল, তা' বটে।

নন্দর দিকে ফিরে বলল, নাও, আর দাঁড়িয়ে কেন? এখন আর যেতে পারছ না। ভোরবেলা যদি পুলিস গাঁ ছেড়ে চলে যায়, তবে একে একে ফিরব সব। ধরা পড়লে, সন্দেহবশত আমাদেরই চালান ক'রে দেবে। এখন ভাবছি, কাউকে ফিরতে না দেখে দুর্গা না এসে উপস্থিত হয়।

তবু নন্দ দুর্গার কথাটা বলতে পারল না। আশঙ্কা হল, বললেই একটা অনর্থ হবে। শুধু বলল, না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলে এসেছি।

চিরঞ্জীব সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, তুমি বুঝিয়েছ আর দুর্গাও বুঝেছে। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।

ব'লে, স্যাণ্ডেলের তলায় সিগারেটের শেষাংশ চেপে দিল। তারপর আপন মনে বলল, আমরা খারাপ, কিন্তু আমার ভয় করে, জানোয়ারেরা কখন দুর্গার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু দুর্গার প্রাণে কিছুমাত্র ভয় নেই। সাড়ে চারটের আগেই বাইরে থেকে দরজার হুড়কো বন্ধ করল সে। রাত্রি এখনো বেশ বড়। মনে হয়, গভীর রাত এখনো। অন্ধকারের সঙ্গে কুয়াশা আরো ঘন হয়েছে। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই।

কয়েক মুহূর্ত দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল দুর্গা। চারদিকে দেখল তীক্ষ্ণ চোখে। দেখে, ঘরের পিছনে জঙ্গলের পথ ধরে নিঃশব্দে এগুল। কিন্তু নিঃশব্দে যাবার উপায় নেই। এর মধ্যেই গাছগুলির পাতা ঝরতে আরম্ভ করেছে। শুকনো পাতার ভিড় পায়ের নীচে। মড়্মড়্ শব্দ হয়। গিরগিটি পতঙ্গ চোখখাবলারা হয়তো চমকায়। শেষ প্রহর ঘোষণা করার আগে শেয়ালেরা ঝোপ ঝাড়ের অন্ধকার থেকে হয়তো তাকিয়ে দেখে দুর্গাকে।

সাত আট মিনিটের মধ্যেই কবিরাজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। পাকা দোতলা বাড়ি, ভাঙা, জীর্ণ। নোনা ইটে শেওলা আর ফাটলে অশ্বত্থের আক্রমণের ছায়ায়, নিঃশব্দে প্রতীক্ষারত শিকারী

নাগের কল্পনা আসে। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। চত্বরটাও জঙ্গলে ভরতি। বাড়ির পিছন দিকে বাগান ছিল এককালে। এখন বিঘে দুয়েক পোড়ো জমি ছাড়া কিছু নেই। গোটা বাড়িসহ বাগান ও পাঁচিল ঘেরা ছিল। এখন পাঁচিল নানান জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। কবিরাজ বাড়ির বাগানের ওষুধি গাছ লতাপাতা বিনাশ হয়েছে অনেক দিন।

দুর্গা প্রথমে বাড়ির পিছন দিকেই গেল। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে, গরুর গাড়িটার ঢোকার কথা বাগানেই। দেখল, গরুর গাড়ি রয়েছে। তৈরীই রয়েছে। ছই-দেওয়া গরুর গাড়ির দুদিকের মুখছাট খালি খোলা।

দোতলার জানালা থেকে মেয়ে গলায় চাপা স্বর ভেসে এল, এই দুগ্‌গা, ওপরে আয়।

বাগানের দিক থেকে ফিরে, বাড়ির পিছনের দরজার কাছে এল দুর্গা। অন্ধকারে দেখা যায় না। কিন্তু দরজার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল সুশীলা, কবিরাজের মেজ মেয়ে।

দুর্গা বলল, গাড়োয়ান কই?

সুশীলা বলল, এই তো, এ ঘরে। চল্ ওপরে চল্, আচি তৈরী আছে।

ভাঙা সিঁড়ি, অচেনা লোকের পক্ষে বিপজ্জনক! দোতলার ঘরের মেঝেরও কোনো কোনো জায়গা টালি খসে বড় গর্ত হ'য়েছে। উঁকি দিয়ে নীচের ঘরের সবই দেখা যায় তাতে। দুর্গার অসুবিধে নেই। এ বাড়ির প্রত্যেকটি আনাচ কানাচ তার নখদর্পণে। কিন্তু গাড়োয়ানটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে হল তার। সুশীলা একলাই গাড়ি আর গাড়োয়ান ঠিক করেছে।

দুর্গা বলল, বাত্তি কোঁথা?

—ওপরে আছে।

সুশীলার সঙ্গে দুর্গা ওপরে গেল। সিঁড়ির শেষে, ওপরে দুদিকে

দুটি ঘর। এক ঘরে কবিরাজমশায় স্বয়ং। অঘোর কবিরাজের পেশাই শুধু নষ্ট হয়নি। এখন প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে মরণের প্রতীক্ষায় আছেন। গৃহিণী সেই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করার জন্যই যেন সর্বক্ষণ আছেন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে। ওই ঘরে কোনোদিন ঢোকেনি দুর্গা। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখেছে। গৃহিণী বেরিয়ে এসে কথা বলেন।

এই সেই বাড়ি, যে-বাড়িতে ভিষকরত্ন, ভিষকশাস্ত্রীর অভাব ছিল না। লোকে বলত ধন্বন্তরীর বাড়ি। যাঁদের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রায় রূপকথার তুল্য ছিল। যাঁদের খেত-খামার বিশেষ ছিল না। কিন্তু খেয়ে না ফুরাবার মত ঐশ্বর্য ছিল। কালের থাবায় এখন শেষ খাবি খাওয়ার পালা চলেছে। মেয়েরা নেমেছে পয়সা রোজগারের অন্ধকার রাস্তায়। তবু আশা আছে, দুই অরক্ষণীয়া মেয়ের একদিন বিয়ে হবে। কবিরাজমশায় মারা গেলে তাঁর শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন হবে। গিন্নি দৌহিত্র নিয়ে আদর করবেন। কারণ পৌত্রের আশা শেষ হয়েছে। পুত্র আর কোনোদিন আসবে না। সে ভীরুটা বউ সুদ্ধ না খেয়ে মরার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

এখনো কবিরাজ গিন্নির সামাজিক ভয় অনেক। মেয়েদের বাইরে যেতে দিতে চাননি। একবার ধরা পড়লে, জানাজানি হ'লে, আর কে বিয়ে করবে ও-মেয়েদের? মেয়েরা যখন সে কথা শোনে, তখন মহাকালের হ'য়ে বোধ হয় তারা নিজেরাই খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে মায়ের মুখের ওপর।

দুর্গা ওপরে এল। টিম্‌টিমে আলোয় দেখল, শাদা বোরখা পরা মূর্তি। শুধু মুখের ঢাকনা খুলে দাঁড়িয়ে আছে অচলা। টিপে টিপে হাসছে।

দুর্গা বলল, বোরখা খোল দেখি, বিবির সাজ ঠিক হ'য়েছে কিনা।

বোরখা খুলে অচলা দাঁড়াল। এরা বুঝি মধ্যবয়সী মেয়ে। ত্রিশের কম নয়। স্বাস্থ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই। শক্ত হাড়সার চেহারা। রংটা ফর্সা। এর মধ্যেই আঁট করে চুল বেঁধেছে। সিঁথিতে দিয়েছে সোনালী রং। চোখে কাজল, কপালে কালো টিপ্। পায়ে

আলতা আর পায়ের পাতায় দুটি আলতার স্বস্তিকা। পায়ের আঙুলে রূপোর আংটি। হাত ভরতি কাঁচের চুড়ি। মুসলমান চাষীর বিবি বলে মানিয়েছে পুরোপুরি।

অচলা বলল, অত দেখছিস কি দুগ্গা? তুই যেন মেয়ে দেখতে এলি?

সুশীলা ব'লে উঠল, ওরে আচি, মা বলছিল, আজ আবার আমাদের দেখতে আসবে।

কথা শেষ হবার আগেই দুই বোন হেসে উঠল খিল্‌খিল্‌ ক'রে।

দুর্গা বলল, চুপ কর তোমরা, বাইরে কেউ শুনতে পাবে।

কিন্তু সুশীলা অচলা চুপ করতে পারে না। চুপ করতে হয়তো চায়, কিন্তু হাসির দমকটা ওদের থামতে চায় না কিছুতেই। সিদ্ধি খাওয়া নেশার মত, হাসি একবার উঠলে রক্ষে নেই। দু' বোনের এ হাসি দেখলে দুর্গা রাগ করতে পারে না। হাসতে গেলেও কোথায় যেন আটকে যায়। এক এক সময় তার সন্দেহ হয়, এরা দুজনেই পাগল হ'য়ে গিয়েছে। এই হাসিটিই মুহূর্তে হিংস্র গর্জনে রূপান্তরিত হ'য়ে, কামড়াকামড়ি মারামারি শুরু করবে হয়তো।

হাসির দমকটা একটু কমলে, অচলা বলল, কখন আসবে বলেছে?

সুশীলা বলল, বিকেলে।

ব'লেই আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিল দুজনে। দুর্গা ব'লে উঠল, দোহাই, বড়দি তুমি আর হেস না। বেরিয়ে পড়। মনে আছে সব কথা?

অচলা বলল, হ্যাঁ। সোয়ামীর সঙ্গে সদরের কোর্টে যাচ্ছি, মামলা আছে। আমি একজন সাক্ষী। নাম আনোরা বিবি। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে দাঙ্গা হয়েছিল, আমি তার সাক্ষী। হয়েছে?

দুর্গা বলল, হ্যাঁ, কিন্তু যাচ্ছ কোথা?

—চন্দননগরে, ইষ্টিশনের পুবে, মুরারীবাগানের তিলি পাড়ায়—থতিয়ে গেল অচলা। বলল, কী যেন সেই বুড়ীর নাম? খালি

সেই লোকটার নামই মনে পড়ে, জগদীশ পাল। মা গো! আমাকে দেখেও লোকটা মাইরি রাক্ষসের মত তাকিয়ে থাকে।

পুরুষেরা তার দিকে তাকালে অচলা এখন অবাক হয়। হাসি পায় তার।

দুর্গা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, তাকে থাকলে ক্ষতি নাইকো। কিন্তুন কথা টথা যেন বলতে যেও না। আগে পাগল ছিল লোকটা। ওই বুড়ী ভগবতীরই ছেলে ওটা।

অচলা বলল, ভগবতী, হ্যাঁ, ভগবতী বুড়ীর বাড়ি।

দুর্গা বলল, হ্যাঁ, সেখেনে জিনিস খালাস ক'রে, জামা কাপড় বদলে, মুখ মাথা ঘষে, রেলগাড়িতে ক'রে চলে এস। গাড়োয়ানটাকে একলা পাট্‌ঠে দিও, বুঝলে?

অচলা চোখ পাকিয়ে, ভ্রূ কুঁচকে বলল, গাড়োয়ান বলছিস কেন লো। আমি আনোরা বিবি আর ও ফকির আলী না? আমার সায়েব তো!

এবার তিনজনেই হেসে উঠল। এই পুরনো ভাড়া বাড়িটার অভ্যন্তরে যেন প্রেতিনীরা হাসছে। মাঘের কুয়াশা-ঘন শেষ-রাতের বদ্ধ বাতাসে এ হাসির কোনো মুক্তি নেই।

দুর্গা বলল, তা' তোমার ফকির আলীকে একবারটি ডাক দেখি।

অচলা বলল, যা সুশী, ডেকে নিয়ে আয়।

সুশীলা আলোটা নিয়ে নীচে নেমে গেল। দুর্গা বলল, তোমাদের চেনা লোক তো?

অচলা হাসতে হাসতেই বলল, ওর বাবা ঠাকুর্দাকে সুদ্ধ চিনি।

—ওর নিজেরই গাড়ি?

—হ্যাঁ।

—ভেঙ্গে বলেছ সব?

—বলেছি। লোকটা ভীতু একেবারে। খালি বলে 'পারব না

ঠাকরুণ।' বলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মানে, বিশ্বাস করতে পারছিল না, সে এক কারণ। এদিকে কবরেজ বাড়ির মেয়ে, পেছুতেও পারছিল না। সাতদিন ঘোরাঘুরি ক'রে রাজী হয়েছে। তবে ওই, মুখের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থাকে। কেন বল্ তো, এখনো তাকিয়ে থাকবার কী আছে?

সে জবাবের আগেই, টিমটিমে আলোয়, সুশীলার পিছনে ফকির আলীকে দেখা গেল। নিরীহ চেহারা। কালো, লম্বা, অচলারই বয়সী হবে। মাথায় ছোট ছোট চুল, চিবুকে কিছু কালো দাড়ি। একটি জামা, আর গামছাখানি মাফলারের মত গলায় বাঁধা।

অচলা বলল, এই দেখ আমার —

বলেই হেসে উঠল। ফকির আলী দুর্গাকে দেখল একবার। তারপরে, তিনটি মেয়ের সামনে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুই চোখে অপরিসীম বিস্ময়। তার সঙ্গে ভয়ও আছে।

দুর্গা জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কোথা?

ফকির আলী মাথা নীচু করেই বলল, বড়া।

—পারবে তো?

ফকির আলী ঘাড় কাৎ করল।

—আচ্ছা যাও, নীচে গে' বস।

ফকির আলী চলে যাবার পর দুর্গা বলল, ভালই তো মনে হচ্ছে।

অচলা বলল, বড় মুখচোরা। কথা বলতে পারে না। ওদিকে তোর যা দুই পাণ্ডা আছে ভোলা আর কেষ্টা। একটা মাছিও ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গাঁ থেকে বেরুতে পারে না।

দুর্গা বলল, কেষ্টা আজ বোধহয় থাকবে না। কংকাল বেরিয়েছিল কাল রাতে —

অচলা সুশীলা দুজনেই হামলে পড়ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। মাইরি, গা'য়ে কাঁটা দেয়। তোদের পাড়ার দিকেই নাকি দেখা গেছে?

—হ্যাঁ। কেষ্টাকে ধরেছিল। মেরেছে খুব।

সুশীলা বলল, ভূতের মার খেয়েও বেঁচে আছে?

দুর্গা হেসে উঠল। বলল, তোমাদের কি ভয় করছে নিকি গো মেজদি?

সুশীলা প্রায় ভীত গলায় বলল, কী বলিস লো দুর্গা, ভয় করে না? অমন জ্যান্ত কংকালের কথা কেউ কখনো শুনেছে?

বোঝা গেল, দলের অনেকের কাছেই কংকালের রহস্য গোপন আছে। দুর্গা গম্ভীর হ'য়ে বলল, ভাবছি মেজদি, কংকালটাকে আমি পুষব।

সুশীলা বলল, কংকাল পুষবি?

অচলা এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল দুর্গার মুখের দিকে। এবার দুর্গার চিবুকে হাত দিয়ে, মুখ তুলে ধরে বলল, ব্যাপার কী বল্ তো?

দুর্গা হেসে উঠে বলল, কী আবার। জ্যান্ত কংকাল পুষব।

অচলা বলল, এখনো পোষা আছে বল্।

দুর্গা হেসে উঠল। অচলা চেপে ধরল, বল্ দুর্গা, কী ব্যাপার?

দুর্গা বলল, পরে বলব। এখন বেরিয়ে পড়। জিনিসপত্র গাড়িতে সব তোলা হয়েছে?

—গাড়িতে বিচুলি তলায় দিয়ে একেবারে বিছানা পেতে ফেলা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে অচলা থেমে বলল, সুশী, কখন দেখতে আসবে বলেছিলি?

—বিকেলে।

অচলা দুর্গার দিকে ফিরে বলল, আজ আমাকে আট আনা পয়সা ফাউ দিতে হ'বে দুগ্গা।

—কেন?

—যে মিনসেরা আসবে দেখতে, তারা এ গাঁয়ের পাঁচু ময়রার খাবার না খেয়ে বিদেয় হবে নাকি? খেতেই তো আসে।

আবার একটা হাসির চাপা উদ্দাম ফেটে পড়ল। তারপর তিনজনেই, নীচে নেমে এল। পুবের আকাশ প্রায় ফরসা হ'য়ে এসেছে। ফকির আলী ছইয়ের পিছনের মুখছাট বেঁধে দিল। সামনে একটা শাড়ি ঝুলিয়ে দিল তু' ভাজ ক'রে। অচলা ভিতরে গিয়ে বসল।

তুর্গা বলল ফকির আলীকে, আগে রেল-গেট পার হবে। তা' পরে সোজা উত্তরের রাস্তা ধরে যাবে।

ফকির আলী বলল, জানি।

গাড়ি বেরিয়ে গেল ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে। ঘুরে গিয়ে, রাস্তায় পড়বে। সুশীলা বলল, তুই চলে যাচ্ছিস তুগ্‌গা?

তুর্গা বলল, হ্যাঁ, বনের মধ্যে দে' আমি রেল লাইন তক্ দেখে আসি।

তুর্গা সামনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল। প্রথমে এল বাড়িতে। চিরঞ্জীবেরা কেউ ফেরেনি এখানে। যে-পথে ন্যাড়া কালীতলায় যায়, সেই পথে হেঁটে গেল সে। অন্ধকারের চেয়ে কুয়াশা বেশী। খানিকদূর গিয়ে, স্টেশনের কাছে, ভাঙ্গা শিবমন্দিরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে স্টেশন দেখা যায়। গরুর গাড়ির রাস্তাটাও সামনেই। কিন্তু কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না।

তুর্গা পায়ে পায়ে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল। স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে গেল স্টেশনের দিকে। সব্‌জীর গাড়িগুলি ইতিমধ্যেই স্টেশনের চত্বরে ভিড় করেছে।

সোজা স্টেশনে না গিয়ে, বাঁ দিকে, হাটের হাঁড়ি কলসীর দোকানগুলির ভিতর গলি দিয়ে এগিয়ে গেল। দোকানগুলির শেষে যেখানে দামেভরা ময়লা পুকুরটা দেখা যায়, সেখান থেকে রেল-গেটটা চোখে পড়ে।

দোকানীরা এখনো জাগেনি কেউ। জাগবার কথাও নয়। শীতের ভোর একটু দেরীতেই হয়। পুকুরের ধারে যেতে না যেতেই চোখে পড়ল ফকির আলীর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা দেখে চমকে উঠল দুর্গার বুকের মধ্যে। পরমুহূর্তেই চোখে পড়ল ভোলাকে। গাড়িটা প্রদক্ষিণ করছে সে। দুর্গা দোকানের আড়াল নিল।

অখিলবাবু এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে গাড়ি?

ফকির আলী বলল, কোর্টে।

—কোর্টে?

—এঁজ্ঞে মকরদমা আছে।

—গাড়িতে কী আছে?

—এঁজ্ঞে মেয়েছেলে আছে, মকরদমার সাক্ষী।

অভাবনীয় নতুন কিছু ব্যাপার নয়। রেলগাড়িতে যাওয়ার চেয়ে, সচরাচর কৃষকদের সোজা গরুরগাড়ি নিয়েই যেতে দেখা যায়।

অখিলবাবু বললেন, হুঁ। খুব সকাল সকাল বেরিয়েছ দেখছি।

দুর্গা দেখল, ভোলা নাকের পাটা ফুলিয়েছে। গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে। নেকড়ের মত তাকিয়ে আছে ফকির আলীর মুখের দিকে।

ফকির আলী বলল, তা বাবু জানোয়ারের মর্জির ওপর যাওয়া। উকীলবাবু বলে দিছেন, দশটার মধ্যে হাজির হ'তে।

অখিলবাবু বললেন, যাও।

গাড়ি এগিয়ে গেল।

ভোলা বলল, গাড়ির ভেতরখান দেখলেন না ছোটবাবু?

অখিলবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, তোর তো ওই এক চিন্তা, বাঁকার মেয়ে আছে কি না দেখবি। তা সব কিছুর একটা সম্ভব অসম্ভব আছে তো।

ভোলা বলল, দুগ্‌গার কাছে কিছু অসম্ভব লয় ছোটবাবু।

রাত্রি জাগা ফোলা ফোলা মুখ অখিলবাবুর। একটা সিগারেট ধরিয়ে দমকা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তাই তো এ্যাদ্দিন ধরে বলছিস। ছুঁড়িকে ঘায়েল তো করতে পারলিনে। তার ওপরে এখন আবার ভূতের ভয় হয়েছে।

ভোলা বলল, বড়বাবু বলে, ও ভূতটা দুগ্‌গার দূত। আমারো তাই মনে লেয় ছোটবাবু।

—কেন ?

—কী জানি ছোটবাবু, আমারো মনে লেয়। দুগ্‌গা নিশ্চয় কিছু জানে ও বিষয়ে। সত্যি কি অমন ভূত হতে পারে ?

—তবে তখন ভয় পেয়েছিলি কেন ?

ভোলা চুপ করে রইল। বোঝা গেল, দুজনেই ফিরে চলেছে স্টেশনের দিকে। অখিলবাবুর বিরক্ত গলা শোনা গেল। বল্ না, তখন ভয় পেয়েছিলি কেন ?

ভোলার জবাব শোনা গেল না। দুর্গা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। ভাবল, দোকানীরা উঠে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কিছু ভাববে। সে আর একটা গলি দিয়ে, হাটের মধ্যে চলে এল। নিঃশব্দ ফাঁকা চালা ঘর। কোনটারই ঝাঁপ নেই। মনিহারি কাপড় আর মুদী দোকানগুলি বন্ধ। দুর্গা নিশ্চিত ছিল, ভোলা আর অখিলবাবু স্টেশনে গিয়েছে। এ সময়ে সবজীর ঝাঁকাগুলি দেখবে ওরা।

সে তে-তেঁতুলের তলা দিয়ে রাস্তার দিকে এগুল। হাটের মধ্যে তিনটি বড় বড় তেঁতুল গাছ পাশাপাশি রয়েছে যেখানটায়, সেটাই তেঁতুলতলা।

কিন্তু রাস্তার ওপর পড়তেই থম্‌কে গেল দুর্গা। কয়েক হাত আগেই ভোলা। বোধহয় অফিসে ফিরে যাচ্ছিল। ভোলা ফিরে তাকাল। তাকিয়েই, সোজা একেবারে দুর্গার গায়ের কাছে এসে পড়ল।

—দুগ্‌গা না?

দুর্গা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছ না? রাস্তা আটকে গায়ের ওপর কেন? পথ ছাড়।

এই প্রথম ভোলা দুর্গার হুকুম মানল না। কেমন একটা অস্বাভাবিক গলায় বলল, পথ তো বরাবরই ছেড়ে দিই। আটকে রাখতে পারি না কোনদিন। তা এ ঠাণ্ডায় এত ভোরে কোথা গেছলে?

দুর্গা বলল, যেখানেই হোক, তোমাকে বলতে যাব কেন? সরে দাঁড়াও।

বেশ চেঁচিয়েই বলল দুর্গা। রাস্তাটা এখনো ফাঁকা। যদিও অদূরে স্টেশনের কাছেই লোকজন কেউ কেউ আছে। দু' একটা চায়ের দোকানও খুলেছে। অখিলবাবু স্টেশনেই রয়ে গেছেন।

ভোলা হেসে উঠল গুঙিয়ে গুঙিয়ে। তার নিশ্বাস লাগল দুর্গার গায়ে। যেন গোঁ ধরা শান্ত ভাবে বলল, সরেই তো আছি।

তার কথা শেষ হবার আগেই দুর্গা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, তুই সরবি? হকচকিয়ে গেল এবার, সরতে হল ভোলাকে। দুর্গার গলার স্বর যেন কেটে বসে গেল তার চামড়ায়। যেন সম্বিত ফিরে পেল ভোলা।

কিন্তু দুর্গার চোখে দপদপে আগুন। সে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আবার বলল, বড় যে মরণ বাড় দেখছি, অ্যাঁ?

ভোলার লাল চোখ দুটি অপলক। দুর্গার দেহের দিকে তার দৃষ্টি। স্বরহীন গলায় বলল, আমার মরণ বাড় আজ দেখলে? মরণের সোমায়টা কবে আসবে, তাই ভাবি।

দুর্গার হাত তখন কোমরের আঁচলে ঢাকা পড়েছে। বলল, দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে আর বেশী দেরী নাইকো। মরার বড় সাধ দেখছি?

ব'লে দুর্গা পায়ে পায়ে অগ্রসর হল। পিছনে ভোলা যেন

একটা কিংকর্তব্য শুয়োরের মত দাঁড়িয়ে রইল। গলার স্বরটা তার চড়ল না। প্রায় আপন মনেই বলল, হঁ দুগ্‌গা, মরার সাধ অনেক-দিনের হে।

দুর্গা ততক্ষণে অনেক দূর। ভোলা যেন মাতালের মত টলতে লাগল দাঁড়িয়ে। দুর্গার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে, সে আবার উল্টো দিকে ফিরে, স্টেশনের পথে গেল। কেষ্ট কাঁধের ব্যথা নিয়ে ওখানেই আছে। ওকে বলতে হবে। ছোটবাবু আর কাসেমকে বলতে হবে।

বলতে হবে, তবু তার রক্ত যেন কী একটা নেশায় দাপাতে লাগল। অথচ নেশার খোয়ারীতে যেন নিঝুম হ'য়ে যেতে লাগল সে।

অপরাহ্ণের আকাশ জুড়ে, কথাগুলি লাউডস্পীকারে উচ্চারিত হচ্ছিল। মাঘের শেষের বাতাসে ভর ক'রে ছড়িয়ে পড়ছিল সারা গ্রামে। 'মায়ের ওপর পুত্রের অধিকারের মতই জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে হবে। জমির ওপরে তার বর্তমান মালিকানা বজায় চাই, ফসলের ন্যায্য দর চাই, অন্যায় ট্যাকস্‌-এর বোঝা থেকে মুক্তি চাই। না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই থামবে না।'

কণ্ঠস্বর চেনা। বারোয়ারীতলার সভায়, শ্রীধরদা বলছিলেন। দুর্গার দাওয়ায় ব'সে কেমন যেন বিহ্বলভাবে কথাগুলি শুনছিল চিরঞ্জীব। আর দুর্গা ঘরের ভিতর থেকে দেখছিল ছোট্‌ঠাকুরকে। নিল্লায় যাবে ব'লে উঠতে যাচ্ছিল সে। সেই সময়েই কথাগুলি ভেসে এল। চিরঞ্জীব যেন অবাক হ'য়ে গেল। থতিয়ে গেল, থম্‌কে বসে রইল। যাত্রাদলের সেই বিবেকের গান শোনা রাজার মত।

চিরঞ্জীব নিজেও জানে না, কেন সহসা তার পদক্ষেপ স্তব্ধ হল। হয়তো, কেউ তার সামনে থাকলে, কারুর সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলে, হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হত না সে। দুর্গাও ঘরে ছিল।

কিছুক্ষণ আগেই দুর্গার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তার। কারণ, সে টের পেয়েছে দুর্গা তার বারণ মানে নি। লুকিয়ে কবিরাজের মেয়েদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। চিরঞ্জীব বুঝতে পারে, যে আগুনে সে জ্বলছে, সেই আগুনেই জ্বলছে দুর্গা। তাই দুর্গা স্থির থাকতে পারে না। সে বলে, 'তবে আমাকে তোমার সঙ্গে নে' চল ছোট্‌ঠাকুর। ঘরে বসে আমি থাকতে পারি না।' দুর্গা নিল্লায় যেতে চায়। সঙ্গে থাকতে চায়। চিরঞ্জীব জানে, যদি সে নিজে ঘরে থাকত, তবে দুর্গাও থাকতে পারত। জীবনের খুঁটিটা যেখানে পোঁতার কথা ছিল দুর্গার, সেখানে পোঁতা হয়নি। তাই, এক সময়ে বাপের চলে যাওয়ায় বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আজ, একজন চলে গেলে তার ঘরে বাইরের সব ঘর খা খা করে। জ্বলতে থাকে, আর সর্বনাশে মেতে যায়।

কিন্তু কোনোদিন কোনো কারণে তো বুকের মধ্যে কাঁপেনি চিরঞ্জীবের? দুর্গার বেলায় কেন এত দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে রাখে তাকে? যত আচ্ছন্ন হয়, তত রাগ হয় তার। দুর্গাকে সে থামিয়ে রাখতে চায়

দুর্গা বলেছিল, তবে আমাকে নিয়ে চল নিল্লায়।

সে কথার কোনো জবাব দেয়নি চিরঞ্জীব। সে রাগ ক'রে ঘরের বাইরে এসে বসেছিল গুম্ হ'য়ে। যে-মুহূর্তে উঠতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তেই কথাগুলি ভেসে এল।—'সমবেত ভদ্রমণ্ডলী' কৃষিজীবি বন্ধুগণ'—

থেমে গেল চিরঞ্জীব। কথাগুলি শুনতে শুনতে সে যেন তার পূর্বজন্মের কোনো এক পরিত্যক্ত দূরলোকে ফিরে গেল। তার ঠোঁট নড়ে উঠল। সে নিঃশব্দে উচ্চারণ করল, 'সামন্তপ্রথা' 'লড়াই' 'চাষীর হাতে জমি' 'আমাদের জয়'……। এমনি একটা ঘোরের মধ্যেই এক সময়ে দিদির চেহারাটা ভেসে উঠল তার সামনে। আর সেই মুহূর্তেই তার তীব্র ঘূর্ণিলাগা চেতনার মধ্যে, তীরের মত এসে

বিঁধল মাইকের বজ্রনির্ঘোষ, 'এ প্রায় বাতুলের প্রলাপ যে, দু'একজন অসামাজিক বে-আইনি মদ চোলাইকর শয়তানকে শায়েস্তা করার জন্য, গ্রামের মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করতে হয়। আবগারি বিভাগ এবং থানার থেকে এ কথাই বলা হয়েছে। তার চেয়ে আশ্চর্য, গ্রামবাসী নাকি কংকাল ভূতের ভয়ে জড়সড় হ'য়ে আছেন, আর সেই ভূতকে ধরার জন্য গ্রামে সশস্ত্র পুলিস টহল দিচ্ছে। এ কংকালের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। যদি কেউ ভয় দেখিয়ে থাকে আমি বলব, পুলিশকে আমন্ত্রণ করার জন্যেই সে এ কাজ করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন, এ সময়ে সশস্ত্র পুলিশের যখন তখন গ্রামে টহল দেওয়ায় লোকে ভয় পাচ্ছে। পুলিশ এ মুহূর্তে উঠিয়ে নিতে হবে। যদি কোনো বে-আইনি চোলাইকর এ সবে লিপ্ত থাকে সেই সাধারণ মানুষের ও কৃষকের শত্রুকে গ্রামবাসীরা ধরে শাস্তি দিন। তাকে গ্রামছাড়া করুন, দলবলসহ তাদের ধরিয়ে দিন।'...

ধনুকের মত বেঁকে উঠল চিরঞ্জীবের ঠোঁট। সে কল্পনা করতে পারছে, শ্রীধরদার চোখে এখন কার মূর্তি ভাসছে। কে সেই শয়তান, অসামাজিক, সাধারণ মানুষ ও কৃষকের শত্রু। সে আপন মনেই বিদ্রূপ ক'রে ব'লে উঠল, সাধারণ মানুষ! গ্রামবাসী! কৃষক! শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর।

অবশ্য একথা ঠিক, থানা থেকে নতুন কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ আনা হয়েছে। আবগারির যারা ছিল, তারা আর এরা মিলে, দিনে রাত্রে পাহারা দিচ্ছে। যদিও দিনের চেয়ে রাত্রেই বেশী। আর কংকালের ব্যাপারটা বহুদূর অবধি রটনা হয়েছে। খবরের কাগজে পর্যন্ত সংবাদ গিয়েছে, 'হুগলি জেলার গ্রামে ভূতের উপদ্রব (?)' 'জীবন্ত কঙ্কাল!' কয়েকদিন ধরেই হরিসংকীর্তনও হ'য়ে গেল। কিন্তু কংকালকে আর দেখা যায়নি।

চিরঞ্জীবের চোখের ওপর থেকে মুহূর্তে অপসারিত হল অতীতের সেই দূরলোক। চকিতে ডুবে গেল ঘূর্ণির গহনে। সে উঠে

দাঁড়াল। মনে মনে বলল, সেই একই কথা। সেই সৎ সাধারণ মানুষ, তারা বলিষ্ঠ। তারা পাপী নয়। তাদের কোনোদিন দরজা বন্ধ ঘরে, চিরঞ্জীব বাঁড়ুজ্জেকে ধরে মারার মত মারা যায় না।...

সে দাওয়া থেকে নেমে আবার থম্‌কে দাঁড়াল। বাগ্‌দিপাড়ার রাস্তা যদিও খুব সরু নয়, তবু এই বোধহয় প্রথম জীপগাড়ির গর্জন শোনা গেল পাড়ায়। আর গাড়িটা এসে ব্রেক কষল এ বাড়িরই চিতে-বেড়ার ধারে। গাড়িটার সামনে শ্রীধরদা'দের দলের নিশান। একটা মোটা গলার ডাক ভেসে এল, চিরো আছ নাকি?

বলতে বলতেই, দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরা, বুধাইয়ের সহাস্য মুখ ভেসে উঠল বেড়ার উপর দিয়ে। চিরঞ্জীব অবাক হ'য়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল তুমি?

বুধাই একেবারে কাছে চলে এল চিরঞ্জীবের। হেসে বলল, খুব অবাক হয়ে গেছো তো? আরে ভাই, আসতেই পারি না। দেখলাম শ্রীধরদা ব্যস্ত আছেন, দিলাম চম্পট। জানলে তো আর তোমার এখানে আসতে দেবেন না। তারপর খবর কি বল।

চিরঞ্জীব কৌতূহল দমন করে, নিরাসক্ত গলায় বলল, খবর ভাল। কিন্তু শ্রীধরবাবু রাগ করবেন জেনেও এলে যে?

বুধাই হাত উল্টে দিয়ে বলল, তা কি করব। একটা অন্যায় ক'রে ফেললাম। বকেন, বকুনি শুনব।

—কিন্তু আমি একটা শয়তান। অসামাজিক—

বুধাই ব'লে উঠল, ওসব আমি জানি টানি না চিরো। সে আমি শ্রীধরদাকেও বলে দিয়েছি, ও-ছেলেকে আমি মন থেকে ছাড়তে পারব না।

বলতে বলতেই তার চোখ পড়ল দুর্গার দিকে। দুর্গা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এক-সময়ে বুধাই প্রায়ই আসত এখানে। আলাপ পরিচয় ছিলই। তা ছাড়া দুর্গার ভাল লাগত বুধাইকে।

চোখাচোখি হতে, গদাই যেন হকচকিয়ে গেল। অবাক হ'ল। বলল, ভাল আছ?

দুর্গা বলল, আছি। দাঁড়িয়ে কেন, বস বুধাইদা। অমন তাক্‌কে রইলে যে?

বুধাই বলল, কী জানি ভাই, তোমাকে যেন কেমন একটু নতুন নতুন লাগছে। কী হয়েছে বল তো?

ব'লে বুধাই দুর্গা আর চিরঞ্জীব, দুজনের দিকেই তাকাল। চিরঞ্জীব অস্বস্তি বোধ করল। দুর্গা লজ্জা পেল। কেন কিছু বোঝা গেল না। বুধাই যেন আর একটু পরিষ্কার করল। দুর্গার দিকে তাকিয়ে বলল, বেড়ে চেহারাটি করেছ। আগের থেকে তোমাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

লাউডস্পীকারে বক্তৃতা তখনো সমান তালে চলেছে। বুধাই দাওয়ায় উঠে বসল। কিন্তু এ বুধাই সে বুধাই নয়। এ বুধাই সেই পুরোনো গদাইলস্করি চালের লোক নয়। একটু বেশী নড়া-চড়া করছে। কথা বলছে বেশী, স্বরও উচ্চ।

চিরঞ্জীবের ঠোঁটে বক্রতাটুকু ছিলই। বলল, তারপর? তুমি হঠাৎ এ লাইনে কী করে?

বুধাই বলল, আর বল কেন, মনের কলে। লোকে বলে, ভগবানের কলকাটিতে। আসলে তো ওটা মনের কলকাটি। নেমে পড়লাম একদিন।

—কী রকম?

বুধাই বলল, ওই রকম। বসেছিলাম চুপচাপ। গাড়ি চালান একদম বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম।

চিরঞ্জীব বলল, সে তো জানি। আমি যাওবা দু' একবার ওদিকে কাজের চেষ্টা করেছি, তুমি গাড়ি চালাবে না বলে দিলে।

—আরে সেকি শুধু তুমি নাকি। ও লাইনের সবাই এসে ধরাধরি করতে লাগল। ধু-র। তারপরে একদিন জটা এসে উপস্থিত।

ওঁয়ার মাল নিয়ে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বলে দিলুম গাড়িটাড়ি চালাই না আর। তা বলে কি, 'চিরোর বেলায় তো এসব বল না, তখন তো ঠিক চালাও।' ব্যস, রাগ হ'য়ে গেল। বললাম, 'তোমার সঙ্গে চিরোর তুলনা? মর্জি হয়েছিল, তাই চালিয়েছিলাম। তোমারটা চালাতে যাব কেন? তুমি তো চিরোর এঁটো হে।' খুব রাগারাগি। সে তড়পানি দেখে কে? বলে দিলাম, 'যা যা, মিছামিছি চটাসনি। মান নিয়ে পালা।'

বলে বুধাই হাসল। আবার মুখটা বিকৃত ক'রে বলল, জটার খবর জান তো? সেই মেয়েটি, কী নাম?

চিরঞ্জীব বলল, বীণা।

—হ্যাঁ, বীণা। সে তো কোন্ হাসপাতালে যেন ছিল। একটা মরা বাচ্চা বেরিয়েছিল পেট থেকে। চেহারাটি হয়েছে এখন বেশ্যো কাট। ঘর নিয়েছে একটা বড় রাস্তার ওপরেই, দোতলায়, কেষ্টবালা বাড়িয়ালীর বাড়িতে। বয়সে এখনো ছেলেমানুষ, ও-মেয়ে বেশীদিন ধকল সইতে পারবে না। তার ওপরে জটার অত্যাচার তো আছেই। রোজ গিয়ে হামলা করে বীণার কাছে, পয়সা দাও। মাঝে জটা কিছুদিন জেলও খেটেছে, তাও চুরির দায়ে। এখন দেখি একখানি লুঙ্গি আর ছেঁড়া জামা সম্বল। কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না। তবে বাবা, মেয়েমানুষের কিছু বুঝলাম না আজ অবদি। ঝগড়া করুক, লোকজন ডেকে বিদায় করুক, গালাগাল দিক, তবু ওই বীণাই বোধহয় এখন খাওয়াচ্ছে জটাকে।

দুর্গা বলে উঠল, পড়ত তেমন মেয়ের পাল্লায়—

বুধাই হেসে উঠল হো হো ক'রে। বলল, ও ভাই তোমাদের মুখ মন বোঝা দায়। বলতে নেই, জটার বেলায় এরকম বলছ, চিরোর বেলায় এই তুমিই হয়তো অন্যরকম বলতে। হা হা হা···।

দুর্গা সহসা জবাব দিতে পারল না।

বলল, যাক্। জটার তা হলে এই হাল। কিন্তু তোমার কথাটা তো শেষ হল না।

বুধাই বলল, হ্যাঁ সেইটেই বলি। হঠাৎ একদিন পীতাম্বর ডাক্তার দলবল নিয়ে হাজির। পীতাম্বর ডাক্তারকে চেন তো? লীডার হে, লীডার। এম.এল.এ. সেই মস্তবড় বাড়ি, ইঁটকাঠের গোলাওয়ালা, নিত্যি নতুন গাড়ি হাঁকে। সেই যে ননী হালদারকে বড় কণ্ট্রাক্ট পাইয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল, সব বে-নামী ব্যাপার—

চিরঞ্জীব মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি। তার চেয়ে বল না কেন, যার ভাইয়ের গাড়িতে একবার মেলাই বে-আইনি বিদেশী মাল পাওয়া গেছল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পীতে ডাক্তার। এসে একদিন বললে, 'বুধাই গাড়ি চালাতে হবে। ইলেকশন্ এসে পড়েছে, এবার তোমাকে সাহায্য করতে হবে।' মাইরি, কী বলব তোমাকে চিরো, মনে হল ভগবান আমার পেছনে লেগেছে, সত্যি। সেই যেমন পাগলকে ছেলেমানুষে খোঁচায় সেই রকম। কদিন থেকেই মন মেজাজ খারাপ ছিল। গাড়ি চালাবার কথা ভাবলে ঘেন্না হচ্ছিল। ভাবছিলাম, কোনো একটা ধান্দা নিয়ে বেরুতে হবে। কিন্তু ওই স্টিয়ারিং হুইল? ছোঁব না। আরে? গাড়ি চালাতে শিখেছি ব'লে আমাকে খালি ওই করতে হবে? তার ওপর পীতে ডাক্তারকে দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। বলে দিলাম, 'গাড়ি আর চালাই না ডাক্তারবাবু।' সে ছাড়বে না কিছুতেই। কেন, কী বিত্তান্ত, সাত সতর কথা। মোটা টাকা মাইনে দেবে। আখের দেখালে। যত বলে, ততই, (হেস না যেন) কেবলি আমার মনে হ'তে লাগল, কে যেন আমার পেছনে ব'সে হাসছে। তার কোনো শরীর নাই। একটা মাখন মাখন ফোলা ফোলা মুখ, লাল্‌চে রোঁয়াওলা গোঁফ, আর ময়লা হলদে দাঁত। খুব হাসছে। তারপর

রেগে বলে দিলাম, 'কেন বিরক্ত করছেন মশাই। দেশে ডেরাইভারের অভাব আছে নাকি? দেখে নিন্ গে না।' চলে গেল। যেন রাজরোষ দেখিয়ে গেল। কিন্তু আমার মাথা থেকে সেই গা-জ্বালানে হাসি যায় না। সারা রাত যেন আমাকে নিয়ে খেলা জুড়ে দিলে। কে এটা? কে?

চিরঞ্জীব আর দুর্গা অবাক হয়ে বুধাইয়ের মুখে রেখার খেলা দেখছিল আর শুনছিল। যেন রাগে ফুঁসছে বুধাই।

বুধাই বলে চলেছে, ও! ওই মুখটা আমাকে ভগবানগিরি দেখাচ্ছে? নিয়তিপনা ফলান হচ্ছে? তোমার ওই কথাটা মনে পড়ল। সেই, 'একটা ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড করতে ইচ্ছে হয় বুধাইদা।' তা চিরো, সত্যি বলি, তোমার মত বুকের আগুন তো আমার নেই। সকাল বেলাই ঘুম থেকে উঠে, পীতে ডাক্তারের বিরুদ্ধে যে আছে, ধীরেন চ্যাটার্জি, চলে গেলাম তাঁর কাছে। চেনেন তো আগে থেকেই। উনিও তো ডাক্তার, ভাবলেন অসুখ করেছে। বললেন, 'সাত সকালেই যে? অসুখ কার?' বললাম, 'আমার।'
'কী অসুখ?' বললাম, 'কাল ব্যাধি ডাক্তারবাবু। গাড়ি চালাতে চাই।' বললেন, 'গাড়ি? আমার তো গাড়ি নেই।' বললাম, 'না তা' নয়। ইলেকশনে গাড়ি চালাব আপনাদের। পয়সাকড়ি লাগবে না। দু'বেলা দুটো খেতে দিলেই হবে।' ডাক্তারবাবু মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন, 'শুনেছিলাম, তোমার মাথার ঠিক নেই, গাড়ি চালাতেই চাও না। তা' কি হ'ল হঠাৎ?' বললাম, 'তা' জানি না। রাতভর ভাবলাম, তারপরে ঠিক করলাম গাড়ি যদি চালাতেই হয়, মন যেখেনে যায় সেখেনেই যাব।' ডাক্তারবাবু কী যেন ভাবলেন। তারপরে বললেন, 'আমাদের এখানে তো লোক আছে। তোমাকে আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। নিয়ে যাও। সেখানে তোমাকে কাজ দেবে।' তারপরেই তো এখানে এলাম। তাও মাস খানেক হয়ে গেল।

চিরঞ্জীব প্রায় শূন্য চোখে তাকিয়েছিল বুধাইয়ের মুখের দিকে। দুর্গা তাকিয়ে রইল অবোধ চোখে। বুধাই উঠে দাঁড়াল। লাউড-স্পীকারে অপরের বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে এখন।

চিরঞ্জীব বলল, কিন্তু বুধাইদা এ তো এখানকার হাল। ভোটের পর হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। তখন কী করবে?

বুধাই বলল, আরে এটা তো শুরু। শেষ কী হবে, আমি কি জানি?

পরমুহূর্তেই তার গলার স্বরটা মোটা আর চাপা শোনাল। প্রায় চুপি চুপি বলল, আমি কি লেখাপড়া জানি তোমাদের মত? আমি খালি বুঝছি একটা ভাঙচুর দরকার, এই সোঁত জীবনটারই একটা ভাঙচুর হওয়া দরকার। ভেঙে, একটা মনের মত কিছু করি নয় মরি, যাঃ শালা ল্যাটা চুকে বুকে যাক্। এ্যাই, বুঝলে? ভোটের পরেও যেখেনে ওইটি পাব, সেখেনেই যাব।

তার কথা শেষ হবার আগেই কয়েকজনের গলা একসঙ্গে শোনা গেল বাড়ির বাইরে। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ও বুধাইদা, তুমি যে মালখানায় ঢুকে পড়েছ। টেনেছ নাকি?

সবাই সমিতির লোক এবং চিরঞ্জীবের পরিচিত। কথাগুলি শোনা মাত্র তার চোখে আবার আগুন দেখা গেল। এদের মধ্যে দু' একজন তার দলেও ছিল।

কে একজন জবাব দিল, মালখানা কী বলছিস, রসের কারখানা বল্। শীগগির এস বুধাইদা, শ্রীধরদা রেগে গেছে ভীষণ।

বুধাই চেঁচিয়ে বলল, আচ্ছা সে আমি বুঝব। তোমরা থাম দি'নি?

ব'লে চিরঞ্জীবের দিকে ফিরে বলল, চলি ভাই, রাগ কর না। চলি দিদি।

আবার যেন কে বলে উঠল, যুগল মূর্তি রয়েছে দেখছি।

আর একজন বলল, টাটের ঠাকুর। ভোটটা মিটতে দে, তারপরে —।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে ছুটতে যাচ্ছিল চিরঞ্জীব। দুর্গা চাপা গলায়

বলে উঠল, পায়ে পড়ি ছোট ঠাকুর, যেও না। যেও না ওদের কাছে।

গাড়িটা গর্জন ক'রে পিছুতে লাগল। সবাই হাসতে হাসতে, কোলাহল করতে করতে, চলে গেল সেই সঙ্গে। এক রাশ আগুন রেখে গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যে-আগুন চিরঞ্জীব আর দুর্গার গায়েও লেগেছে। অথচ চিরঞ্জীব নিশ্চিত, ভোটের পরে এদের মধ্যেই কাউকে চেলা ক'রে হাটের মাঝে গরুর গাড়ির চাকার তলে প'ড়ে থাকতে দেখা যাবে। চোলাইয়ের কারবারেও নেমে যাবে হয়তো কেউ। শ্রীধরদাসের সাধারণ বলিষ্ঠ মানুষ,ভূমিহীন কৃষক···।

বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিল চিরঞ্জীব। দুর্গা বাধা দিল। বলল, এট্টু দাঁড়িয়ে যাও ছোট ঠাকুর।

—কেন

—হ্যাঁ, আমি বলছি।

ব'লে দুর্গা সামনে এসে হাত ধরল চিরঞ্জীবের। বলল, পাঁচ মিনিট বসে যাও।

'দপ্ দপে চোখ তুলে চিরঞ্জীব তাকাল দুর্গার চোখের দিকে। দুর্গার আয়ত চোখ দুটিতে যেন কী আছে। শুধু চোখ নয়। কিছু নিগূঢ়, অনুচ্চারিত, বোধ হয় এ জীবনে যে-কথা বলবার সাহস তাদের পরস্পরেরই কখনো হবে না, তেমনি কিছু কথাভরা চোখ। চিরঞ্জীবের চোখের রক্ত সরে গেল। চাউনি হল অসহায়। শুধু বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল দাউ দাউ ক'রে। সে দুর্গার হাত ছাড়িয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে, বেড়ায় হেলান দিয়ে, মেঝেতে বসে পড়ল।

দুর্গা এল পিছু পিছু। সেও বসল কাছে। চিরঞ্জীবের হাঁটুতে চিবুক রেখে, তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে রইল হাঁটু।

প্রায় রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল চিরঞ্জীব, কী দেখিস দুর্গা এমন ক'রে?

দুর্গাও নীচু স্বরে বলে, তোমার খ্যাপামি। কেন এত জ্বলছ? তুমি ওদের জান না?

চিরঞ্জীব বলল, জানি। কিন্তু দুর্গা, পুতু পুতু ক'রে বাঁচবার জন্যে কি আমি এ পথে এসেছি? তা আসি নি। বেঁচে থাকার ঘেন্নায় এসেছি। তবে? তবে মরব যদি, দেরী কেন? তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি মরি না কেন? আমার আবার দিনক্ষণ কিসের? আমার আবার কিসের আঁটঘাট বাঁধা।

দুর্গা হাত বাড়িয়ে চিরঞ্জীবের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। বলল, জানি ছোট্‌ঠাকুর।

চিরঞ্জীব দুর্গার হাতটা টেনে নিল। বলল, জানিস?

দুর্গা বলল, জানি না ছোট্‌ঠাকুর? খুব জানি। কেড়ে ছিনিয়ে জোর ক'রে বুকে বসে বাঁচলুম, বুকে বসে মরব। বুড়ো হ'য়ে, এক ঘর লোকের মধ্যে, রোগে শোকে ধীরে সুস্থে যারা মরে, তারা মরে। ওসব ভাবিনাকো। যেমন বাঁচলুম, তেমন মরব।

কথার শেষে সুরটা তবু কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে। চিরঞ্জীব দুর্গার চিবুক ধ'রে মুখটি তুলে ধ'রে এক মুহূর্ত দেখে, দুর্গাকে কাছে টেনে বলে, দুর্গা তোকে মারতে চাইনি।

দুর্গা আরো ঘন হ'য়ে বলল, তুমি মারতে চাইবে কি গো। তুমি না বাঁচালে?

—না, না দুর্গা। নিজের মরণের খোঁটাটার সঙ্গে তোকে বেঁধে নিয়ে এলুম। আমার তো কোন ভয় ছিল না। আমি তো কোন দিকে ফিরে চাইব না ভেবেছিলুম। এখন যেন কেমন লাগে।

—কেন গো? কিসের ভয় তোমার?

চিরঞ্জীব দু'হাতে দুর্গাকে আঁকড়ে ধরে বলল, নিল্লায় আর যেতে চাসনে দুর্গা। আর বাইরে যাস নে। এবার আমার খুঁটির পাক খোল্। সর, সরে যা।

—ইস্! ইস্!

দুর্গা শিসিয়ে উঠল। চিরঞ্জীবের বোতাম খোলা বুকের ওপর

হাত রেখে বলল, মিছে কথা গুলোন এমন ক'রে ব'ল না ছোট্‌ঠাকুর। এক ফোঁটা ভয় দেখাতে পারবে না আমাকে। তুমি আমাকে জড়ালে? তুমি আমাকে মারতে নে' এলে?

দুর্গা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল। খয়েরি শাড়ি আর এলো চুলগুলি চিরঞ্জীবের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেন বাঘিনী ফুলে ফুলে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, বাঁচতে গেলেও মরতে হয়, বোঝ না? যে-মরা আমাকে আগে মরতে হ'ত, তার চে' এ মরণে তবু মরণের সুখটুকু কেউ কাড়তে পারবে না।

—মরণে আবার কী সুখ দুর্গা?

—এই যে, এই যে এমনি ক'রে বসে আছি, এই যে হাত দু'খান আমাকে ধরে রেখেছে, এই তো আমার সুখ। আমার তপিস্যের মরণ গো। লোকে বলবে, ছুঁড়ি অনাচার ক'রে মরেছে। বলুক। এমন মরণ পাবে কোথা? মরব, মরব, মরব···

বলতে বলতে দুর্গার সর্বাঙ্গে যেন আগুন লাগল। আয়ত খর চোখ দুটিতে যেন বিশ্বধ্বংসের লীলায় দাউ দাউ ক'রে উঠল। বলল, ছোট্‌ঠাকুর, তুমি মরবে তাড়াতাড়ি, আমি বসে থাকব? তার আগে তুমি হুকুম দাও, আমি আগুন জ্বালাই সারা গাঁয়ে। এই ভাল মানুষের সমাজকে নিষ্টেপিষ্টে মারি, যারা মারতে চেয়েছিল, তাদের রক্তে আমার পা ধুই।

দুর্গার চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু চোখের আগুন বাড়ল শত-গুণ। নাকের পাটা উঠল ফুলে ফুলে। উত্তাল ঢেউয়ের মত বুক ওঠানামা করতে লাগল।

চিরঞ্জীব সেই অঙ্গার মুখখানি ধ'রে যেন উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকল, দুর্গা।

—অ্যাঁ?

দুর্গার দৃষ্টি পড়ল চিরঞ্জীবের চোখের দিকে। হঠাৎ যেন লজ্জা পেল সে। প্রায় চুপিসারে যেন বলল, যারা ঘর থেকে তাড়িয়ে

বনে নে' গেল, তারাই খুঁচিয়ে মারতে এসেছে। যেচে, ওদের পায়ে ধরে বাঁচতে চাই না। ছোট্‌ঠাকুর—

দুর্গার গলার স্বর সহসা রুদ্ধ হল। বুকে মুখ চেপে, ভাঙা গলায় বলল, কিন্তুন তোমাকে আগলে মরার বড় সাধ।

চিরঞ্জীব কোন কথা বলতে পারল না। দুর্গার কম্পিত শরীরটা চেপে ধরে রইল।

সন্ধ্যার ঘোর লাগা আকাশে বারোয়ারীতলার সমবেত শ্লোগান উচ্চকিত হয়ে উঠল।

বাতাস নেই, শীতও নেই। ফাল্গুনের প্রারম্ভেই, আকাশটা এই দিন মেঘলা হ'য়ে রয়েছে। কথায় বলে, যদি বর্ষে ফাগুনে, চীনা কাওন দ্বিগুণে। পূর্বাঞ্চলে যদিও বা হয়, এ অঞ্চলে চীনা কিংবা কাওনের ধানচাষ দেখা যায় না।

মেঘের তেমন সমারোহ নেই। দুপুরে একবার কালবৈশাখীর মত ক'রে, ঘনঘটা হয়েছিল? সেরকম বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু মেঘ আছে আকাশে।

হাটে তেঁতুলতলায় ভোটের মিটিংএ মারামারি হ'য়ে গিয়েছে কয়েকদিন আগে। শ্রীধর দাস এবং গোলকবিহারী মিত্তিরের দলেই মারামারি হয়েছে। উভয় পক্ষেরই কয়েকজন সদরের হাসপাতালে আছে। সবাই মনে করেছিল, গোলকবিহারীর সাকরেদ সনাতন ঘোষের নামে পরোয়ানা বেরুবে। কারণ, সে-ই দাঙ্গা করেছে বেশী। কিন্তু সে বুক ফুলিয়েই চলছিল।

আর তিন দিন বাদেই ভোট। এখনো সভা-সমিতির সময় ছিল। কিন্তু এরমধ্যেই সারা অঞ্চলটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। থম্‌কে আছে।

আবগারি থেকে পুলিশের টহল এখনো তুলে নেওয়া হয়নি গ্রাম থেকে।

দুর্গা বারে বারে ঘর বার করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছে, বেলা বুঝি যায়। মেঘের জন্যেই আরো এরকম মনে হচ্ছে। নন্দ ঘুমোচ্ছে দাওয়ায়। তাকে ডাকতে গিয়েও থম্‌কে গেল দুর্গা।

এই ছটফটানির মধ্যেই বেদো এল! যাক্‌! তা' হ'লে সব ঠিক আছে। কিন্তু বেদোর মুখ অন্ধকার। বোধ হয় নেশার ঘোরেই। নেশার ঘোরে তো বেদোকে হাসকুটে উত্তেজিতই মনে হয়। এমন মাথা নত, অপরাধীর ভাব কেন? ধরা পড়েছে নাকি?

সে কাছে আসতেই দুর্গা বলল, কী হয়েছে? সব পৌঁছে দিয়েছ?

বেদো মুখ না তুলেই, ঘাড় নেড়ে জানাল, দিয়েছি।

—তবে?

বেদো বলল, কবরেজ বাড়ির দিদিরা যাবে না।

—কেন?

—তা জানি নাকো। খালি বললে, দুগ্‌গাকে বলে দাওগে, আমরা যেতে পারব না।

—কেউ না? বড়দি না, মেজদিও না?

—না।

দুর্গা ঠোঁট কামড়ে ধ'রে, স্থির দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বলল, তোমাকে যে গরুরগাড়ির কথা বলেছিলুম?

বেদো বলল, সে ব্যবস্থা পাকা আছে। খালধার থেকে উঠবার কথা তো? সেই অর্জুনের তলায়? সেখেনে গাড়ী গাড়োয়ান সব ঠিক থাকবে। মালপত্তর পৌঁছে দিইচি ঠিক জায়গায়। গাড়িসুদ্ধ ওখেনে আসবে।

দুর্গা দাওয়া থেকে নেমে বলল, একটুখানি বস খুড়ো, আসছি। ব'লে সে, দুখানি বাড়ি পেরিয়ে যমুনা মাসীর বাড়ি এল। দরজা খোলা-ই ছিল। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল দুর্গা। যমুনা মাসীর মেয়ে যোগো আর যোগোর' বর পাশাপাশি বসে কথা বলছে। হাসাহাসি করছে।

দেখতে পেয়ে যোগো ডাকল, এস দুগ্গাদি।

দুর্গা বলল, হ্যাঁ আসব একবারটি। মাসী কোথা?

যোগো বলল, এই তো ছেল। কোথা গেল আবার। বস না।

যোগোর বর হীরালাল। গঙ্গার পুব পারের মানুষ। বারাসতের গ্রামাঞ্চলে বাড়ি। চাষবাসের সঙ্গে একটি ছোট মুদিখানা আছে। লম্বা রোগা ভাল-মানুষ-মুখটিতে কেবল চোখ দুটি একটু চঞ্চল। পয়সা ভালবাসে, একটু বেশী ভালবাসে। আর বাবু সাজবার ঝোঁক বড় বেশী। শ্বশুরবাড়ি যখন আসে, পাটনা থাক 'সিল্কেরের পাঞ্জাবীটি থাকে গায়ে। কোঁচাটি হাতে ধরা থাকা চাই। ঘাড়ের পাউডারটুকু মুছতে দেবেনা কিছুতেই।

সে বলল, হ্যাঁ, একটুখানি বইস দিদি। এই দেখো তোমার বোন কি বলছে। বলছে গরুর গাড়িতে চাপবে, চোখ বুজে গিয়ে মাল খালাস করবে, চলে আসবে। কবরেজের মেইয়ের সঙ্গে যদি ফষ্টিনষ্টি করবে তো ঝাঁটা।

যোগো কপালে চোখ তুলে বলল, ওমা, ঝাঁটা বলেছি তোমাকে? হীরালাল বলল, অই হল আর কি। চোখ পাকালো যা, ঝাঁটাও তাই, কী বল দিদি, অ্যাঁ? আমি বইললাম কিনা, তা কখনো হয়? ওঁয়ারা বাউন কবরেজের মেইয়ে, ওঁয়ারা কেন ঢলাবেন? তা তুমি বইললে না, 'ওসব বাউন কবরেজ ঢের দেখা আছে, কিছুটি বিশেষ লেই।' বল নাই?

হীরালালের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বোঝা গেল, সে চটাচ্ছে যোগোকে। যোগো ভেংচে বলল, বেশ করেছি বলেছি। তোমাকে বিশ্বেস কী?

—অই দেখেন।

দুর্গা হাসল। ভিতরে দুশ্চিন্তা, বাইরে হাসিটা তাই শুকনো। কথা হয়েছিল, হীরালাল বর সেজে গরুর গাড়িতে বউ নিয়ে যাবে। বউ হ'য়ে যাবে অচলা না হয় সুশীলা। হীরালাল আসলে যোগোকেই

নিতে এসেছ। কিন্তু দুর্গা একটি লোক খুঁজছিল। একটি বর। নতুন বিয়ে হয়েছে, এমনি বর আর বউ। লজ্জাবতী বউ, ঘোমটা ঢাকা। গরুর গাড়িতে বউ, বাকসো, প্যাঁটরা, বিছানা বোঝাই করে যাবে। আসলে আসল জিনিসই যাবে। কিন্তু বউ ছিল, বর ছিল না। যমুনার কাছে সব শুনে, তিন টাকার মজুরিতে, হীরালাল অপরের মিছিমিছি বর হতে রাজী হয়েছে। কাজ নয় কর্ম নয়, খালি গরুর গাড়িতে যাওয়া সদরের গঙ্গার ঘাট অবধি। তারপরে আবার পরের পয়সায় রেলে ক'রে ফিরে আসা। ফিরে এসে বউ নিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু এখন বর আছে, বউ নেই। দুর্গা সেই কথাই বলল হীরালালকে, কবরেজ বাড়ির মেয়েরা কেউ যাবে না। কী হয়েছে ওদের জানি না। এখন গে' একবার খবর নে' আসব। তবে বউ এ্যাট্‌টা থাকবেই, বুঝলে!

হীরালাল বলল, কে থাকবে?

দুর্গা বলল, যে-ই থাক, থাকবেই একজন। সব ঠিকঠাক্, এখন আর পেছুনো যাবে না। ও জিনিস তো এখন গলার কাঁটা। যেখানে হোক পাচার করতে হবে। তুমি যেন ভুলে যেও না। সঙ্গে বাতি দেখালেই চলে যেও যমুনা মাসীর সঙ্গে, বুঝলে?

—আচ্ছা।

দুর্গা বলল, সেই কথাই বলতে এসেছিলুম, যমুনা মাসীকে বলিস্ যোগো। কবরেজ বাড়ি গে' যদি কোনো বেপদআপদের খবর পাই, তা'লে জানাব। নইলে আমি আর আসব না। ওদের পাঠিয়ে দিস্।

যোগো বলল, আচ্ছা।

হীরালাল তাড়াতাড়ি বলল, ও দুগ্‌গাদিদি, শোন, একটুআধটু পাওডার টাওডার মাখব তো?

দুর্গা হেসে ফেলল। বলল, যত তোমার খুশি।

দুগ্গা বাড়ি চলে এল। বেদো তেমনি বসে তখনো। নন্দ জেগে বসেছে।

দুর্গা ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেখান থেকেই বলল, সব শুনেছ তো নন্দ দা?

—শুনলুম।

দুর্গা বলল, ছোট্‌ঠাকুরের আসতে তো অনেক রাত। আমি এটটু কবরেজ বাড়ি যাচ্ছি। যদি দেখি, ওরা যাবে না, তবে আমি যাব।

নন্দ চমকে উঠে বলল, কোথা? সদরের গঙ্গার ঘাট অবধি?

দুর্গা বলল, হ্যাঁ। পাকা রাস্তায় পড়লে তাড়াতাড়ি যাবে। রাত দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে শহরে পৌঁছে যাব। এ তো আর ধান চালের গাড়ি নয় যে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যাবে।

নন্দ বলল, কিন্তু ফিরবে কী ক'রে?

দুর্গা বলল, রাতে গাড়ি পাই ভাল। না হয়, কাল ভোরে। রান্না-বান্না সব ক'রে রেখেছি। তুমি খেও। ছোট্‌ঠাকুরেরটা আলাদা রেখেছি, তুমি বেড়ে দিও। সে যেন চিন্তা না করে, বুঝলে?

নন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বুঝব কী দিদি? ছোট্‌ঠাকুর যে আমাকে আস্ত রাখবে না? দুর্গা বলল, রাখবে। সব ভেঙে ব'ল। তারপরে সব সামলাবার দায় আমার।

ব'লে দুর্গা বেড়ায় গোঁজা ছোট আয়নাটির সামনে দাঁড়িয়ে, গলায় হারগাছাটি পরল। প'রে দেখে, ঠোঁট টিপে হাসল। বউ যখন তাকেই সাজতে হবে, গলায় আজ হারটি থাক্‌।

তারপরে দড়ির ওপর থেকে, লাল রংএর ভাজ করা ব্লাউজটি আরো ভাজ ক'রে হাতে নিল। শাড়ি এবং প্রসাধন অচলাদের বাড়িতেই পাওয়া যাবে। গলার হারের ওপর আঁচলটি ঢেকে, বাইরে এল সে।

নন্দ বলল, চললে?

—হ্যাঁ।

বেদো ব'লে উঠল, কিন্তুন্ এ্যাট্টা কথা মেয়ে, দু'জন কিষেনকে নে' বিরাজ ঠাকুরকে দেখে এলুম, কবরেজবাড়ির পেছুনকার বাগানের জমি মাপছে ফিতে দে'।

দুর্গার ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠল। আবার একবার ভাবল। বলল, আচ্ছা, দেখি গে' আগে ব্যাপার কী।

কবরেজ বাড়ির সামনে এসে দেখল দুর্গা, মিছে নয়, বিরাজ ভটচাজ কাটি পুতে জমি মাপছে! সে তাড়াতাড়ি বিরাজ ভট্‌চাজের চোখ ফাঁকি দিয়ে, পোড়োজংলা উঠোনটা পেরিয়ে বারান্দায় উঠল। দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে একেবারে ওপরে গিয়ে উঠল সিঁড়ি দিয়ে।

উঠে থম্‌কে গেল। কবরেজ মশায়ের ঘর খোলা। গিন্নি বাগানের দিকে জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন। অঘোর কবরেজ যেমন শুয়ে থাকেন, তেমনি আছেন। অন্যদিকে অচলা সুশীলার ঘরে ঢুকল দুর্গা।

আশ্চর্য! যা কখনো দেখা যায়নি, আজ তাই। ওরা দু'জন পরম আলস্যে শুয়ে আছে। অচলা ঘুমিয়ে আছে। সুশীলা চুপ ক'রে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। কিন্তু দুর্গাকে দেখে চম্‌কে উঠল না সুশীলা। তেমন হেসেও উঠল না। খুবই শান্ত গলায় ডাকল, আয় দুগ্‌গা।

দুর্গা দরজাটা ভেজিয়ে দিল। দিয়ে বলল, কী ব্যাপার তোমাদের মেজদি?

সুশীলা আস্তে আস্তে উঠে বলল, খুব ভাল। আমার আর আচির বে' হবে এই ফাল্গুনেই।

দুর্গা যেন এমন বিচিত্র কথা কোনোদিন শোনে নি। কিংবা মানে বোঝে নি। কেমন একটা অর্থহীন চোখে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। আসলে অন্য কথা ভাবছিল সে। তার অবাক লাগছিল অচলা

সুশীলাকে দেখে। ভাবল, এরা কি সেই মেয়ে যারা মদের চোরা চালানের কাজ করে? কয়েকদিনের ব্যবধানে যেন চেনাই যায় না দুজনকে। এরা যেন আর কেউ। দুর্গার অবাক লাগল ভেবে যে, এ বাড়িতেই কোনো কালে ওসব পাট ছিল কি না। সব যেন উবে গিয়েছে, অচেনা একটা বাড়িতে ঢুকেছে বুঝি সে।

দুর্গা বলল, বে' কবে?

সুশীলার মুখে যেন সেই পুরনো দুর্বিনীত হাসিটা একবার উঁকি দিল। কিন্তু সে মুখ খোলবার আগেই, চোখ বোজা অবস্থায় অচলা প্রায় জড়ানো গলায় বলে উঠল, একুশে ফাল্গুন, লগনসা রাত্তির ন' টায়। আসিস কিন্তু দুগ্‌গা।

সুশীলার হাসি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল না। একটু ঝংকার শোনা গেল মাত্র। দুর্গা-ই অবাক হ'লেও, না হেসে পারল না অচলার কথায়।

সুশীলা বলল, সেই যে বলেছিলুম তোকে, মেয়ে দেখতে আসবে? তোর পয়সায় তো লোক দুটোকে খাওয়ান হয়েছিল। চিরে ভটচাজেরই চেনা লোক। দুই বর এসেছিল মেয়ে দেখতে।

অচলা বলল, আর দেখেই পছন্দ হয়েছে। আমরাও খুব পছন্দ করেছি ওদের।

সুশীলা ব'লে উঠল, তবে বাংলা বলতে পারে না। ভেবেছিলুম হিন্দুস্থানী! কিন্তু লোক দুটো বলছে, ওদের জন্ম কর্ম সব বেহারে। বাঙালীর সঙ্গে কোনোদিন মিশতে পায় নি তাই কথা শেখেনি।

দুর্গাকে কিছু বলারই অবসর দিল না। অচলা আবার ব'লে উঠল, তবে প্রমাণ পত্র আছে। ওরা চিরে ভটচাজের আত্মীয়। বয়স তেপান্ন আর পঞ্চান্ন, পিটোপিটি ভাই। বেহারে কোথায় নাকি গুড়ের ব্যবসা করে। এ্যাদ্দিন সময় পায় নি বে' করার। এবার করবে। চিরে ভটচাজ ছিল, তাই আমাদের কপাল খুলেছে। দুটিকেই এখানে নিয়ে এসেছে।

সুশীলা বলল, সত্যি আচি ওদের জন্যে এ্যাদ্দিন আমাদের বে'র ফুল ফোটেনি, অ্যাঁ ?

অচলা বলল, হ্যাঁ। কই রে দুগ্‌গা, বসবি তো।

দুর্গা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু আশ্চর্য। কোনোটাই যে ঠাট্টা নয়, সেটা সে বুঝল।

সুশীলা আবার শুয়ে প'ড়ে, হাই তুলে বলল, উঃ কী ঘুম পাচ্ছে।

যেন জীবনের সমস্ত ক্লান্তির শোধ একদিনেই ক'রে নিতে চাইছে দুজনে। ঘুমিয়ে থাকা, বসে থাকা কাকে ব'লে, ওরা জানত না। সহসা ওরা ভীষণ ক্লান্ত অলস আয়েসী হ'য়ে উঠল। অনেক ছুটো-ছুটি, অনেক উৎকণ্ঠিত অনিশ্চিত জীবন যাপনের পর, নতুন বদলের মুখে ওরা চঞ্চল হ'য়ে ওঠেনি। গা এলিয়ে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ছে।

দুর্গা বলল, কিন্তন্, চিরে ভটচাজ পেছনের বাগান মাপছে কেন ?

সুশীলা বলল, কিনবে ওটা চিরে ভটচাজ। নইলে বে'র খরচ কোথায় পাওয়া যাবে ? কিছু না হোক্, শাঁখা সিঁদুর কাপড় গামছা আর পুরোত খরচ তো চাই।

অচলা বলল, শুধু তা কেন ? দু' চারজন লোকও খাবে। চিরে ভটচাজের টাকা, সে নিজের হাতেই খরচ করবে। তার চেনাশোনা আত্মীয় স্বজনেরা নিমন্ত্রণ খাবে।

সুশীলা বলল, মা বলছিল, আমাদের চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করল চিরে ভটচাজ। মেয়েদের আইবুড়ো ঘোচাল।

দুর্গা না জিজ্ঞেস ক'রে পারল না, তোমাদের যে এক দাদা আছে কলকাতায়, তাকে খবর দেয়া হবে না ?

অচলা বলল, নেহি।

সুশীলা বলল, হামলোক দাদা ব'লে কাউকে নেহি জানতা।

আবার একটু হাসির চকিত নিক্কণ শোনা গেল দুজনের। চুপিসারে চলা কোনো মেয়ের হাতের চুড়ি অসাবধানে বেজে ওঠার মত।

অচলা বলল, এখন থেকে আমরা হিন্দীতেই কথা বলব।

সুশীলা বলল, ওরা খুব খুশি হবে।

অর্থাৎ বরেরা।

অচলা এবার মাথা তুলে দুর্গার দিকে তাকাল। বলল, আয় না, বসবি আয় এখানে।

দুর্গা এগিয়ে গিয়ে অচলার পাশে বসল।

অচলা বলল, খুব রাগ করছিস তো আমাদের ওপর?

দুর্গা মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তুন আমার ভাল লাগছে না বড়দি।

ওরা দুজনেই নিঃশব্দে হাসল। অচলা বলল, কেন রে? আমাদের বে' হবে, তোর আনন্দ হচ্ছে না?

দুর্গা চুপ ক'রে রইল।

সুশীলা বলল, তোর মত তো তা' ব'লে আমরা হ'তে পারব না।

সেটা ভাল না মন্দ কিছু বোঝা গেল না। অন্য সময় হ'লে দুর্গা রুষ্ট হ'য়ে হয় তো পাল্টা কিছু জিজ্ঞেস করত। এখন সে কিছু বলতে পারল না। বরং জিজ্ঞেস করল, তোমরা চলে গেলে কবরেজ মশায় আর গিন্নির কী হবে? কে তাদের দেখবে শুনবে। কী খাবে?

অচলা বলল, কী আবার করবে। শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে।

সুশীলা বলল, বল্, শুকে শুকে পচে হেজে হেজে ঘরের কোণে মরে প'ড়ে থাকবে। তারপর গাঁয়ের লোকেরা একদিন জানতে পেরে সবাই ছুটে আসবে দাহ করতে।

দুর্গা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সুশীলার দিকে। সত্যি কথাও কি এমন ক'রে মানুষ বলতে পারে?

কিন্তু অচলা সুশীলা তো মিথ্যে কথা আজ একটিও বলে নি। সত্যি কথাগুলিই এমন ভয়ংকর শোনাচ্ছে। দুর্গার বলতে ইচ্ছে হ'ল, কবরেজ মশায় আর গিন্নিকে আমি দেখব। আমি খাওয়াব। কবে থেকে যে এমন একটি মায়া প'ড়ে গিয়েছে গিন্নির ওপরে, দুর্গাও

জানত না। সেই প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। 'দুর্গা, আমার এখানে চোলাই করিস, কিছু দিস।' বড় মানুষ ভদ্রলোকের অমন মতি দেখে তো ঠোঁট বেঁকে নি দুর্গার। বরং মনটা খারাপই হ'য়ে গিয়েছিল। মানুষটিকেও কেন যেন ভাল লেগেছিল খুব।

অচলা দুর্গার হাত টেনে নিল। বলল, রাগ করছিস দুর্গা?

দুর্গা বলল, না। রাগ কেন করব?

অচলা বলল, সেই ভাল। যা রায়বাঘিনী তুই। তোর রাগ দেখলে আমার পিলে চমকে ওঠে।

মিথ্যে নয়। দুর্গাকে তারা তুই তোকারি করে। করবেই। মানে ও বয়সে, দুইয়েতেই দুর্গা ছোট। গাঁয়ের মেয়ে ব'লে ছিটে-ফোঁটা স্নেহও আছে। তবু দুর্গা রেগে উঠলে, কেমন যেন থতিয়ে যেত ওরা।

অচলা বলল, তবে, আজকের জিনিসের কী করবি? বর যোগাড় হয়েছে?

দুর্গা বলল, হ্যাঁ।

সুশীলা বলল, ইস্? ফস্‌কে গেল। বরটা কেমন রে?

দুর্গা বলল, ভালই।

অচলা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু বউয়ের কী হবে?

দুর্গা বলল, আমি যাব।

অচলা এইবার যেন একটু নড়ে চড়ে উঠল। বলল, তুই যাবি? তুই ধরা পড়ে গেলে যে সব কানা হ'য়ে যাবে।

—ধরা পড়ব কেন শুধু শুধু?

আবার সমাধিস্থ হ'য়ে গেল অচলা। বলল, অ। আচ্ছা।

দুর্গা বলল, লাল শাড়িটা যে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, কোথা সেটা?

—ওই গ্যাখ্, তাকের ওপর রেখেছি।

বাইরে ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দিনের আলো যত না কমছে, মেঘের অন্ধকার তার চেয়ে বেশী। তবু বসন্তের প্রথম পাখীটা

গ্রামে এসে পড়েছে। একটু স্তিমিত গলাতেই কোথায় ডাকছে, কুহু! কুহু!

দুর্গা তাকের ওপর থেকে ক্ষয়ে প্রায় শেষ হ'য়ে আসা ছোট্ট এক টুকরো সবুজ রংএর সাবান নিয়ে নীচে চলে গেল। বাড়ির ভিতরেই কুয়ো আছে। জল তুলে দুর্গা সাবান বুলিয়ে মুখ ধুল'। মুছল আঁচল দিয়ে। ওপরে এসে মাথা আঁচড়াল। চুল বাঁধবার সময় নেই। শুধু ফিতে নিয়ে চুলের গোড়ায় বাঁধন দিয়ে, এলো খোঁপা ক'রে নিল।

জিজ্ঞেস করল, তোমাদের যে এ্যাট্টা হিমানীর কৌটো ছেল?

সুশীলা আঙুল বাড়িয়ে দেখাল, ওই যে।

দেখা গেল, ঘরের জল যাবার মুখের কাছে, ঝাঁট দেওয়া এক রাশ ধুলোবালির ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে হিমানীর কৌটো।

দুর্গা বলল, এত হতচ্ছেদ্দা কেন গো হিমানীর?

অচলা বলল, দেখলুম তখন পা'য়ের কাছে মেঝেয় প'ড়ে আছে। দিলুম পা' দিয়ে ঠেলে।

আবার একটা হাসির আড়ষ্ট অস্ফুট ঝংকার। কিন্তু দুর্গাকে তো সাজতেই হবে। কৌটো তুলে, কুলুঙ্গির ছোট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হিমানী মাখল সে। ক'ড়ে আঙুলে কাজল নিয়ে নিপুণ ক'রে টানল চোখে। তারপর, গালার তৈরী সিঁদুর কৌটোটির দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত থম্‌কে রইল। একটু একটু ক'রে হাসি ফুটল ঠোঁটে। সারা মুখে ও চোখে ফুটল বিথরে বিথরে। চিরঞ্জীবের মুখখানি ভেসে উঠল চোখের সামনে। কৌটো টেনে নিয়ে। আঙুলের ডগায় সিঁদুর লাগিয়ে, আগে দিল সিঁথিতে। তারপর কপালে। খুব সাবধানে। সবাই নাকি গোল্ ক'রে ফোঁটা দিতে পারে না। ঠিক পূর্ণিমার সুগোল চাঁদের মত ফোঁটা দিতে হবে। নইলে ক্ষয়াটে চাঁদের মত দেখায়।

দিয়ে সারাটি মুখ একবার দেখল। হাসল আবার। পরমুহূর্তেই ভ্রূকুটি করেই, আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল চোখ দুটি। এই বেশে

চিরঞ্জীবের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল মন। লজ্জা পেল, হাসি পেল, তবু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। আর মুহূর্তে স্থির ক'রে ফেলল, কাজ শেষ ক'রে, রাত্রের মধ্যেই আজ যেমন ক'রে হোক ফিরে আসতে হবে। ছোট্‌ঠাকুরের সামনে দাঁড়াতে হবে এই বেশে। আজ রাত্রেই, আজ রাত্রেই।

যেন সহসা তাড়া লেগে গেল তার। সুশীলা অচলার দিকে পিছন ফিরে, গায়ে আঁচল ছড়িয়ে, জামাটা টান দিয়ে খুলে ফেলল। লাল জামাটা গা'য়ে দিল। শাড়িটা খুলে ফেলল। খুলতেই ঠন্ ক'রে একটা জিনিস প'ড়ে গেল। সেই অস্ত্র, সেই গুপ্তি, খাপে ঢাকা। এক ফুট লম্বা, সুতীক্ষ্ণ সুচাগ্র! সায়া রয়েছে। নেড়েচেড়ে টেনে টুনে দেখল একবার সায়াটি। তারপর লাল শাড়িটি টেনে পরল কুঁচিয়ে। যেমন ক'রে যোগো পরে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়। গাঁয়ের সব মেয়েরাই এমন কুঁচিয়ে পরে। প'রে গুপ্তিটা গুঁজল কোমরে। চিরঞ্জীব বলেছে সব সময় কাছে রাখতে। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে আর একবার দাঁড়াল গিয়ে আয়নার সামনে।

প্রথমে উঠে বসল সুশীলা। তারপরে অচলা, যেন বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে।

সুশীলা বলল, তোর গলায় ওটা কী দুর্গা? হার?

—হ্যাঁ।

—কে দিয়েছে? চিরো?

চিরঞ্জীব বুঝি সুশীলার চেয়েও দু' এক বছরের ছোট। ওরা চিরো-ই বলে। কিন্তু 'হ্যাঁ' বলতে দুর্গার লজ্জা করল। সে বলল, দেখ না! সখ্ দেখে বাঁচি না।

অচলা বলল, এতদিন মনে হত, তুই জিতেছিস্। আজ মনে হচ্ছে, চিরো'টাই জিতেছে।

দুর্গা বলল, কেন?

অচলা বলল, তোকে দেখে বুঝলুম।

সুশীলা বলল, দাঁড়া তবে উঠি।

সে উঠে আল্‌তার শিশি বার করল। দুর্গার পা'য়ের কাছে বসে বলল, আয়, পরিয়ে দিই।

দুর্গা লাফ দিয়ে সরে গেল।—আ ছি ছি মেজদি, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমার পা'য়ে হাত দিতে আসছ? দাও, আমি নিজে প'রে নিই।

সুশীলা বলল, কেন, বামুন ব'লে? তোর ইয়ে দেখে বাঁচিনে। চিরোর সঙ্গে সব—

দুর্গা নিজের হাতে আল্‌তা পরতে পরতে বলল, তা কী করব বল। সবই কি ঠিক ঠিক হয় সোম্‌সারে?

আল্‌তা পরা হ'য়ে গেলে, অচলা উঠে এল এবার। বলল, দাঁড়া দুগ্‌গা। আর একটু বাকী আছে।

অচলা আঙুলের ডগায় আল্‌তা নিয়ে দুর্গার ঠোঁটে লাগিয়ে দিল। দিয়ে, ভেজা থাকতে থাকতেই আবার কাপড় দিয়ে ঘষে একটু হাল্‌কা ক'রে দিল। বিম্বোষ্ঠা দুর্গা হাসতেই তার শাদা দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল!

অচলা বলল, ধরা পড়লেও তোর ক্ষতি নেই। যে ধরবে, সে ব্যাটা তোকে দেখেই ধরাশায়ী হ'য়ে যাবে, দেখিস্‌।

সুশীলা বলল, সত্যি।

দুই বোন দুর্গার দিকে যেন অবাক স্থবির চোখে তাকিয়ে রইল। লজ্জায় দুর্গার নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। অচলা কাছে এগিয়ে এল। দুর্গার গলা জড়িয়ে ধরে চিবুক তুলে বলল, দেখি?

দুর্গা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, যাঃ!

সহসা অচলা লুব্ধ তৃষ্ণার্ত ঠোঁট নিয়ে লুটিয়ে পড়ল দুর্গার ঠোঁটের ওপর। গাঢ় সম্পূর্ণ চুম্বনে শ্বাসরুদ্ধ করে দিল।

সুশীলাও এসে জড়িয়ে ধরল দুর্গাকে।

কিন্তু দুর্গার মাথায় সহসা রক্ত চড়ে গেল। গা'টা যেন গুলিয়ে

উঠল। সে দুজনকেই প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আঃ, ছাড় ছাড়। ই কি বিদকুটে ব্যাপার বাপু।

এই প্রথম ওরা দু বোনে জোরে হাসল। অচলা বলল, রাগ করলি?

কোনো জবাব না দিয়ে জানালায় গিয়ে থু থু করে থুথু ফেলল দুর্গা। ফিরল না। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রাগে ও ঘৃণায় তার শরীরের মধ্যে যেন জ্বলছে। সে বাইরের দিকে তাকাল। অন্ধকার ঘনাচ্ছে। সময় হ'য়ে এল। পশ্চিমের আকাশে, মেঘচাপা একটা রক্তের আভাস দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে চামচিকাটা ফড়ফড় করে এপাশ ওপাশ করছে।

দুর্গা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শাঁখ বেজে উঠল ঘরে ঘরে। দুর্গা ফিরল। সুশীলা অচলা শুয়ে পড়েছে আবার।

অচলা বলল, যাচ্ছিস?

—এবার যাব।

দুর্গার মন আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে।

সুশীলা উঠে বলল, চল, আমিও যাব নীচে। রান্না বনাব।

অচলা বলল, আমিও উঠি, শাঁখটা বাজাই।

সে উঠে একটা কুলুঙ্গি থেকে শাঁখ নিয়ে বাজাল। তীক্ষ্ণ সরু শব্দ শাঁখটার। যেন কানে তালা লেগে যায়। এঁটো শাঁখটাই রেখে দিয়ে, হ্যারিকেন ধরাল সে।

দুর্গা ভেজানো দরজাটা খুলল। সিঁড়িটা এর মধ্যেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। মশার গুন্‌গুনানি। সিঁড়ির মাঝপথে কবিরাজ গিন্নি। ঠাহর ক'রে দেখে বললেন, কে?

—আমি দুর্গা।

ঘরের হ্যারিকেনের আলোর একটি রেশ তার গায়ে পড়েছে। গিন্নি কাছে এসে বললেন, বাঃ, একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমাটি হয়েছিস।

ব'লে তাকিয়ে রইলেন। দুর্গা পায়ে পায়ে নীচে এল। অচলাও

এল। আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে দুর্গা বাইরে পা বাড়িয়ে, সুশীলার উদ্দেশে বলল, চললুম মেজদি।

সুশীলা কী বলল, দুর্গা শুনতে পেল না।

গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ের কাছে, মন্দিরের চত্বরে সব সময়েই লোক থাকে। আজ সেখানে একটু বেশী ভিড়। ভোটের ঘর (পোলিং বুথ্) তৈরী হ'চ্ছে। সুতরাং সে রাস্তা এড়িয়ে, আরো পশ্চিমে গিয়ে, উত্তরে বাঁক নিল দুর্গা। গ্রামের ভিতরে পা বাড়াল না। এমনি গাঁয়ের লোকে দেখতে পেলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সাজা গোজা ঘোমটা পরা একটি মেয়েকে এমন আন্‌কা নির্জন অন্ধকারে চলতে দেখলে, অসহায় ভেবে কেউ হয় তো ভিন্ন মতলবে পিছন নেবে। দুর্গার অন্য কোনো ভয় নয়, তার কাজ ভেস্তে যাবে।

দুর্গার মাথায় শুধু এক চিন্তা। যত রাত হোক, ফিরে আসতে হবে কাজ সেরে। খাল পারে অর্জুন গাছের গোড়ায় গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সব প্রস্তুত। হীরালালকে নিয়ে যমুনা এসে পড়েছে।

দুর্গা চুপি চুপি বলল যমুনাকে, আশপাশে কেউ নেই তো?

যমুনা বলল, না। এখানে কাছেই বেদো আর নন্দ লুকে আছে কোথাও।

একটু যেন স্বস্তি পেল দুর্গা। গাড়ির চালক বিমলাপুরের লোক। নন্দর চেনা। দুর্গা তাকে বলল, চট্ ক'রে বাতি জ্বাল দিকিনি। জ্বেলে গাড়ির তলায় ঝুলিয়ে দাও।

গাড়োয়ান বলল, বাতি জ্বাললে যে গাড়ি চলতে দেখা যাবে।

দুর্গা ব্যস্ত গলায় বলল, তা' তো যাবেই 'হে। বাতি না জ্বেলে গেলে, সন্দেহ করবে বেশী। রাস্তায় কত লোকের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।

গাড়োয়ান হ্যারিকেন জ্বালাল। পল্‌তে কমিয়ে ঝুলিয়ে দিল গাড়ির তলায়।

দুর্গা দেখল, হীরালাল তার দিকে হা ক'রে তাকিয়ে আছে। যেন কথা সরছে না মুখে। দুর্গা বলল, তাকৃকে আছ কি লো জামাই। আমি গাড়িতে উঠছি। তুমি সামনে পা ঝুলিয়ে বস, গাড়োয়ানের সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা বল। আর যোগোকে যেমন ডাক, আমাকে তেমনি ডেক, কথা ব'ল।

হীরালাল যথাসাধ্য সেজেছে। ঘাড়ে মুখে পাউডারও মেখেছে। পান চিবিয়েছে। কোচা পুরেছে পকেটে। প্রায় বিস্মিত বিভ্রান্ত গলায় বলল, যোগোকে যেমন বলি, তোমাকে সেই রকম বলতে হবে?

—হ্যাঁ।

তটস্থভাবে বলল হীরালাল, পারব তো?

—পারতে হবে। আমি উঠলুম গাড়িতে।

গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল, জিনিস?

গাড়োয়ান বলল, সব ঠিক আছে। ছইয়ের মধ্যে, বাক্‌স প্যাঁটরা বিছানায় পোরা আছে সব।

দুর্গা ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বসল। হীরালাল গাড়োয়ানের গা ঘেঁসে সামনে বসল। ছইয়ের ভিতর থেকে দুর্গা বলল, চলে যাও যমুনামাসী।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

শুক্ল পক্ষ যদিও পড়েছে, আকাশে আলোর রেশও নেই। মেঘ ক'রে অন্ধকার আরো গাঢ় হ'য়ে উঠেছে। উঁচু পাড় থেকে খালের জল যদিও দেখা যায় না, তবু থেকে থেকে এক একটি ঝিলিক দেখা যায়। হয় তো জলের স্রোত সেখানে বাঁকা।

দুর্গা হীরালালের আরো কাছে এগিয়ে এল। হীরালাল তাড়াতাড়ি আরো সরে, গাড়োয়ানের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছিল। দুর্গা তার জামা ধরে টান দিল। বলল, আঃ যাচ্ছ কোথা? বস এখেনেই।

হীরালাল বলল, অ।

কিন্তু তার যেন ফিরে তাকাবার সাহস হচ্ছে না। দুর্গার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনের দিকে। বন্দুকধারী পুলিশ ক'টা কোথায় আছে কে জানে? কিছু হোক বা না হোক, টর্চ ফেলে ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। গাড়ির চাকায় কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ হচ্ছে। মাঝখানে আলো থাকায়, দুদিকে চাকার অতিকায় ছায়া দুটি অন্ধকারে বার বার হারিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি বেশ জোরেই চলেছে।

দুর্গা বলল গাড়োয়ানকে, অমন চুপচাপ কেন। বলদ দুটোকে এট্টুস্ হ্যাট্ হোট্ কর। অমন চুপ ক'রে থেক না।

গাড়োয়ান সাড়া শব্দ তুলল। দুর্গা হীরালালের পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল, কথা বল।

—অ্যাঁ? কী বইলব?

—যা খুশি,ঘরের কথা বল না আপন মনে।

—অ! তা' আজ হল গে' তোমার শনিবার, কাল আমাদের ওইখেনে হাট। দোকানটা না খুলতে পারলে—

এসব কথাই ভাবছিল বোধহয় হীরালাল। কাল তাকে যেমন ক'রে হোক দোকান খুলতে হবে।

গ্রাম ছাড়িয়ে এল। খাল থেকে যে-নয়নজুলি গ্রামের ভিতরে গিয়েছে, তার ওপরের কালভার্টটা দেখা গেল। গাঁয়ের লোকে বলে সাঁকো। এই সাঁকোটার ওপরেই একদিন দুর্গা বসেছিল। ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভোলা আর কেষ্টকে ন্যাড়াকালীতলায়। সেই পরিত্যক্ত সাহেববাগানটা বাঁ দিকে!

সাঁকোটা পার হ'ল। আর চাবুকের মত ঝল্‌কে উঠল তীব্র টর্চের আলো! দুর্গা চকিতে মুখ লুকাল হীরালালের পিঠের পিছনে। প্রশ্ন এল, কাহাঁ যাতা?

সেই বন্দুকধারী সেপাই ক'টা। ওরা কাছে এগিয়ে এল। টর্চের আলো হীরালাল আর গাড়োয়ানের মুখের ওপর। লুকিয়েছিল।

হীরালাল বলল, আজ্ঞে শহরে যাচ্ছি। গঙ্গার ওপারে, বারাকপুর থেকে বারাসত যাব।

সেপাইয়ের আলো গাড়ির ভিতরে পড়ল। দুর্গা তখন ঘোম্‌টা টেনেছে। যদিও সেপাইয়ের সামনে একেবারে মুখ ঢাকে নি। কারণ তারা সহসা দুর্গাকে চিনতে পারবে না।

একজন সেপাই ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, অন্দর মে কী আছে?

হীরালাল বলল, আঁজ্ঞে বউ আছে একজন। মানে কথা হল কি, আমার বউ।

কথা শেষ হবার আগেই, নীচে খালের ধার থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কী হল সেপাই জী। গাড়ি নিকি?

ধ্বক্‌ ক'রে উঠল দুর্গার বুকের মধ্যে। ভোলা! ভোলার গলার স্বর!

সেপাই জবাব দিল, হ্যাঁ।

ভোলা বলল, ছেড় না যেন। যাই আগে দাঁড়াও। কেষ্টা।

কেষ্টর গলা শোনা গেল, হাঁ।

—আয়, গাড়িটা দেখি কোত্থেকে এল।

কেষ্টর গলা শোনা গেল, যে-গুড়ের সন্ধানে আছি, তা মিলবে না।

ভোলা বলল, তা' জানি। দুগ্‌গা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

দুর্গার যতই সাহস থাক, নিশ্বাস ঠেকে রইল তার গলার কাছে। এখন হীরালাল ভরসা। ছইয়ের পিছনের মুখছাটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে।

ভোলা কেষ্ট দুজনেই এল। টর্চের আলো ফেলাই ছিল গাড়িটার ওপর।

ভোলা জিজ্ঞেস করল গাড়োয়ানকে, কে হে, চেনা মানুষ নিকি?

গাড়োয়ানটি নীরস গলায় বলল, দেখে লাও।

কেষ্ট বলল, দেখলেই তো চেনা যায় না। কোত্থেকে আসছ?

—বিমলাপুর।

ভোলা বলল, হু। দেখি সেপাইজী, আলোটা এট্টু ইদিকে মারো দিকিনি।

হীরালালকে দেখাল সে। আলো পড়ল হীরালালের ওপর। হীরালালের ঘাড়ে আর মুখে, পাউডারে ঘাম লেগে মেঘলা ভাঙা রোদের মত হয়েছে।

ভোলা কেষ্ট পাশাপাশি। রক্তাভ ভাবলেশহীন চোখ জোড়া ভিতরে। লাল শাড়ি, ঘোমটা ঢাকা মূর্তি তারা দেখতে পেল। দু'জনে মুখ চাওয়াচায়ি করল।

ভোলা বলল, বউ নিকি?

হীরালাল বলল, হ্যাঁ।

কেষ্ট আপন মনে উচ্চারণ করল, বউ।

—যাওয়া হবে কোথা?

ভোলা জিজ্ঞেস করল।

—বারাসত।

—আর এট্টু আগে বেরন উচিৎ ছেল যেন? সেই সদরে গে' রাত ক'রে গঙ্গা পার হ'তে হবে।

হীরালাল বলল, হ্যাঁ; এটটু তো দেরীই হয়ে গেছে।

ভোলা আর কেষ্ট আর একবার চোখাচোখি করল। ভোলা বলল, আমাদের ইদিক পানে, একজনা মেয়েমানুষের খোঁজ চল্‌ছে। তাই বলছিলুম, বউয়ের ঘোমটাখান একবার খোলা যায় না? মুখখান দেখব খালি।

সেপাই তিনজনেই মুখ টিপে হাসল। টর্চের আলোটা ভিতরে পড়ল ভাল ক'রে।

দুর্গা শক্ত হ'য়ে উঠল। ঘামতে আরম্ভ করেছে সে। তদ্রূপ অবস্থা হীরালালের। সে প্রায় আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলল, বউয়ের মুখ দেইখবেন কি মশাই। এ আবার কেমন কথা?

কেষ্ট বলল, আমরা আবগারির লোক। ক্ষেতি কিছু হবে না।

একজন সেপাই বলল, ঠিক হ্যায় বাবা জরুকে মু নহি দেখাও তো শমাম্ দেখা দো। হো যায়েগা, ব্যাস্। দারু উরু কুছ হ্যায় সাথ্ মে?

হীরালাল তাড়াতাড়ি বলল, এ তো বড় ভ্যালা বেপদ হল দেখছি। দারু পাব কমনে মশাই?

ভোলা জানে, আইন তার হাতে। সশস্ত্র সিপাহী আছে সঙ্গে। সে গাড়ির ওপরে পা দিল। বলল, দেখব সব জিনিস পত্তর।

ভোলার ছায়া প'ড়ে গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার হল এক মুহূর্ত। দুর্গা চকিতে সরে গেল পিছনের মুখছাটের কাছে। মাত্র দুটি গিট্। মুখছাট খুলেই, পিছন দিয়ে নেমে দৌড়ুনো ছাড়া গতি নেই। সকলেই গাড়ির সামনের দিকে আছে।

বিদ্যুৎ গতিতে গিট্ খুলল দুর্গা। যে মুহূর্তে ছইয়ের মুখছাট খুলে গেল, সেই মুহূর্তেই ভোলা চেঁচিয়ে উঠল, পালাচ্ছে।

বলেই সে ছইয়ের ওপর দিয়েই লাফিয়ে, বিশাল হিংস্র জানোয়ারের মত দুর্গার ওপরে পড়ল। পড়েই, একটা বীভৎস উল্লাসে আবার চীৎকার করে উঠল, দুগ্গা! দুগ্গা! পেয়েছি।

হীরালাল আর গাড়োয়ান দৌড়ুবার চেষ্টা করছিল। সেপাইরা তাদের ধরে ফেলল ছুটে। একটা হাঁক ডাক চেঁচামেচি পড়ে গেল।

কিন্তু ভোলা যেন কী এক অভূতপূর্ব আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তার বাহুর বেষ্টনীতে দুর্গা। একটা উদ্‌ভ্রান্ত শুয়োরের মত তার চোখ যেন দিশেহারা হ'য়ে গেল। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

কেষ্টও চেঁচিয়ে উঠল, দুগ্গা! দুগ্গা!

দুর্গা হ্যাঁচকা দিয়ে গর্জে উঠল, গায়ে হাত দিস্ না, খবরদার।

কিন্তু ভোলার বাহুবেষ্টনী আরো কঠিন হল। সে ভুলে গেল, তার কর্তব্য। সে ভুলল, সে কে! সে শুধু দেখল, সেই দুর্গা। তার রক্তের মধ্যে উন্মত্ত মহাপ্রলয়ের ঢেউ উঠল। সে দুর্গাকে মুহূর্তে

দু'হাতে তুলে, অন্ধকার খালপাড়ের ঢালু জঙ্গলে দৌড় দিল। পিছনে পিছনে কেষ্টা। আজ! আজ সেই দিন! কাল থেকে আর আবগারির কাজ নয়। একটা অধ্যায়ের শেষ।

দুর্গা ভোলার চুলের মুঠি ধরে টেনে চীৎকার করে উঠল, ছাড়্ ছাড়্ বলছি। ভোলা আরও হিংস্র হল। দুর্গার হাত ধরতে গিয়ে, ফ্যাঁস করে বুকের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। আছড়ে ফেলল দুর্গাকে কালকাসুন্দের জঙ্গলে। নুয়ে প'ড়ে কাপড় ধরে টানল।

সেপাইয়ের চীৎকার ভেসে এল, এই ভোলা, এই কেষ্টা, কাহাঁ রে?

দুর্গা একটা ভয়ংকর গর্জন করল। মনে হল, মাটি ফাটল। আকাশ কুটি কুটি হল। সেই সঙ্গেই ভোলার অন্তিম চীৎকার শোনা গেল, দুগ্—গা।

কিন্তু দুর্গার হাত থামল না। মুহুর্মুহু তার হাত বিষাক্ত ফনার মত বারে বারে ভোলার সর্বাঙ্গে ছোবলাতে লাগল। তার হাতে চিরঞ্জীবের দেওয়া সেই অস্ত্র। সাপিনীর মত গর্জাতে লাগল সে, ঢ্যাম্না, কুত্তা, গায়ে হাত দিবি?

কেষ্ট অন্ধকারের মধ্যেও ভোলার সেই ভয়ংকর মৃত্যু প্রত্যক্ষ ক'রে কাঁপতে লাগল। পিছন ফিরে দৌড়ে চীৎকার ক'রে উঠল, খুন! খুন করেছে ভোলাকে।

দু'জন সেপাই বন্দুক নিয়ে ছুটে এল। হাতে তাদের টর্চ লাইট। কিন্তু কেষ্ট দাঁড়াল না। সে ছুটতে ছুটতে একেবারে আবগারির অফিসে।

সেপাই দুজন থম্‌কে দাঁড়াল। ভোলার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। কিন্তু রক্তাম্বরী দুর্গা পালায় নি। হাতের অস্ত্র ফেলেনি। শুধু বুকের জামা ছিঁড়ে যাওয়া অনাবৃত অংশে আঁচল টেনে দিল। সন্দেহান্বিত রক্ত চোখে তাকাল সেপাইয়ের দিকে। বলল, রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে, দম নিয়ে নিয়ে বলল, ওকে মেরেছি। কোথা নে' যাবে চল।

সেপাই দুজনেই বন্দুক বাগিয়ে দুদিক থেকে ঘিরেছে দুর্গাকে। কিন্তু তারাও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একজন খালি বলল, মারডালা। জান সে খতম কর দিয়া।

বলাই যখন সদলবলে এল ওখানে দুর্গা তেমনি বসে আছে। খোলা চুল, গালে একটি ছোট কাটা দাগ। সেখান দিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তাম্বরী দুর্গাকে দেখে সবাই স্তব্ধ হ'য়ে গেল। চোখে কাজল, ঠোঁটে রং, কপালে ও সীঁথিতে যেন অঙ্গারের মত জ্বলজ্বলে সিঁন্দুর। এলো চুল। সঙ্গে নিয়ে আসা হ্যাজাকের আলো যেন দুর্গার গায়ে পড়েই দ্বিগুণ হল।

পায়ের কাছে প'ড়ে আছে ভোলা! চোখের পাতা আধখোলা। গলায় বুকে সুগভীর ক্ষতের মুখগুলিতে রক্ত ড্যালা পাকিয়ে গিয়েছে। খালি গা' ছিল সে। উরতের ওপরে উঠে গিয়েছে কাপড়। হা ক'রে আছে সে। জিভটা যেন গুটিয়ে গিয়েছে মুখের মধ্যে। ছোপ ধরা দাঁতের ভিতরগুলি দেখা যাচ্ছে।

সেইদিকে চোখ রেখেই বলাই ডেকে বলল, বিনয়, সাইকেল এনেছ?

—না স্যার।

—অফিস থেকে সাইকেল নিয়ে যাও থানায়। ও, সি, না থাকলে, যে-ই হোক, কাউকে আসতে বল। উইথ্ জীপ্ আসতে বলবে।

—আচ্ছা স্যার।

চলে গেল জমাদার বিনয়। ইতিমধ্যে গরুরগাড়ির বাক্স বিছানা থেকে মদের ব্লাডারগুলি বার করা হয়েছে।

বলাই বলল, কাসেম, ব্লাডারগুলি যেভাবে ছিল, সেইভাবে রেখে দাওগে।

যাই বড়বাবু।

তারপর? কথা ফুরিয়ে যেতে লাগল বলাইয়ের। হ্যারিকেন

হাতে লোকজন আসতে দেখা যাচ্ছে গ্রাম থেকে। ঝিঁ ঝির ডাক শোনা যাচ্ছে না যেন। কেউ কথা বলছে না। বলাই আর তাকাতে পারছে না দুর্গার দিকে।

শুধু নন্দকে কেউ দেখতে পেল না এই ভিড়ের মধ্যে। দেখল না, ছায়ার মত সরে গিয়ে, সে ছুটে যাচ্ছে নিল্লার দিকে।

বলাই একটু একটু ক'রে চোখ তুলল দুর্গার দিকে। দুর্গা পুবদিকে মুখ ক'রে বসেছিল। ওই দিকেই নিল্লা গ্রাম।

বলাই বলল, মদ নিয়ে যাচ্ছিলে দুর্গা ?

তেমন যেন রূঢ় হল না বলাইয়ের গলা। দুর্গা বলল, হ্যাঁ।

—ভোলাকে তুমি—

—মেরেছি বড়বাবু।

দুর্গা ব'লে উঠল। বলল, ও তো চোরা চালানদারনীকে ধরে নাই বড়বাবু, আমাকে ধরেছেল। বে-ইজ্জৎ করবে ব'লে টেনে নে' এসেছেল এখেনে। তাই মেরেছি।

বলাইয়ের মনে হ'ল, তার গলা স্খলিত শোনাবে। সে সাবধান হ'য়ে বলল, খুন করবে বলেই মেরেছিলে ?

হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে রেহাই দিত না। ধড়ে পাণ থাকতে না।

দুর্গা সকলের মুখের দিকে তাকায়। অনেক লোক এসেছে। চেনা অচেনা, অনেক লোক এখনো আসছে। হাট বসার মত। 'কিন্তু সেই মুখটি কোথায় ? আসবে না ? রাগ করবে ? ঘেন্না করবে খুনী দুর্গাকে ? মুখ দেখবে না আর ? দুর্গা অবাধ্য হয়েছে, তাই ? বারণ মানে নি ব'লে রাগ হবে, না ?'

কারা যেন ছুটে এল। দুর্গা ব্যাকুল চোখ তুলে তাকাল। 'না, সে নয়। কেউ কি তাকে একটু খবর দেবে না ? যদি চালান ক'রে দেয় আগেই ? খুন করলে ফাঁসী হয়। আর কি তাকে দেখতে পাব না ? একবারটি ? একবারটি শুধু।······হীরালালের দোষ

আমি কাটিয়ে দিয়ে যাব, গাড়োয়ানেরও। বড়দি মেজদি'র (সুশীলা অচলা) বিয়েটা দেখা হবে না। গুলি, নন্দদা, বেদো খুড়ো, ডোমনি খুড়ি, যমুনা মাসী, যোগো, ওদের বোধহয় আর দেখতে পাব না, না? আমার বাবা, বাঁকা বাগ্‌দি আমার বাবা। সে কি এ সব দেখতে পাচ্ছে? বাবা গো। অই দেখ, তুমি কাঁদছ। আমি কাঁদি না। তুমি জানতে, এ সোম্‌সারে কাঁদলে কিছু হয় না। তুমি তো সব দেখেছ বোধহয়? ও জানোয়ারটার মরণ লিখা ছিল নিশ্চয় আমার হাতে। সেইদিন, ভোরবেলা, হাটের ধারে আমার এই কথা মনে হয়েছিল। তাই হল।

'কে? এল নাকি? না, সে নয়। বোধহয় আসবে না। খবর দিলেও না। আমি অবাধ্য হয়েছি। কথা শুনিনি। রাগ করে বলবে, 'যা খুশি হোক্, যাব না।' তবু রাগ ক'রে এলেও তো একটু দেখা হ'ত। সাত তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তাকে এই বেশে দেখা দেব ভেবেছিলুম।

আশ্চর্য! আজ সিঁদুর পরলুম। আজই শেষ। আজই প্রথম। এমনও হয়। সোনার হারটাও তো পরেছি। একবার দেখে গেলে পারত। বেশ তো, কথা শুনিনি। আর তো কোনদিন দুগ্‌গা অবাধ্য হবে না। এই তো শেষ। আজ আর ছোট্‌ঠাকুর বলতে ইচ্ছে করছে না। চিরঞ্জীব নামও না। কোন নাম নয়। একটা মূর্তি, একটা মূর্তি শুধু। কোনো নাম দিয়ে যাকে চেনা যায় না। শুধু মুখ চোখ দেখলেই হয়।'

একটু বাতাস এল। মৃত ভোলার গায়ের লোমগুলি শিউরে উঠল। এতক্ষণ পরে, গলার ক্ষত দিয়ে আবার খানিকটা রক্ত উপ্‌ছে এল।

'আচ্ছা, গত মাসে তো আমার কিছু হয়নি। যমুনা মাসীও বলেছিল, 'তোকে যেন কেমন কেমন দেখায় দুগ্‌গা।' তা' হ'লে? যদি

ফাঁসী হয়? আমার ফাঁসী হ'লে গর্ভের জীব কি বাঁচবে? তা কখনো বাঁচবে না। বাবা, তুমি তো সব জান। আর একটা কথা তাকে আমি বলব। যদি সে আসে। নইলে বলতে ব'লে দিয়ে যাব। বলব, 'এ সমাজে সোম্‌সারে এত জ্বলছিলুম। রাগ ক'রে শোধ নিচ্ছিলুম। সদরের মেয়ে পাড়ায় গে' বসি নাই। তবু বলব, আমি বলব তোমাকে, আমার ইজ্জতে লাগছেল। তোমারও যেমন লাগছেল। কেন? এ পথে যদি এলুম, তবে ইজ্জতের খিদে কেন? তোমাকে কেন আমি মানী দেখতে চেয়েছিলুম? তোমার মানে মানিনী হতে চেয়েছিলুম। তা যখন এ সোম্‌সার দেবে না; তখন, (পা'য়ে পড়ি রাগ ক'র না) ফিরে এস। এ পথে আর নয়।' কিন্তু বলা হ'ল না। বলব বলব ক'রে বলা হ'ল না। তার আগেই শেষ হল। তবু একবারটি এস। একবারটি ব'লে যাব।'......

জীপ গাড়ির শব্দ শোনা গেল ওপরের রাস্তায়। ও. সি. র চীৎকার ভেসে এল, সান্ন্যাল!

—ইয়েস?

—ইজ্‌ ইট্‌ রিয়্যালী মার্ডার?

—ইয়েস!

ও. সি. হুড়মুড় ক'রে নেমে এল। এসে দুর্গা আর মৃত ভোলাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়াল। বলাইকে জিজ্ঞেস করল, ইজ শী?

বলাই বলল, হ্যাঁ।

—স্বীকার করছে নাকি?

—হ্যাঁ! নিজেই বলছে।

—কারণ?

—ওকে নাকি রেপ্‌ করার চেষ্টা করছিল।

—আই সী? কোয়ায়েট ইয়ং গার্ল? হু ইজ শী? ছ্যাট্‌ টাইগ্রেস্‌, আই থিঙ্ক? বলাই বলল, হ্যাঁ।

গলা নামিয়ে বলল ও. সি, বাট্ হোয়াই ইও আর লুকিং সো ডেজ্জার্টেড্ ?

বলাই বলল, ভাল লাগছে না। আচ্ছা, ওকে কি থানায় নিয়ে যাবেন ?

—হ্যাঁ তাই তো উচিৎ। কেস্ তো বোধ হয় দুটো। ইল্লিসিট্ লিকার এ্যাণ্ড্ মার্ডার। সঙ্গে আরো লোক আছে নাকি ?

—আছে। তবে তারা প্রায় আদার ব্যাপারী। বড় জোর কিছু ফাইন হতে পারে।

ও. সি. আর একবার দুর্গার দিকে তাকিয়ে বলল, এ তো ম্যারেড্ দেখছি।

বলাই বলল, তা প্রায় তাই বলা যায়। যদিও, লীগাল ম্যারেজ কিছু হয়নি। আর সেই লোকটির কথা ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। সবাই এল। সে আসেনি।

ও. সি. বলল, নাউ দি হানি ইজ্ ইন্ বোট্‌ল। হোয়াই হি শুড্ কাম।

সেই চিরঞ্জীব ব'লে ছেলেটা তো ? আমি তো তাকে চিনি বিলক্ষণ। পলেটিকাল রেকর্ডে তো তার নাম আছে এখনো। কিন্তু তাকে তো ফাঁসাতে পারবে না।

বলাই বলল, একমাত্র মেয়েটাই পারে। কিন্তু সে আশা না করাই ভাল।

ও. সি. চীৎকার করে এস. আই. দাশকে ডেকে বলল, কই দাশ, ডিটেল ডেস্‌ক্রিপশন লিখুন একটা তাড়াতাড়ি, তারপরে সব নিয়ে চলুন। যে মরেছে, সে তো একসাইজ'এর ইনফর্মার ?

—হ্যাঁ, কণ্ট্রাক্টে কাজ করত।

—এক কাজ করলে হয়। জীপে তো ডেড্‌বডিটা তোলা যাবে না। গরুর গাড়িটাতেই তুলে নেওয়া যাক্।

তাই সাব্যস্ত হ'ল।

কিন্তু বলাই চারদিকে কোথাও অখিলবাবুকে দেখতে পেল না। সে রাস্তার ওপরে উঠে এল। যেখানে হীরালাল আর গাড়োয়ান সহ গাড়িটা ঘিরে রয়েছে সেপাইরা। কিন্তু অখিলবাবু কোথায়? কাসেমকে জিজ্ঞেস করল সে, অখিলবাবু কোথায়?

একটা গাছতলার অন্ধকার থেকে প্রায় সুপ্তোত্থিত গলা ভেসে এল, এই যে স্যার। কিছু বলছেন?

হ্যারিকেনের আলোয় অখিলবাবুর মুখটা দেখে অবাক হ'ল বলাই। কেমন যেন ঘুম ভাঙা, স্বপ্ন ভাঙা দেখাচ্ছে তাকে। বলাই বলল, কী করছিলেন?

অখিলবাবু বললেন, বসেছিলাম। ভাবছিলাম ব্যাপারটা।

বলাই তবু অবাক হ'য়ে বলল, ও!

অখিলবাবুর গলাটা মোটা শোনাল। বললেন, হ্যাঁ ভাবছিলাম স্যার। মানে, অনেকদিন আছি এখানে, ছোটবেলা দেখেছি মেয়েটাকে তাই আর কি। আমাদের আর কি, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, কিন্তু পাপ আমাদের ছাড়ল না।

বলতে বলতে অখিলবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, আমিও একটা স্কেচ্ ক'রে ফেলি, দরকার হবে তো। কাগজ নিয়েই এসেছি।

বলাই তাকিয়ে দেখল অখিলবাবুকে। কোন্ পাপের কথা বললেন অখিলবাবু, কে জানে।

রাত এগারোটা বাজে। বলাই থানা থেকে ফিরবে ভাবল। কাসেম ছাড়া নিজের অফিসের সবাইকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। থানার ও. সি. সংলগ্ন কোয়ার্টারে খেতে গিয়েছে। এলেই বলাই চলে যাবে। দুর্গা মেঝেয় বসে আছে পা গুটিয়ে। ভোলার মৃতদেহ একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে, বারান্দায় রেখেছে সেপাইয়ের হেফাজতে। কাল জেলা সদরের মর্গে যাবে। দুর্গাকেও কাল মহকুমা হাজতেই পাঠিয়ে দেওয়া

হবে। এখানকার হাজত ঘরে বসে আছে হীরালাল আর গাড়োয়ান। দুর্গাকে জামীন নিশ্চয় দেওয়া হবে না। ওদের দুজনকে দিয়ে দেবে।

এস. আই. দাশ আর ও. সি. এতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে স্টেট্‌মেন্ট্‌ নিয়েছে দুর্গার। এবার ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখে নিচ্ছে দাশ।

বলাই দেখল, দুর্গার আঁচল খসে গিয়েছে। ভোলার থাবার আঘাতে যেটুকু অনাবৃত হয়েছিল, আর তা ঢাকতে ভুলে যাচ্ছে সে। বলাইয়ের সন্দেহ হল, ওই মৃত ভোলারই দাঁতের দাগ দুর্গার গালে। দুর্গার অপলক চোখ দুটি বাইরে। বলাই জানে, দুর্গার চোখ কার অপেক্ষায়। এত ঘৃণা বুঝি আর কোনোদিন হয়নি চিরঞ্জীবের প্রতি।

সে ডাকল, দুর্গা।

—অ্যাঁ?

দুর্গার যেন চমক ভাঙল।

বলাই বলল, চিরঞ্জীব এল না।

দুর্গা কোনো জবাব দিল না।

বলাই বলল, তুমি ওকে ছেড় না দুর্গা, তুমিও ওকে শিক্ষা দাও। ওকে ধরিয়ে দাও। কী পেলে তুমি ওর কাছে?

দুর্গা যেন শুনতেই পায় নি। সে একাগ্র হ'য়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। যেন ধ্যানে বসে আছে।

ও. সি. এল ঘরে। বলাইকে বলল, আছেন এখনো?

বলাই বলল, হ্যাঁ। একটা কথা বলছিলাম। চিরঞ্জীব যদি আসে—

বলাইয়ের কথা শেষ হল না। ও. সি. যেন কী ব'লে উঠতে যাচ্ছিল। সেপাইয়ের গলার রুক্ষ স্বর শোনা গেল কেয়া মাংতা?

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। ও, সি, গর্জে উঠল, বস, বস তুমি। কে?

চিরঞ্জীব দরজায় এসে দাঁড়াল। যেন চিরঞ্জীবের গলা নয়, আর কারুর চুপিচুপি গলার স্বর। যাব স্যার ?

ও, সি. বলল, কাম ইন্। চিরঞ্জীব ব্যানার্জি ?

—হ্যাঁ।

চিরঞ্জীব ঢুকল দুর্গার দিকে তাকিয়ে। বলাই ইশারা ক'রে, ও, সি.. কে চুপ করে থাকতে বলল। দুর্গার চোখের পলক পড়ল না। কী যেন বলছে দুর্গা ফিস্‌ফিস্ ক'রে। চিরঞ্জীব একবার তাকাল দারোগার দিকে। আবার ফিরল দুর্গার দিকে।

দুর্গার হাতটা ক্রমেই থানার পাথরের মেঝে খামচেখামচে অগ্রসর হতে লাগল। চিরঞ্জীবের পায়ের কাছে এসে থামল। কিন্তু কারুর চোখ থেকে কেউ চোখ সরাতে পারল না। দুর্গার অনুচ্চারিত কথা অস্ফুটধ্বনিতে এবার উচ্চারিত হল, মাপ্ কর, মাপ কর, আমাকে মাপ কর। রাগ ক'র না। ও আমাকে রেহাই দিত না, তাই মেরেছি। রাগ ক'র না। আমি এমন কাজ আর কখনো করব না।

কিন্তু চিরঞ্জীব কিছুই শুনতে পেল না। সে দুর্গার সিঁথি দেখছে, কপাল দেখছে, গলা দেখছে, বেশ দেখছে। চোখে চোখে তাকিয়ে দেখছে। কিছু শুনছে না। শুধু দুটি হাতে অক্ষম রক্তের দাপাদাপি। ওই প্রতিটি চেনা অঙ্গকে আঁকড়ে বুকে নিতে ইচ্ছে করছে। শুধু অর্থহীন প্রলাপের মত একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, এ কি করলি দুর্গা ?

এবং তার মুখ দিয়ে সেই কথাটাই বেরিয়ে এল, এ কি করলি দুর্গা ?

দুর্গা চোখ নামাল না। মাথা ঝাঁকিয়ে খালি বলল, জানি না, জানি না। ও আমাকে রেহাই দিত না, তাই। তাই। সেই অস্তরখানি যে আমার কাছে থাকত। ও যে জানোয়ার হয়ে গেছল।

কিন্তু চিরঞ্জীবের কানে কয়েকদিন আগে, দুর্গার সেই কথাগুলি বাজতে লাগল, মরব, মরব, মরব।

চিরঞ্জীব যেন টুটি-টেপা গলায় বলল, কোনো পথ রাখলি নে? একটু ফাঁক রাখলি নে দুর্গা?

দুর্গার হাত তখন চিরঞ্জীবের শ্যাণ্ডেল সুদ্ধ পা ছুঁয়েছে। অসহায় কান্নায় বলল, ত্যাখন যে কিছু মনে ছেল না। কিছুটি না। অসুরের মতন আমাকে কাঁধে ফেলে নে' ছুটতে লাগল খাল ধারের জঙ্গলে। আমাকে বে-ইজ্জৎ করতে লাগল।

বলতে বলতে দুর্গার জলে ভেজা চোখে আবার আগুন ফুটল। অঙ্গারের মত দপ্‌দপিয়ে উঠল সারা মুখ। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র। বলল, ত্যাখন কি কিছু মনে থাকে ছোট্‌ঠাকুর? রক্ত দশ্‌শন করতে ইচ্ছে যায় না? আবার হ'লে আবার মারব আমি। যতবার হবে, ততবার। তুমি হলে কি করতে?

চিরঞ্জীব হাত বাড়িয়ে দিল দুর্গার মাথায়। উপুড় হ'য়ে বলল, জানি দুর্গা জানি—

ও. সি বলে উঠল, নো মোর। ডোণ্ট্‌ টাচ্‌ হার। সরে আসুন আপনি।

ও. সি. হাতের ইশারা করল চিরঞ্জীবকে। চিরঞ্জীব দুর্গার দিকে চোখ রেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। বুকের বোতাম খোলা, উসকো খুসকো চুল, কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি, কালি পড়া চোখের কোলে, নত মাথা চিরঞ্জীবকে দুর্গার চেয়ে বেশী করুণ দেখাল। চোখে তার জল নেই। কিন্তু তার চেয়ে বেশী। এসব ভাবলেশহীন অসহায় মুখ তার কোনোদিন কেউ দেখেনি।

কথা বলতে গিয়ে ওই দৃঢ় দুর্বিনীত ঠোঁট কেঁপে যেতে দেখে নি কেউ।

চিরঞ্জীবের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে, দুর্গা আঁচলে বুক ঢাকল। তার রক্তের অশেষ তৃষ্ণা নিয়ে সে চিরঞ্জীবের বুকের দিকে তাকাল। তার

শেষ শক্তি দিয়ে সে পা চেপে ধরল চিরঞ্জীবের। চিরঞ্জীব অন্যদিকে মুখ করে বলল, ছাড় দুর্গা।

ও. সি. বলল, বেল দেবার কোনো প্রশ্ন-ই নেই। সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে। কোর্ট অনুমতি দিলে দেখাও করতে পারবেন এখানে নয়, সম্ভবত জেল-হাজতে। আর ওই দুটি কালকেই বেল পেয়ে যাবে হয় তো।

হীরালাল আর গাড়োয়ানকে দেখিয়ে বলল ও. সি.। হাতের ঘড়ি দেখে বলল আবার চিরঞ্জীবকে, ইউ বেটার গো নাউ। দুর্গাকে আমি এবার অন্য ঘরে তালা বন্ধ ক'রে দেব। দুর্গার হাত আস্তে আস্তে শিথিল হ'ল চিরঞ্জীবের পা থেকে। চিরঞ্জীব সরে এল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ওদের পরস্পরকে বেঁধে রাখতে চাইল।

চিরঞ্জীবের মনে হল, কী যেন একটা ঠেলে আসছে তার বুক থেকে। তার শক্ত নিষ্ঠুর দুর্বিনীত বুক থেকে। আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলে, বুক থেকে ঠেলে আসা দারুন কঠিন শক্ত জিনিসটি ফেটে বুঝি চৌচির হ'য়ে যাবে। সে জোর করে চোখ ফেরাল। মুখ ফেরাল। ফিরতে যাবে, দুর্গা সহসা ডেকে উঠল।

—ছোট্‌ঠাকুর, শোন গো—

চিরঞ্জীব ফিরল। যেন স্বাভাবিক গলায় বলল, শিকেয় তোমার জন্যে মাছ ঝাল দেয়া তুলে রেখে এসেছি। আর নিরিমিষ তরকারি—

চিরঞ্জীব এবার অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, দুর্গা! দুর্গা!

সেকথা শুনতে পেলনা দুর্গা। বলল, তোমার ভাতও শিকেয় তোলা। নন্দদাকে ব'লে এসেছি। আজ সে বেড়ে দেবে, খেয়ো কিন্তুন্, বুঝলে?

চিরঞ্জীব তেমনি অপরিস্ফুট আর্তধ্বনি ক'রে বলল, তুই সত্যি বাঘিনী-রে? সত্যি!

দুর্গা তখনও বলে চলেছে, আর কুলুঙ্গিতে তোমার মাজা গেলাস

রয়েছে। ওতে ক'রে জল দিতে ব'ল। আর গুলিকে ব'ল ছোট্‌ঠাকুর, আমার ভাত তরকারীগুলোন যেন ও খায়। আর—

চিরঞ্জীব এবার রুদ্ধস্বরে মিনতি করল, চুপ কর দুর্গা, চুপ কর। বলব, সব বলব, সব করব,যা বললি।

ও, সি, আর কথা বলতে দিল না। চিরঞ্জীবের সামনে এসে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল চিরঞ্জীব। দুর্গা তাকিয়ে ছিল তৃষ্ণার্ত ব্যাকুল চোখে।

কাপড়ে ঢাকা মৃতদেহটির দিকে একবার তাকিয়ে, ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে এল চিরঞ্জীব। বৃষ্টি আর আসে নি। কিন্তু মেঘ আছে, অন্ধকার করে আছে তেমনি। নির্জন অন্ধকার রাস্তা, আকাশ, গাছ, সব যেন আজ দুর্গার জীবনের মত বাতাসহীন কালো আড়ষ্ট অর্থহীন।

কোন্‌দিকে যাবে চিরঞ্জীব? এখন কি নিল্লায় যাবে আবার? সেখানে সবাই তার জন্য বসে আছে। আজ বাইরে মদ চালান যাবার কথা নয়। কানা নদীর ধারে যে পুরনো কালী মন্দির রয়েছে, তার একটি সুড়ংঘর আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ওর ভেতরে গেলে, কেউ কোনদিন ফেরে না। যেতেও নেই নাকি। কোন এক সময় নাকি নরবলি হত ওর ভিতরে। নরকঙ্কালে নাকি ঠাসা আছে সুড়ংঘরটা। তার ওপরে যখন বড় বড় অজগরেরা চ'লে বেড়ায়' তখন সেই হাড়ে মড় মড় শব্দ ওঠে। অনেকে অনেকদিন নাকি শুনতেও পেয়েছে। সেই কালী মন্দিরের পাতাল ঘর আবিষ্কৃত হ'য়েছে। শূন্য ঘর। শুধু একটি কালো পাথরের শিলিঙ আছে ঘরের মাঝখানে। সাপ হয় তো আছে, মানুষের সাড়া পেলেই পালাবে। আজ কথা ছিল, সেই পাতালঘরে মদ রেখে দেওয়া হবে। যা-কিছু সরঞ্জাম, সব চলে যাবে সেখানে।

কিন্তু নিল্লায় যেতে ইচ্ছে করল না চিরঞ্জীবের। গ্রামের পথেও যে সে চলছে না, সে খেয়াল নেই। হ্যাড়াকালীতলার দিকে চলছে সে। জেনে নয়, অজান্তে।

এমন সময় বলাই বেরিয়ে এল থানা থেকে। ও, সি, তাকে জীপ গাড়ি নিয়ে যেতে বলেছিল। সে যায়নি ইচ্ছে করেই। অন্ধকারে লক্ষ্য করে সে ডাকল, চিরঞ্জীববাবু!

চিরঞ্জীব ফিরল। দূর থেকেই জিজ্ঞেস করল, কী বলছেন?

—শুনুন।

চিরঞ্জীব ফিরে বলাইয়ের কাছে এল।

বলাই বলল, কোথায় যাচ্ছেন ওদিকে?

বলাইয়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সন্দেহ করল, চিরঞ্জীব হয় তো তার সেই একই কাজে ফিরে যাচ্ছে এখুনি। যদিও গলার স্বরটা অন্যরকম লাগল তার।

চিরঞ্জীব বলল, এমনি যাচ্ছিলুম। কোথাও ভেবে নয়।

বলাই বলল, বাড়ি যান। দুর্গা আপনার জন্যে রান্না ক'রে রেখে এসেছে। আপনার গিয়ে খাওয়া উচিত।

চিরঞ্জীব বলল, আশ্চর্য! আজ দুর্গা আমার জন্য শেষ রান্না করে রেখে এসেছিল।

বলাই বলল, শেষ নাও হতে পারে। সবই তো আপনার জন্যে। এর পরে যদি আর সুযোগ পান—

কথা শেষ হবার আগেই চিরঞ্জীব বলে উঠল, আচ্ছা আমাকে থানার এই উঠোনটায় বসে থাকতে দেবে?

—লাভ কী? বাড়ি যান। চলুন, আমিও যাব।

চিরঞ্জীব চলতে লাগল বলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে। চিরঞ্জীবের খালি পা। সে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থাতেই ছুটে এসেছিল। গভীর অন্ধকার রাত্রির বুকে বাজতে লাগল বলাইয়ের জুতোর শব্দ।

—এবার কী করবেন ভাবছেন চিরঞ্জীববাবু?

বলাই জিজ্ঞেস করল। চিরঞ্জীব বলল জানি নে।

বলাই বলল, আপনি নিশ্চয় জানেন, দুর্গার ভীষণ আত্মসম্মান

বোধ ছিল। আপনাদের এ জীবন বোধ হয় সে আর ইদানিং সমর্থন করছিল না।

চিরঞ্জীব বলল, এখন যেন তাই মনে হচ্ছে।

—কিন্তু অনেক মূল্য দিয়ে।

বলাই বলল।

অনেক মূল্য! কত মূল্য? কী দিয়ে তা নির্ধারণ করা যায়? কী মূল্য ছিল দুর্গার? হয় তো এ সংসারের মানুষদের কাছে কানাকড়িটিও নয়। কিন্তু চিরঞ্জীবের জীবনে বা কত কড়ি? মূল্য শব্দটাই যেন অবাস্তব বোধ হতে লাগল।

আবগারি অফিসের সামনে বলাই বিদায় নিল। বলল, আচ্ছা কাল কোর্টে দেখা হবে।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে দুর্গার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। সে বুঝতে পারল, বাতি না জ্বেলে দাওয়ায় অনেকে বসে আছে। নন্দ, গুলি, বেদো, যমুনা, যোগো, সবাই। থেকে থেকে, আচমকা এক, একটা কথা বলছে তারা।

কিন্তু চিরঞ্জীবের পা উঠল না। যেন শক্ত ক'রে কেউ ধরে আছে। এ বাড়িতে দুর্গা নেই। আর কোনদিন আসবে কি না কেউ জানে না। এ বাড়িতে আর কেমন ক'রে ঢোকা যায়?

এ বাড়িতে ঢোকা যায় না। পিছন ফিরলে, এই যে গ্রাম, এই গ্রামে কি থাকা যায়? সকল পথে দুর্গার পায়ের শব্দ কি বাজবে না? এই গ্রামের রাতে, এই গ্রামের স্তব্ধ দুপুরে দুর্গার উচ্চ হাসি কি প্রতিধ্বনি করবে না?

এই গ্রামে থাকা যায় না, এই দেশে থাকা যায় না। কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাদ দিয়ে কি বাঁচা যায়? ছিন্নবাধা দুর্বিনীত হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে কি নামটা বাজবে না? অহর্নিশ চলার সব অহঙ্কার কি ঘুচবে না? চলার বেগের ছন্দটা কি ফাঁকি মানবে? সে কি বেয়াদপ, বিদ্রোহী ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াবে না?

দুর্গা কি কখনো ছেড়ে যাবে ? এই তো সবে শুরু। দুর্গার এই তো সবে শুরু। কারণ এই বাড়ি থাকবে, চিরঞ্জীব থাকবে। তাই আর এক দুর্গার শুরু হবে। এই বাড়ি দেখিয়ে লোকে বলবে। চিরঞ্জীবকে দেখিয়ে লোকে বলবে। চিরঞ্জীবের সকল পারের ঘাটে ঘাটে নিরন্তর খেয়ায় দুর্গা ব'সে থাকবে তার নিশিন্দা-পাতা আয়ত চোখ দুটি তুলে। তার ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে।

না, যেতে হবে ওই ঘরে। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে, মাজা গেলাসে জল পান ক'রে, অনিশ্চিত অন্ধকার বিহারের পথে যেতে হবে।

শ্রীধরদাসের পরাজয় হয়েছে নির্বাচনে।

চিরঞ্জীবের মনে হয়েছিল, এ পরাজয় যেন তার জীবনেরই চকিত আঘাতের সঙ্গে যুক্ত। অথচ কত নিশ্চিত ছিল। সন্দেহের অতীত। এখন মনে হয় বোধ হয় তাই এই পরাজয়। এত নিশ্চিত, এত নিশ্চিন্ততাই বুঝি ডেকে আনল সব পরাজয়। ভোটের সময় অনেক সভা হয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরের মধ্যে তেমন সভা হয়নি। উন্নয়নমূলক যেসব কাজের মধ্যে সমিতির সকলের থাকার কথা ছিল, সেগুলি সেই একই সরকারি দপ্তরের লোকেদের হাতেই থেকে গিয়েছিল। সেটা সরকারি অফিসের জোরে নয়, নিজেদেরই আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ওপর একটুও জোর দেওয়া হয়নি। যেন, বিধানসভার সদস্য নিজেদের লোক আছে ব'লে পঞ্চায়েতের ওপর অধিকারটা কেউ বড় ক'রে দেখে নি। গত বছর মজুরির আন্দোলনের জন্য যে কৃষকেরা সকলেই প্রস্তুত ছিল কিংবা অন্যায় ভাবে ক্যানেল কর আদায়ের বিরুদ্ধে যে দৃঢ় মনোভাব ছিল, কোনোটাই যেন তেমন আমল পায় নি। অবিশ্বাস ও হতাশা বাড়ছিল।

নতুন কোনো তথ্য বা চিন্তা নয় এসব। গোটা কৃষক আন্দোলনকে যদি একটি পরিবারের বিষয় ভাবা যায়, তবে এগুলি প্রত্যহের

খুটিনাটির মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন পড়েনি? কে জানে, কেন? চিরঞ্জীব তার কিছুই জানে না।

কিন্তু আশ্চর্য। চিরঞ্জীব এসব কথা ভাবছে কেন? এ বিষয়গুলি তো তার চিন্তায় আসার কথা নয়। পাঁচ বছরের এসব ভাবনা কোথায় লুকিয়েছিল তার? অবচেতনের কোন্ স্তরে?

আরো আশ্চর্য! আজ -গার মাস পূর্ণ হল দুর্গার মামলার। রায় শুনে ফিরছে এখন চিরঞ্জীব। আরো আগেই মামলা শেষ হ'ত। জেল হাসপাতালে দুর্গার একটি অকাল মৃত সন্তান হয়েছিল। এখন ভাল আছে। যদিও দুর্গার চেহারাটা একেবারেই বদলে গিয়েছে। রোগা হয়েছে, তাই লম্বা হয়েছে। চোখ দুটি আরো বড় দেখায় আজকাল।

আজ মামলার রায় শুনে এল। জেলা সদর থেকে ফিরছে সে এখন। মহকুমা জংশন স্টেশন থেকে যে-গাড়ি বদলে আসতে হয়, সেই গাড়িতে উঠেই সে দেখল সপারিষদ গোলকবিহারী মিত্র। নব-নির্বাচিত এম. এল. এ। তাই বোধহয় কথাগুলি মনে পড়ল। নইলে যে-গোলকের ওপর কোনো গ্রামের একটু আস্থা নেই, সে কেমন ক'রে নির্বাচিত হল। ভুয়া ভোট আর কত দিতে পারে। প্রায় চার হাজার ভোট কম পেয়েছেন শ্রীধরদা।

যদিও এই ভোটের রাজনীতির ওপরে একটুও আস্থা নেই চিরঞ্জীবের। তার ধারণা, ওটা একটা খারাপ ব্যবসায়ের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সাধারণ মানুষকেই যেন বিষাক্ত এবং হতাশ করা হচ্ছে। অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের জমি থেকে সরান গেল না। সর্বক্ষেত্রে প্রায় তাদেরই নেতৃত্ব। 'কৃষকের হাতে জমি দাও' এ শ্লোগান তারা. কোনোদিন সার্থক হ'তে দেবে না। এ্যাসেম্বলী আর পার্লামেণ্ট তো এক ভিন্ন জাতীয় কথাকারদের কারখানা। সৌখীন মলাটের সাহিত্যের মত তা হাতে হাতেই ফেরে কোথাও কোনো বীজ পড়ে না। অঙ্কুরিত হয় না কিছুই।

ভাগ্যিস, কথাগুলি মনে মনেই ভাবছে। লোকে জানলে, এই ভাববার অধিকারটুকুও তার ছিল না! উচ্চারণ তো দূরের কথা। চিরঞ্জীব খুনী মদ-স্মাগলার দলের নেতা। সে জানে, ট্রেনের কামরায় শুধু গোলোক মিত্তিরেরা-ই নয়। অনেকে তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। যারা তাকে চেনে। কত কী ভাবছে তারা। কত রূপকথা, কত উপন্যাস তার নামে রটেছে। এখনো সে এক ভয়ংকর ইতিকথার নায়ক। সে কেন ওসব কৃষক আন্দোলন, রাজনীতির কথা ভাববে।

গুলিটা সঙ্গেই রয়েছে। সে বলল, চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে দাও চিরোদা। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না ?

গায়ের চাদর খুলে পড়েছিল কোলের ওপর। ঠাণ্ডা আছে কিন্তু চিরঞ্জীবের শীত লাগছে না। বরং কেমন যেন গরমই লাগছে। জিভটা শুকিয়ে উঠছে। আজকাল তার জিভ শুকিয়ে যাওয়াটা ব্যাধির পর্যায়ে পৌঁছেছে। চোখে কতগুলি লাল ছর্ পড়েছে। চুলগুলি বেয়ে পড়েছে ঘাড়ের পাশ দিয়ে। চোখের কোলে বাসা বেঁধেছে স্থায়ী অন্ধকার। তার মুখে যে এত কাটা ছেঁড়া দাগ আছে, আগে যেন টের পাওয়া যেত না। এমনি সহসা বোঝা যায় না কতখানি শরীর ভেঙেছে তার। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যে চিরঞ্জীব যেন অনেক বয়স্ক হ'য়ে গিয়েছে। সিগারেট টানলেও, তার দমক সহ্য করতে পারে না। হাঁফ ধরার মত কাশে। অল্প দামের সিগারেট সব সময়ে তার ঠোঁটে আছে। অথচ তিরিশেও পৌঁছয় নি সে।

চাদরটা তুলে নিল গায়ে। বাইরে মাঠ এখন রিক্ত। ধান কাটা সারা, খানে খানে রবি শস্য কিছু আছে। অড়হর, মুগ, কলাই।

মনে করতে না চাইলে কী হবে। সেই মুখখানি ভেসে উঠল আবার। কালো পাড় শাড়ি, সাদা মোটা কাপড়ের একখানি ব্লাউজ পরা, একহারা দুর্গা। বিচারক যখন রায় দিলেন, দুর্গা তার দিকেই তাকিয়েছিল।

সরকারি উকিলের শেষ কথাগুলি ওর মনে পড়ছে। 'মানবতার' দোহাই দিয়ে সে বিচারককে বলেছিল, 'যাকে আমরা এখন দেখছি, এই পারুলবালা দাসী'—

পারুলবালা! কী আশ্চর্য নাম দুর্গার। কত সময় চিরঞ্জীবের ওই নামে ডাকতে ইচ্ছে করেছে। লজ্জায় পারত না। আবেগ যখন বাধা মানত না, তখনই বলতে পারত।

'—এই পারুলবালা দাসী, ওরফে দুর্গা, একে এখন দেখে খুবই ভাল মানুষ মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, পাপ দেহ ব্যবসা থেকে শুরু ক'রে (সরকারি উকিলের তাই বিশ্বাস), নিজের হাতে বে-আইনি মদ চোলাই, নানান অভিনব পন্থায় স্মাগলিং এবং সর্বোপরি খুন, এটাই হচ্ছে তার স্বাভাবিক প্রাত্যহিক জীবন। আবগারি তার নাম-ই দিয়েছিল বাঘিনী। আই মীন্ টাইগ্রেস্। এমনিই ভয়ংকর নিষ্ঠুর হিংস্র এই মেয়েমানুষটি। পৃথিবীর আলো বাতাস এর জন্যে নয়। এর মৃত্যু হলেই দেশের মঙ্গল। দশের মঙ্গল। বিচারকের কাছে আমার প্রার্থনা'—

তখন চিরঞ্জীবের চোখে কি আগুন জ্বলছিল! দুর্গা তার বড় বড় চোখ দুটি তুলে, তাকে কী বলছিল আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে?

লোয়ার কোর্টেই বিচার শেষ হল। আপীলের অধিকার স্বীকার করা হয়নি। বিচারক অনুভব করেছেন, এই জাতীয়া কোনো মেয়ে আপন ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য খুন করতে পারে না। যে-অবস্থায় সে খুন করেছিল একজন আবগারি ইনফর্মারকে, সে অবস্থায় ইজ্জতের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কাও তার পক্ষে, তার জীবনের পক্ষে অভাবনীয়। ডেস্পারেট মার্ডার বলতে যা বোঝায়, তাই হয়েছে। যদিও আইনের চোখে নারী পুরুষ সমান, তবু কোর্ট পারুলবালাকে করুণা দেখাচ্ছে। ফাঁসী না দিয়ে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল।

দুর্গা যেন ছটফটিয়ে উঠেছিল।

বিচারক যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কিছু বলবার আছে ?

দুর্গা বলেছিল, বাঁচিয়ে কেন রাখলেন হুজুর। ফাঁসী কেন দিলেন না গো ?

—তোমাকে দয়া করা হ'ল।

তখন সবাই দেখেছিল, পারুলবালা দাসী শুধু ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলছে, এ কি হল ছোট্‌ঠাকুর! একি হল!

মিথ্যে বলবে না চিরঞ্জীব। তার মনে হয়েছিল, শেষ শংখ বাজল না। প্রতীক্ষা রইল, তাই, এখন নিষ্ঠুর মনে হ'লেও, বেঁচে থাকার তাগিদটা রয়ে গেল তার। কারণ, অদৃশ্য হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মত, দুর্গা বাজবে, বাজবে, বাজবে।

একটু কথা বলতে দিয়েছিল পুলিশ।

দুর্গা বলেছিল, একেবারে যেতে পারলুম না ছোট্‌ঠাকুর। বছরে এ্যাট্টা দিন সময় পেলে জেলে এস।

চিরঞ্জীবের গলা কাঁপছিল। বলেছিল, বছরে একদিন কেন ?

দুর্গা বলেছিল, ওইদিন এলেই হবে। উনিশে ভাদ্দোর, যেদিন হারটা পাট্‌ঠেছেলে—

—দুর্গা!

—হ্যাঁ ছোট্‌ঠাকুর। আর, এট্টা কথা। কতবারই তো বললুম এ এগার মাসের মধ্যে, এ পথ থেকে ফিরে যেও। সবাই বলে, তুমি এখন থেমে আছ। আবার নিকি শুরু করবে। তা নয়। এবার ফিরে যাও, আর আর—

—বল্ দুর্গা।

দুর্গা অম্লান গলায় মিনতি করেছিল, দেখ তো শরীলটা কী করেছ ? এ্যাট্‌টা বে' কর—

চিরঞ্জীব একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সে ব'লে উঠেছিল, ওরে, ওরে রাক্ষুসী, তুই একটা রাক্ষুসী দুর্গা।

দুর্গা তবু বলেছিল, সোমসার ছেলে পিলে চাই না? আমি জেলে বসে তাদের দেখব, তুমি নে আসবে সঙ্গে ক'রে—

সময় হ'য়ে গিয়েছিল। কথা শেষ হবার আগেই নিয়ে গিয়েছিল দুর্গাকে।

—নামো চিরোদা।

গুলি ডাকল। তাদের গাঁয়ের স্টেশনে এসেছে। আজ বুঝি হাটের দিন। মানুষ আর গরুর গাড়ির ভিড়। চারদিকে কোলাহল। খেজুর গুড়ের গন্ধই বেশী আসছে চারদিক থেকে। মাঘ মাস যাচ্ছে তো। তরি তরকারিও প্রচুর। এই দুটি মাস, একটু প্রাচুর্য সবখানেই। তাই, এ সময়ে হাটে বেগুনবাঁশিও বাজে।

আবগারির নতুন জমাদর তাকিয়ে দেখল চিরঞ্জীবকে। বলাই, কাসেম, অখিলবাবু—তিন জনেই বদলী হ'য়ে গিয়েছিল একে একে।

একদিন বলাই বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চিরঞ্জীবকে। অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল চিরঞ্জীবের। বলাই তার স্ত্রী মলিনা দেবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার। আশ্চর্য! মলিনা দেবী কেঁদে ফেলেছিলেন। একটুও লজ্জা করেননি। বলেছিলেন খালি, দেখুন তো কী হল। আর কি তাকে ফিরে পাবেন? থাকতে বোঝেননি, আর আপনার কী রইল?

মলিনা দেবী সত্যি বলেছিলেন। কিন্তু সবটুকু নয়। কিছুই কি রইল না?

দুর্গার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। নন্দ ব'সে আছে উঠোনে। বেদো আর তার ডোমিনী। যমুনা মাসী আর মেশো। হীরালাল খালাস পেয়ে গিয়েছে। সে অনেকদিন হল যোগোকে নিয়ে দেশে ফিরেছে। আর কোনোদিন নাকি শ্বশুরবাড়ি মুখো হবে না।

গুলিই সবাইকে শেষ বিচারের কথা শোনাল।

কিন্তু চিরঞ্জীব কী করবে? বুকের জ্বালা বুকেই রইল। আগুন নিভল না। শোধ নেওয়া হ'ল না। তবু তো আর চোলাই করতে যেতে পারছে না। শোধ নেওয়ার রূপটা যেন কেমন বদলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। সে যে বলেছিল, সোনার লঙ্কা ছারখার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সোনায় লঙ্কা পুড়ল কই? আমি যে দুর্গাকেই আগে জ্বালালাম! রাক্ষসের সোনার লঙ্কার একটি ইঁটও তো খসাতে পারিনি! তাদেরই দরবারের বিচারে আমি এখানে এসেছি। নিজের গায়ে আগুন নিয়ে ফিরছি। সবাই আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে। মাথা তুলতে পারছি নে। আগুন নিয়েই ফিরছি, ঠিক জায়গায় লাগাতে পারলাম কোথায়? আমি একলা আগুন লাগাব কেমন ক'রে? আমার কী আছে? পাতালের অন্ধকারে সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছি। উত্থান চাই। আগুন নিয়ে উত্থান।

চোলাই দলের সবাই মুখ চেয়ে আছে আমার। কবে আবার আরম্ভ হবে। আর পারব না। দুর্গা বলেছে ব'লে শুধু নয়। তাকে হারালাম ব'লে নয় শুধু। তাকে হারিয়ে বুঝতে হ'ল, আমার মা'য়ের, আমার দিদির মুক্তি আমার একার ক্ষমতায় নেই। আমার একলা অন্ধকার পাতাল চক্রের আবর্তে নেই। সামগ্রিক উত্থানে। বুধাইদার সহজ কথা, সহজ যুক্তির কথাগুলিই সত্যি।

মলিনা দেবী বলেছিলেন, আর আপনার কী রইল?

কিছুই কি রইল না? এত বড় ভুলটা ভাঙল, এ তো অনেক বড় পাওনা। শোধ নেবার দিগন্ত ভ'রে যে এত কোটি কোটি মানুষের হাত রয়েছে, তাকে যে নতুন ক'রে দেখতে পেলাম, সেটা কি কিছু নয়।

সামাজিক মনের যে বিচারক, সে অবিশ্বাস করবে চিরঞ্জীবকে। একটি মেয়েকে হারালে ব'লে সত্য উদ্ধার করলে তুমি?

হ্যাঁ, তাই তো। বক্তৃতা শুনে, বই প'ড়ে যারা সত্য উদ্ধার করেছে, তাদের দলে যেতে পারল না চিরঞ্জীব। নিতান্ত আপন,

আপন রক্ত, আপন আত্মা, শুধু আপন ভালবাসার একটি ভয়ংকর চকিত আঘাতে সত্য কি কখনো উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে না? শুধু যার হারাল, সে-ই বুঝল, কী হারিয়ে বুঝতে হ'ল। হারাল ব'লে সম্বিত ফিরল, সকলের কাছে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সেই সকলময় দুর্গা হবে, এমন মহৎ ভালবাসা চিরঞ্জীবের কোথায়? দুর্গা যে একটি, মাত্র একটি। জীবতত্ত্বের আকর্ষণে যদি কোনোদিন ভিন্ন দেহে দেহে ফিরতে হয়, শুধু পারুলবালার জন্য প্রতীক্ষাটুকুই তো ব্যক্তির মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করবে।

চিরঞ্জীব উঠোনের সকলের মাঝখানে বসে পড়ল। বলল, নন্দদা, ডাকাতি তো অনেকদিন ছেড়েছ। আর বোধহয় করতে পারবে না?

নন্দ অবাক হ'য়ে বলল, কেন বল তো?

—তোমাকে এ বাড়িতে থাকতে হবে। খেটে খুটে পেটের দানা যোগাড় ক'রে থাক। দুর্গা না আসা পর্যন্ত এ বাড়ি রক্ষা কর।

নন্দর মত অত বড় দেহধারী ডাকাতটা গালে হাত দিয়ে বসে রইল। তারপর মুখটা নামিয়ে, দুই হাঁটুর মাঝখানে গুঁজে রাখল।

চিরঞ্জীব বলল, আমি চলি। মা'র কাছে যাই একটু। ঘুরে আসব।

সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না।

চিরঞ্জীব ডাকল, আয় রে গুলি।

রাস্তায় চলতে চলতে গুলিকে বলল, কি রে, সনাতন ঘোষ কিংবা ওকুরের দলে যাবি নাকি?

গুলি কোনো কথা বলল না। চোখ দুটি ঝাপসা হ'য়ে উঠল শুধু।

চিরঞ্জীব তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চলতে চলতে বলল, আরে, এমনি বললুম। ঠাট্টা ক'রে। কিন্তু করবি কী?

গুলি বলল, যা বল।

—এক কাজ কর। বুধাইদার কাছে চলে যা। গিয়ে বল্‌, মোটর চালানোটা শিখিয়ে দাও। বুধাইদা তো পাগল। বকা ধমক করতে পারে, ছাড়িস নে। শিখে নে, একটা কাজ জানা থাকবে তবু, কেমন?

গুলি ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা। আর তুমি?

—আমি?

অন্যমনস্ক হ'য়ে বলল চিরঞ্জীব, দেখি।

বাড়ি ঢুকেই গলা তুলে ডাকল চিরঞ্জীব। মা, ও মা!

মা এলেন। মাথাটি ন্যাড়া করেছেন। চোখের কোলগুলি ঢুকে প্রায় কংকালের মত দেখাচ্ছে।

চিরঞ্জীব চৌকির ওপর থেকে টান মেরে তার বিছানা তুলে ফেলল। বেশ খান কতক ছড়ানো নোট। পাঁচ টাকা দশ টাকার। চিরঞ্জীব হেসে বলল, এতে তোমার এখন হ'য়ে যাবে মা। কাশীতে বড় মাসীমার কাছে অনেকবার যেতে চেয়েছ। এবার চলে যাও।

মা অসহায় ভাবে তাকালেন। কেঁদে বললেন, তুই?

চিরঞ্জীব বলল, থাকব এখানেই। এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি চলে যাও। এ টাকায় তোমার অনেকদিন চলে যাবে। দরকার পড়লে লিখে জানিও। পাঠিয়ে দেব।

মা আবার বললেন, কিন্তু তুই? চিরো, তুই সংসার করবিনে?

চিরঞ্জীব হেসে উঠল। বলল, করব বৈকি মা। সংসার মানে তো বিয়ে? যখন করতে ইচ্ছে করবে, তখন জানাব তোমাকে।

মা বললেন, আমি অনেক পাপ করেছি। তা' ব'লে মরবার সময় তোকেও দেখতে দিবিনে একটু? তাড়িয়ে দিবি আমাকে?

চিরঞ্জীব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, সত্যি বলছি মা, তুমি এখানে থাকলে আমার চলবে না। তুমি এখন বলছ এরকম, পরে হয়তো তোমার ভাল লাগবে না। তোমাকে আমি বড় মাসীমার

কাছেই পাঠাব। তোমার শরীর খারাপ করলে, আমাকে চিঠি দিও, আমি যাব।

কেমন যেন দৃঢ় মনে হ'ল চিরঞ্জীবকে। মা অসহায় ভাবে বললেন, যেমন তোর ইচ্ছে চিরো। তবে, ডাকলে কিন্তু যাস্, সেটা যেন মিছে না হয়।

সবাই চলে গিয়েছে। মা গিয়েছে। গুলি চলে গিয়েছে। এরা চলে যাবার পর দুটি দিন শুধু গালে হাত দিয়ে বসে রইল চিরঞ্জীব। পরদিন ভোর বেলা সে বেরিয়ে পড়ল। নাগাড় হেঁটে, প্রায় ৯'টার সময় উপস্থিত হ'ল এক গ্রামে। তার চেনা গ্রাম অনেকদিনের। চেনা পথ ঘাট। অনেক লোককেও সে চেনে। কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারল না। তাই কেউ কথা বলল না। চিরঞ্জীবও বলতে পারল না।

চিরঞ্জীবের কপালের রেখাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে সংশয়ে। কী একটা আশা নিরাশার আলোছায়া তার মুখে খেলছে।

ধান মাড়াইয়ের কাজ করছে কয়েকজন চাষী। বাড়ির বাইরের উঠোন সেটা। ইঁটের পাঁচিল-ঘেরা মাটির বাড়ি। বাড়ির বাইরের দরজাটা খোলা।

চিরঞ্জীব একেবারে ভিতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। রান্নাঘরে রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ। একটি বড় ঘরের দাওয়ায় এক বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকে তাকে নিরীক্ষণ করছেন। ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মোটা মোটা বই ভরতি র‍্যাক।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, কে ওখেনে? ওখেনে কে?

বলতে বলতেই, ঘরের ভিতর থেকে শ্রীধর এসে দাঁড়ালেন দাওয়ায়। পরনের কাপড় এলোমেলো। চুল উসকোখুসকো। খালি গা। হাতে খোলা কলম। কিছু লিখছিলেন বোধহয়।

কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। শ্রীধরের মুখ কঠিন হয়ে

উঠল। তারপরে একটু বিস্ময়। নত মাথা, চিরঞ্জীবের আপাদ মস্তক দেখে বললেন, কী চাই?

চিরঞ্জীব চোখ তুলে তাকাল। শ্রীধরের বুকটা কেমন দুলে উঠল। বললেন, কী বলতে চাস, ঘরে এসে ব'লে যা।

চিরঞ্জীব পায়ে পায়ে ঢুকল ঘরে। শ্রীধর তার টেবিলের সামনে, হাতলবিহীন চেয়ারটিতে বসলেন। তাকিয়ে দেখলেন সেই অতীতের কিশোর ছেলেটিকে। শ্রীধরের বুকের মধ্যে একটা কেমন অস্থিরতা পাক খেতে লাগল। চিরঞ্জীবের মুখে মাথায় পায়ে ধূলো। হেঁটে এসেছে এতদূর।

শ্রীধর বললেন, কোত্থেকে এলি?

চিরঞ্জীব বলল, বাড়ি থেকে।

ব'লে সে, শ্রীধরের চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে, মাটিতেই বসে পড়ল। শ্রীধর স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন তবু। তারপরে হঠাৎ যেন মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করলেন, সেই মেয়েটির কী হ'ল?

চিরঞ্জীব মুখ নামিয়ে রেখেই বলল, যাবজ্জীবন জেল। শ্রীধরদা—

শ্রীধর তাকালেন। চিরঞ্জীব ঢোক গিলল। প্রায় ভেঙে যাওয়া গলায় বলল, ফিরে এলুম শ্রীধরদা। আবার শুরু করব, আবার—

শ্রীধর হাত বাড়িয়ে চিরঞ্জীবের ধূলিরুক্ষ মাথা ধরলেন। তাঁর গলার স্বরও যেন কেমন চেপে গেল। বললেন, জানি চিরো, আমি কত চেয়েছি, মনে প্রাণে চেয়েছি।

চিরঞ্জীব কারুর সামনে কাঁদতে পারে না। পায়ে ধরে লুটিয়ে পড়তে পারে না। এখানে তার সে লজ্জা, সে সঙ্কোচ, সে বাধা নেই সে শ্রীধরের পা ধরে বলল, ক্ষমা করুন শ্রীধরদা, আমাকে ক্ষমা করুন।

শ্রীধর মাটিতে নেমে প'ড়ে, চিরঞ্জীবকে দু'হাতে ধরে প্রায় চুপি চুপি বললেন, রাস্‌কেল! তুই একটা রাস্‌কেল। ছাড়্‌, পা ছাড়্‌।

দুজনেই যেন একই স্পন্দনের দোলায় দুলতে লাগল। শ্রীধর

আবার বললেন, তেমনি চাপা গলায়, ভোট গেল। অবাক হয়ে গেছলুম। মিথ্যে বলব না, হতাশায় ভুগছিলুম। কিন্তু কেন? কী মিথ্যে, কত মিথ্যে ভোগা ভুগেছি। তুই ফিরে আসতে পারিস্, আর আমি ভোটের পরাজয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকোব? কেন? কেন?

চিরঞ্জীব বলে উঠল, না না শ্রীধরদা, কী বলছেন আপনি? আপনি—

শ্রীধরদা বললেন, থাম্। সত্যি কথাটা বলতে হবে না? রং বেরং ছড়িয়ে থাকলে কী হবে! ওটা তো রকমারি আলোর দোষ। একটা জায়গায় তো সবাই এক।

চিরঞ্জীব বলল, আমি জানি সেটা কোথায়।

—কোথায় বল্ তো?

—ভালবাসায়।

শ্রীধর যেন একটু অবাক হলেন। বোধহয় তাঁর কথাটাই সহজ ক'রে বলল চিরঞ্জীব। ঘাড় নাড়লেন বারে বারে। ঠিক ঠিক, তাই। ভালবাসা। কী যে কঠিন! ভালবাসা, কী যে নিষ্ঠুর আর কী বিচিত্র তার সংবেদ!